QUEST
A Multidisciplinary Bilingual Peer-Reviewed Academic Journal

"To appreciate Hamlet, on the other hand, will not be much use in practical life, except in those rare cases where a man is called upon to kill his uncle: but it gives a man a mental possession which he would be sorry to be without, and make him in some sense a more excellent human being. It is this latter sort of knowledge that is preferred by the man who argues that utility is not the sole aim of education."

On Education
Especially In Early Childhood
by
Bertrand Russell

ISSN 2319-2151

Uluberia College
Uluberia, Howrah
Pin: 711 315

QUEST
ISSN: 2319-2151
Volume – 17

Uluberia College

QUEST

A Multidisciplinary Bilingual Peer-Reviewed Academic Journal

Volume: 17
2022-23

Editors
Dr. Subhamay Ghosh
Dr. Ratna Bandyopadhyay

Editorial Board
Dr. Jayashree Sarkar, Dr. Tuhina Sarkar, Dr. Momotaj Begam,
Dr. Abdullah Bin Rahman, Dr. Biswajit Saha, Dr. Kamalesh Das,
Dr. Arup Kumar Sarkar, Dr. Basabdatta Ghosh, Dr. Sk. Ibrahim

Advisory Committee
Dr. Debasish Pal (Principal)
Dr. Shibsankar Das
Dr. Siddhartha Shankar Bhattacharya
Dr. Tapas kumar Samanta
Dr. Basanti Bhattacharya
Smt. Supti Ghata
Smt. Kasturi Saha
Sri Rakesh Ghosh
Sri Sandip Dolui

An Uluberia College Initiative

QUEST
A Multidisciplinary Bilingual
Peer-Reviewed Academic Journal

September, 2023

Cover designed by : Dr. Subhamay Ghosh

Illustrations : Ms. Shubhangee Giri

Printed by:

IMPRESSION
108, Raja Basanta Roy Road,
Kolkata 700 029
Mobile: 9831455695

QUEST

A Multidisciplinary Bilingual Peer-Reviewed Academic Journal

2022-23

Volume – 17

Uluberia College
Uluberia, Howrah
PIN: 711315

QUEST
VOLUME 17

CONTENTS

Page No.

From the Editor's Desk (i)
সম্পাদকের দপ্তর থেকে (ii)

SECTION I
(Special Attraction)

'ফুটি যেন স্মৃতি জলে' 01
- ড. বাসন্তী ভট্টাচার্য

মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ঃ সময়ের ব্যাপ্তিতে 08
- ড. মমতাজ বেগম

SCETION II
(Articles in Bengali)

নৈতিক অনিশ্চয়তার দৃষ্টান্তরূপে নৈতিক দ্বন্দ্ব 13
- লিথা ভট্টাচার্য

জীববৈচিত্র্যে সুন্দরবন ঃ একটি গতিশীল বাস্তুতন্ত্র (ঔপনিবেশিকোত্তর ভারত) 18
- ড. প্রদীপ কুমার মণ্ডল

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ক্ষিতিমোহন সেন 26
- ড. অরুণিমা বিশ্বাস

'মন্দ্রিত তব ভেরী' ঃ নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে সিপাহী-বিদ্রোহ প্রসঙ্গ 30
- ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী

'নীল ময়ূরের যৌবন' ঃ অন্ত্যজশ্রেণীর প্রতিবাদের আখ্যান 41
- ড. লিংকন দাস

শঙ্খমালা ঃ কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের নারী 46
- শ্রাবন্তী মজুমদার

নির্বাচিত বাংলা নাটকে তৃতীয় সত্তার উপস্থাপন ঃ একটি পর্যালোচনা 50
- সুমন সাহা

SECTION III
(Articles in English)

A Brief Survey on Quantum Computing Tools 60
- Tamal Deb, Deeptanu Sen, Jyotsna Kumar Mondal

Leveraging Data Analytics and Artificial Intelligence 76
in Influencer Marketing : A Paradigm
- Aishwarya Kayal

Monosodium Glutamate (msg) and 81
Reproductive Dysfunction : Mini Review
- Shibprasad Mondal

Use of RFID Technology in College and 88
University Libraries
- Duranta Mistri

Impact of In-Service Teacher Training on 93
English as Second Language Classroom Teaching
- Ghazala Nehal

Women's Question : William Carrey and 98
The Serampore Baptist Mission
- Dr. Jayashree Sarkar

Derozio and The Challanges of Nineteenth Century Bengal 105
- Sk Minhajuddin

Geographical Identification of Ancient Bengal 110
- Sujoy Bag

Reflection of National Discourses in India and 115
The Other Worlds of Satyajit Ray
- Debolina Byabortta

Behind The Colonial Mansion : Architectural Confinement And 118
The Feminine Resistance in "The Yellow Wallpaper"
-Ananya Sasaru

From the Editors' Desk

As this current issue of our academic journal 'QUEST' (Vol. 17, 2022-23) is being published, Uluberia College completes its glorious 75 years of dedication and commitment to the society as one of the pillars of higher educational institution in the district of Howrah. The institution has not only expanded physically but also matured itself with a mark of distinction in every aspect of its journey it undertook. The journey was arduous, but we were not tired. We had faith in ourselves that we would achieve. We owe our gratitude to the entire community of Uluberia college – our meritorious students, dedicated teaching and non-teaching staff and the efficient management, who all have accepted this challenge of upholding the legacy of the college.

This current issue of 'QUEST' is organized in three sections . In the first section we have attempted to celebrate the bicentenary of the great multifaceted talent Michael Madhusudan Dutt in two articles in the 'Special Attraction' section of this issue. In the remaining two sections of this bilingual research journal, various articles of different disciplines have been published in Bengali and English respectively. On behalf of the editors, we would like to express our gratitude and appreciation to all the respected faculties and dedicated researchers whose contributions have completed the issue.

Dr. Subhamay Ghosh
Dr. Ratna Bandyopadhyay

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

'QUEST'- এর এই সংখ্যাটি (Vol. 17, 2022-23) যখন প্রকাশিত হচ্ছে, ঠিক তখনই উলুবেড়িয়া কলেজ অতিক্রম করছে তার গৌরবময় ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবর্ষ। 'গৌরবময়' — কেননা, চলমান সময়ে প্রতিনিয়ত বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ব্রতে এতগুলি বছর অতিক্রম করা একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজ নয় খুব। বিশেষত, বিশ্বায়ন পরবর্তী এই খোলা দুনিয়ায় একুশ শতকের দুটি দশক পার করে উচ্চশিক্ষার এই জগৎ যখন ভীষণরকম প্রয়োগ-নির্ভর, ব্যবহারিক, জীবিকাসন্ধানী এবং ব্যক্তিক মালিকানা অধ্যুষিত হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। সে সময়ে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরিমণ্ডলে নিজের বিশ্বাসযোগ্যত্য এবং গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুদান-নির্ভর একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে একই সঙ্গে আনন্দের ও শ্লাঘার বৈকি! কলেজের এই কৃতিত্বের শ্রেয়োভাগ নিঃসন্দেহে কৃতী ছাত্রদের উপরেই বর্তায়; কিন্তু, সেইসঙ্গে এই মহতী উদ্দেশ্যসাধনে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের নিরন্তর প্রয়াস এবং কলেজের পরিচালন সমিতির সুদক্ষ সঞ্চালনাকেও যথাযোগ্য সম্মান জানাতেই হয়। সময়োচিত পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং তার কার্যকরী রূপায়ণে পরিচালন- সমিতির ভূমিকা সুনিশ্চিতভাবেই পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে।

QUEST-এর এই বর্তমান সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে তিনটি পর্যায়-বিন্যাসে। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের নানান শাখাতেই চেতনার নব-বিস্ফোরণ ঘটে যায় যে অগ্নিস্রাবী প্রতিভার স্পর্শে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেই ফিনিক্স পাখি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশততম জন্মবর্ষ দুয়ারে সমাগত। এই সংখ্যার 'বিশেষ আকর্ষণ' অংশের দুটি প্রবন্ধে এই মহান বহুমুখী প্রতিভাকে উদযাপনে প্রয়াসী হয়েছি আমরা। দ্বিভাষিক এই গবেষণামূলক জার্নালের বাকি দুটি পর্বে যথাক্রমে বাংলা ও ইংরাজি ভাষা-মাধ্যমে নানান বিদ্যাশৃঙ্খলার বিচিত্র গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। যাঁদের রচনাকর্মে সংখ্যাটি সম্পন্ন হয়েছে, সেই সকল অধ্যাপক ও গবেষকদের সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি। বিদ্যাক্ষেত্রের এই আনন্দময় কর্ষণ অবাধ হয়ে QUESTকে অগ্রবর্তী করুক দিনে দিনে প্রকাশমুহূর্তে এই একমাত্র চাওয়া।

ড. শুভময় ঘোষ
ড. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়

Section I

Michael Madhusudan Dutt

(25/01/1824 — 29/06/1873)

ফুটি যেন স্মৃতি জলে

ড. বাসন্তী ভট্টাচার্য

[**বিষয়-চুম্বক** ঃ *বঙ্গসাহিত্যের উনিশ শতকীয় নবজাগরণের প্রথম কবি শ্রীমধুসূদন দত্ত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ ও আদল অনুসরণ করে তিনি বাংলাসাহিত্যে সৃষ্টি করেছেন নাটক, কাব্য, প্রহসন, সনেট, ট্রাজেডি, মহাকাব্য সর্বোপরি অমিত্রাক্ষর ছন্দ। রচনাগুলির আঙ্গিকে রয়েছে পাশ্চাত্য প্রভাব কিন্তু অন্তরে রয়েছে মধুকবির ভারতীয় তথা বাঙালি সত্ত্বা ও বাঙ্গালি মনন। ব্যক্তিগত জীবনে আবেগ, ঔদ্ধত্য, অমিতাচার, ধর্মত্যাগ ইত্যাদি আচরণের নেপথ্যে কাজ করেছে যে নিয়ম ভাঙ্গার প্রবণতা, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সেই প্রবণতাই তাঁর প্রতিভা প্রকাশের অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। তাই বলা যায় তাঁর সাহিত্যের সাথে তাঁর ব্যক্তিজীবনও আজ ইতিহাস। মধুসূদন-জন্মের দ্বিশতবর্ষ অতিক্রম করে বাংলাভাষী হওয়ার গভীর অনুভবে নব্য বাংলা কাব্যের জনক মধুসূদনকে জানবার প্রয়োজন আছে বৈকি।*

সূচক-শব্দ ঃ *মধুসূদন, বাংলাসাহিত্য, ইংরাজিসাহিত্য, আত্মজাগরণ, নবজাগরণ, হিন্দু কলেজ*]

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।[১]

'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় নিজ মনের প্রার্থনা জ্ঞাপনের সূচনায় মধুসূদন তাঁর প্রিয় কবি বায়রনের পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন —'My native land, Good night !' প্রিয়কবির মতো মধুসূদনও চেয়েছিলেন প্রিয় বঙ্গভূমির থেকে বিদায় নিলেও তাঁর এ মিনতি যেন ব্যর্থ না হয়। সত্যই বাংলাসাহিত্য তাঁকে ভোলেনি, বঙ্গভূমি তাঁকে বিস্মৃত হয়নি। তন্নিষ্ঠ পাঠকের মনপদ্মে অক্ষয়, অনন্ত হয়ে আছে দ্বিশতবর্ষ অতিক্রমী মধু-সাহিত্য-সৌরভ।

অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কপোতাক্ষ নদীতীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪, ২৫শে জানুয়ারি, শনিবার জন্মগ্রহণ করেন বাংলাসাহিত্যের প্রথম ও একমাত্র মহাকাব্য রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলাসাহিত্যে মহাকাব্যের মতো ট্র্যাজেডি, প্রহসন, সনেট, নাটক এমনই আরও অনেক 'প্রথম'-র জনক তিনি। মধুসূদনের প্রপিতামহ রামকিশোর দত্ত বাস করতেন খুলনা জেলার তালাগ্রাম নামক অঞ্চলে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামনিধি দত্ত তাঁর ভাইদের নিয়ে চলে আসেন তাঁর মাতামহের কাছে সাগরদাঁড়ি গ্রামে। কালক্রমে এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন রামনিধি দত্তর কনিষ্ঠ সন্তান রাজনারায়ণ দত্তর একমাত্র পুত্র শ্রীমধুসূদন দত্ত।

মধুসূদন দত্তর বড়ো জ্যাঠামশায় রাধামোহন দত্তর দ্বারাই এই পরিবারের সমৃদ্ধির সূত্রপাত। রাধামোহন পারস্যভাষার বিশেষ দখলের সূত্রে যশোহর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সুনজরে পড়েন এবং আদালতের তৎকালীন সর্ব্বোচ্চ পদ সেরেস্তাদারি লাভ করেন। রাধামোহনের উন্নতির সাথে সাথে অন্যান্য ভাইদের মতো রাজনারায়ণ দত্তও জীবিকা অর্জনের পথে সফল হন। ক্রমে তিনি কলকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল হিসাবে কলকাতাবাসী হন। দত্ত পরিবার ক্রমশ অর্থবিত্তে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

কেবল অর্থবিত্তে নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাতেও মধুসূদনের পূর্বসূরীর অনেকেই ছিলেন উৎসাহী। মধুসূদনের ভাইঝি মানকুমারী বসুর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, ''যাঁহারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাহাঁরা জানেন

Basanti Bhattacharya, Associate Professor, Dept. of Bengali, Uluberia College, Howrah

আমার এক প্রপিতামহ মাণিকরাম দত্ত সুকবি ছিলেন। আমাদের বংশে আরও কেহ কেহ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। আমার পিতৃদেব দুর্গাস্তব, শিবস্তব, গনেশ-বন্দনা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। (মাইকেল) কাকা মহাশয়ের কবিত্ব-শক্তি তো তাঁহাকে অমরতা দিয়াছে।"[২] রামনিধির ছোটভাই অর্থাৎ মধুসূদনের ছোটদাদু মাণিকরাম দত্ত পারস্য ভাষায় অতি সুন্দর কাব্য রচনা করতে পারতেন। মধুসূদনের ছোট জ্যাঠামশায় দেবীপ্রসাদ দত্ত ছিলেন স্বভাব-কবি। সাধারণ কথাও পদ্যের ছন্দে মিলিয়ে বলতেন। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্তর অনুরাগ ছিল কবিতা, গান এবং নানাজাতীয় শিল্পচর্চায়। পারিবারিক সূত্রেই বুঝি মধুসূদন লাভ করেছিলেন কবিতাপ্রীতি ও সৌন্দর্যপিপাসু মন।

মধুসূদনের বিদ্যারম্ভ হয় গ্রামের পাঠশালায়। বাংলা, সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে কণ্ঠস্থ করেন ফারসি কবিতা। কাব্যপাঠের উৎসাহ মধুসূদন লাভ করেছিলেন তাঁর মাতা জাহ্নবী দেবীর কাছ থেকেও। জাহ্নবী দেবী ছিলেন খুলনা জেলার কাটপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। সে সময় স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রচলন না থাকলেও জাহ্নবী দেবী রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন এবং এসব মহৎ গ্রন্থের অনেক অংশ আবৃত্তি করতেন। এসকল গ্রন্থের পাঠ শিশুমনে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল মায়ের সাহচর্যে।

পাঠশালার পাঠ শেষ করে পিতার ইচ্ছায় মধুসূদন চলে এলেন কলকাতায়, অল্পদিন খিদিরপুরের এক স্কুলে পড়ে আনুমানিক ১৮৩৭ সালে ভর্তি হলেন হিন্দুকলেজে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের শিক্ষাদানে সেসময় হিন্দুকলেজ সারা ভারতবর্ষেই আদর্শ স্থানীয়। যদিও ডিরোজিও তখন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন তবু তাঁর প্রভাবে যে আত্মশক্তির জাগরণ হিন্দুকলেজের অন্যতম পরিচয় হয়ে উঠেছিল সেই আত্মজাগরণের শরিক হয়ে উঠলেন মধুসূদনও । তার পাশাপাশি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক রিচার্ডসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ইংরাজীভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এত গভীর, তীব্র হয়ে দেখা দিল যে ইংরাজীভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের পাশে নিজের নাম স্থায়ীরূপে চিহ্নিত করার দুর্মর বাসনার বীজ তাঁর মধ্যে উপ্ত হল। মেধাবী মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটতে লাগল নানাভাবে। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে স্বর্ণপদক লাভ করলেন, অজস্র ইংরাজী কবিতা রচনা করলেন যার কিছু কিছু কবিতা বিলাতের মাসিক পত্রিকাতেও পাঠাবার স্পর্ধা দেখালেন। ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ কবি হোমর, ভার্জিল, মিলটন, বায়রনের মতো মহাকবি হওয়ার এবং বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা হিন্দুকলেজের ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর মনে তৈরী হয়েছিল।

হিন্দুকলেজে মধুসূদনের সহপাঠী ছাত্র রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক প্রমুখের বন্ধুত্ব মধুসূদনের প্রতিভা প্রকাশের সহায়ক হয়েছিল। রসিককৃষ্ণ মল্লিক দ্বারা প্রবর্তিত, হিন্দুকলেজের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় মধুসূদনের রচনা প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছিলেন,

> ''আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
> স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
> আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
> বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।"[৩]

পারিবারিক ভাবে যে মাত্রাতিরিক্ত আদর-প্রশ্রয়ের মধ্যে বড় হয়েছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আঠারো বছর বয়সের স্পর্ধা। তাতে ইন্ধন যুগিয়েছিল হিন্দুকলেজের অতি আধুনিকতার ঝোঁক। মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' জানাচ্ছেন, ''তখন হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।"[৪] মদ্যপান, উচ্ছৃঙ্খলতা, সমাজ-প্রচলিত আচার-আচরণের বিরুদ্ধতা করা সেসময়ের অতি আধুনিকতার যুগলক্ষণগুলি মধুসূদনের আয়ত্বাধীন হয়ে উঠেছিল। সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নবজীবনের কাছে বাংলাভাষার ব্যবহার যেন লজ্জার ব্যাপার ছিল। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলা শক্তিশালী হয়ে উঠছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু বাংলাকাব্য বহিরঙ্গের অলঙ্কারবহুল আঙ্গিকে এবং অন্তরঙ্গের ভাবনায় তখনও বুঝি মধ্যযুগীয় ভাবনার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি। বাংলাভাষার প্রতি এই লজ্জার ভাব, অবজ্ঞার মনোভাব মধুসূদনের মধ্যেও ছিল। হিন্দুকলেজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, অধ্যাপক রিচার্ডসনের পাণ্ডিত্য এবং অমিতাচারের মিশ্র ব্যক্তিত্ব মধুসূদনের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। প্রিয় কবি বায়রনের মতই মধুসূদনও ইংরাজী সাহিত্যের যশস্বী কবি হতে চেয়েছিলেন। ইংরাজীসাহিত্য ও সাহিত্যের পীঠভূমি ইংল্যান্ড দর্শনের ব্যাকুলতা তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল।

হিন্দুকলেজে পড়ার সময়েই মধুসূদনের জীবনে এক বিরাট বদল এল। ১৮৪৩ সালে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে মধুসূদন হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর নতুন নাম হল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের ধর্মান্তরিত হবার প্রকৃত কারণ আজও অজানা। সর্বাধিক প্রচলিত লোকবিশ্বাস, ইংরাজীভাষাকে ভালোবেসে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এই প্রচলিত বিশ্বাসে একমত হওয়া যায় না কারণ, হিন্দুকলেজে ছাত্রদের মধ্যে কোন ধর্মের প্রতিই অনুগত্য ছিল না। বিশেষত এই কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত ডেভিড হেয়ার এবং রিচার্ডসন উভয়েই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সমর্থক ছিলেন না। ইংল্যান্ড যাওয়ার বাসনা তীব্র ছিল তাঁর মধ্যে কিন্তু তার জন্যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের যৌক্তিকতা গ্রাহ্য হয় না। যদিও মধুসূদন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ইংল্যান্ডে তিনি যাবেনই, আর বিলেত-গমনে সমাজচ্যুত হতে হবে একথাও তিনি জানতেন। ফলে সমাজ তাঁকে ত্যাগ করার পূর্বে তিনিই সমাজকে ত্যাগ করবেন এমন আত্মশ্লাঘার ভাবনা মধুসূদনের ব্যক্তিত্বে খুব বেমানান নয়। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু উদ্ধৃত করছেন মধুসূদনের ভাইঝি মানকুমারী বসুর স্মৃতিচারণ, ''মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় তাঁহার স্বদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত জমীদারের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। মধুসূদন এই বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ... মাতা পুত্রের কথায় দুঃখিত হইয়া, ভাবী বৈবাহিকের ধনমান ও তদীয় কন্যার রূপগুণের বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি করিলেন। মধুসূদন সকল কথা নীরবে শুনিয়া অবশেষে বলিলেন, 'মা, তুমি যতই বল, বাঙ্গালির মেয়ে রূপে গুণে কখনোই ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশও হতে পারে না।'... পুত্রের বিবাহ দিতে পারিলে তাহার মন ভাল হইবে, এই বিবেচনায় ... মহাসমারোহে রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের বিবাহ শেষ করিবেন এইরূপ স্থির হইল। বিবাহের ২০/২২ দিন পূর্বে মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস এরূপ মনে হয় না। বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা শুনিলে এরূপ বিশ্বাস সহজেই উপস্থিত হয় যে, মধুসূদন দত্ত 'অশিক্ষিতা, হীনচেতা, হিন্দুমহিলা'র পরিবর্তে শিক্ষিতা, স্বাধীন বিহারিণী, উন্নতমনা খ্রীষ্টীয় মহিলার পাণিগ্রহণে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। আর এক কথা, মধুসূদন জনৈক আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিলেন, আমার বড় ইংল্যান্ড দেখিতে ইচ্ছা করে; যাহারা পরের দেশ (কলিকাতা) এমন সুন্দর করিয়া সাজায়, না জানি তাহাদের নিজের দেশ কত সুন্দর।' ইহাতে বোধ হয়, ইংরাজদিগের দেশ দর্শনও মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বনের অন্যতর উদ্দেশ্য। ''[৫] খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে ইংল্যান্ডে যাওয়ার সুবিধা হবে এবং অপ্রীতিকর বিবাহের দায় থেকেও মুক্ত হওয়া যাবে এই ভাবনায় বুঝি প্রভাবশালী পিতার হাত এড়াতে মিশনারীদের দ্বারা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে প্রায় অন্তরীণ থেকে স্বইচ্ছায়, সজ্ঞানে মধুসূদন দত্ত ধর্মান্তরিত হলেন।

হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করার ফলে মধুসূদন হিন্দুসমাজ এবং হিন্দুকলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। তাঁর পিতাও তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন কিন্তু অর্থসাহায্য বন্ধ করলেন না। সেসময় শিবপুরে দেশীয় খ্রিষ্টান ও ইংরাজ বালকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশপস কলেজ। এই কলেজে ভর্তি হয়ে বহুভাষাবিদ সুপণ্ডিত অধ্যাপকদের শিক্ষা-সাহচর্যে ও আপন প্রতিভার বলে মধুসূদনও ক্রমে হয়ে উঠলেন বহুভাষাবিদ। হিন্দুকলেজে পড়ার সময়েই তিনি জানতেন ইংরাজী ও ফারসি। বিশপস কলেজে পাঠকালে তিনি গ্রহণ করলেন গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা। সারস্বত উন্নতির বিপরীতে মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনে তৈরী হল নানা রকমের অশান্তি। তাঁর ঔদ্ধত্যের কারণে তাঁর পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিলেন, খ্রিষ্টান হয়েও ইংল্যান্ড যেতে না পারার বেদনা ক্রমশ তাঁকে হতাশ করে তুলল। বিশপস কলেজের কিছু মাদ্রাজী সহপাঠীর পরামর্শে ১৮৪৮ সালে একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেলেন মাদ্রাজ।

ধনীর সন্তান মধুসূদন সেদিন সত্যই দরিদ্র। দেশীয় খ্রিষ্টান এবং ফিরিঙ্গিদের সাহায্যে এক অনাথ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি পেলেন। অর্থলাভের আশায় 'Madras Circular and General Chronicle', 'Madras Spectator; 'Antheneum' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। এসময়ে Vision of the Past বিশেষত Captive Lady তাঁকে মাদ্রাজের সারস্বত সমাজে পরিচিত করে তুলল। মাদ্রাজে প্রশংসা জুটল কিন্তু অর্থাভাবে মুদ্রকের ঋণজালে জড়িয়ে পড়লেন। এদিকে তাঁর প্রিয় শহর কলকাতায় প্রত্যাশিত প্রশংসা তো জুটলই না বরং 'Hindu Intelligencer', 'হরকরা'র মতো পত্রিকা সমালোচনাই করল। বন্ধু গৌরদাস বসাক, তৎকালীন শিক্ষাসমাজের সভাপতি বীটন ওরফে বেথুন মধুসূদনের মতো প্রতিভাবান নবীন লেখকের বাংলাভাষায় অর্থাৎ মাতৃভাষায় সাহিত্যরচনার পরামর্শ দিলেন। পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনায় মধুসূদনেরও উপলব্ধি হল বিদেশী ভাষায় নয়, মাতৃভাষাই প্রতিভা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। ইতিমধ্যে প্রায় স্কুলছাত্রের রুটিনেই তিনি শিখছিলেন ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, তামিল, সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইংরাজী সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা। এছাড়াও বাংলাভাষা চর্চার জন্য সঙ্গী করলেন শৈশবে মায়ের কাছে শোনা 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'কাশীদাসী মহাভারত'। অর্থাৎ মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করার প্রস্তুতি যেন মধুসূদনের অন্তঃকরণে

চলছিলই। মাদ্রাজে এসে ১৮৪৮ সালে তিনি বিবাহ করেন অনাথ বিদ্যালয়ের ছাত্রী স্কচ কন্যা Rebecca Thompson Mc Tavishকে। এঁদের বার্থা ও ফিজি নামে দুই কন্যা এবং জর্জ ম্যাকটাভিস ও মাইকেল জেমস নামে দুই পুত্র ছিল। মাইকেল জেমস মারা গিয়েছিল কবির মাদ্রাজ ত্যাগের কয়েক মাসের মধ্যেই। বাকি তিন সন্তানের সঙ্গে মধুসূদনের আর কোন যোগাযোগ রইল না কারণ কয়েক বছরের মধ্যেই পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল মধুসূদনের। ততদিনে তিনি মন দিয়েছেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের এক ফরাসী অধ্যাপকের কন্যা Emelia Henrietta Sophie Whiteকে। হেনরিয়েটার প্রথম কন্যাসন্তান জন্মের পরেই মারা যায়। এরপর এলিজা শর্মিষ্ঠা নামে এক কন্যা এবং মেঘনাদ মিলটন ও মধুসূদনের মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে ১৮৭০ সালে আলবার্ট নেপোলিয়ন নামে আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মেঘনাদ মিলটনও মারা যায় তের বছর বয়সে। যাই হোক, মাদ্রাজ যাওয়ার তিন বছর পরে তাঁর মা মারা যান। তিনি একবার কলকাতায় এসে শুধু পিতার সাথে দেখা করে আবার ফিরে যান। তারপর তিনি হারালেন পিতাকে, যদিও সে সংবাদ তিনি জানেন না। তাঁর আত্মীয়রা খবর তো দেয়ই নি বরং রাজনারায়ণ দত্তর সম্পত্তি গ্রাস করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই অবস্থায় মধুসূদনের পরম শুভার্থী বন্ধু গৌরদাস বসাকের আন্তরিক চেষ্টায় মধুসূদন মাদ্রাজ ত্যাগ করলেন ১৮৫৬ সালে। ছেড়ে এলেন মাদ্রাজের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা 'The Spectator' র সহকারী সম্পাদকের পদ, স্থানীয় প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকতার চাকুরি। রিক্তহস্তে ফিরে এলেন মধুসূদন কলকাতায়। পিছনে ফেলে এলেন পুরনো জীবন, পত্নী এবং তাঁদের সন্তানদের। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়েও সমাজনীতি ও চরিত্রবলের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য তাঁর জীবনকে অস্থির শান্তিহীন করে তুলেছিল।

মাদ্রাজ যাওয়ার আগেই মধুসূদন দেখে গিয়েছিলেন রাজধানী কলকাতায় যুগগত পরিবর্তনের সূচনা। মাদ্রাজ-প্রবাসের দীর্ঘ আট বছর পরে কলকাতায় ফিরে এসে দেখলেন বদলে গেছে কলকাতার অনেক কিছু। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, ভাষা সবকিছুতেই পাশ্চাত্যের প্রভাব আরও স্পষ্ট। ১৮৫৬র জুলাইয়ে পাশ হয়েছে বিধবা বিবাহ আইন, পরের বছরেই ঘটেছে সিপাই বিদ্রোহ, তারপর নীলবিদ্রোহ। জেমস লং-র মধ্যস্থতায় দীনবন্ধু রচিত 'নীলদর্পন' নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করছেন মধুসূদন। ততদিনে বাংলা গদ্যকে গতি দিয়েছে বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত', 'শকুন্তলা' গ্রন্থ। সংবাদপত্র যে নিছক সংবাদের বাহক নয় তার পরিচয় দিয়েছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তর পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা। কিন্তু কাব্যের জগতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গরসপ্রধান, অলঙ্কারবহুল কবিতার প্রাধান্যের রেশ বুঝি তখনও রয়ে গেছে যা সেকালের পাশ্চাত্যমনস্ক পাঠকের কাছে যুগোপযোগী নয়। এসময় মধুসূদন এলেন তাঁর বহুভাষাশিক্ষার অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং হোমর, ভার্জিল, দান্তে, ওভিদ, মিলটন, বায়রন প্রমুখের কাব্যপাঠের আদর্শ নিয়ে। বাংলাসাহিত্য বুঝি অপেক্ষা করছিল এই মধুময় প্রতিভাস্পর্শের।

সংস্কৃতি জগতের সবচেয়ে করুণ অবস্থা ছিল বুঝি বাংলা নাটক ও নাট্যশালার। ১৮৩৩ সালে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর'-র অভিনয় দিয়ে বাঙালির নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু অনুবাদ ভিন্ন মৌলিক নাটক ছিল না। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে মধুসূদন যুক্ত হলেন বাংলা নাট্যচর্চার সঙ্গে। একথাও উল্লেখ্য, অনুবাদের পারিশ্রমিক বাবদ পাঁচশ টাকাও ছিল সেসময় মধুসূদনের জন্য বড় প্রাপ্তি। মাদ্রাজ থেকে ফেরার পর পুলিশ আদালতে মাসিক ১২০ টাকা বেতনে দোভাষীর চাকরি ছিল তাঁর কাছে একান্ত প্রয়োজনভিত্তিক কাজ। নাট্যজগতে যুক্ত হয়ে মধুসূদন বুঝি খুঁজে পেলেন নিজস্ব জমি। উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের অভাববোধে খানিকটা যেন চ্যালেঞ্জের ঝোঁকে লিখে ফেললেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ১৮৮৫ সালে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক এটি। এর অব্যবহিত পরেই মধুসূদনের হাতে রচিত হল বাংলাসাহিত্যের প্রথম প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের তীরে বিদ্ধ হল অতি আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং চরিত্রহীন প্রাচীন সম্প্রদায়। মধুসূদনের জীবনের এই সময়টিই স্বর্ণযুগ। কলকাতা পাইকপাড়ার বিখ্যাত দুই ভাই রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতো সম্ভ্রান্ত ও ধনী, শিক্ষিত নাট্যমোদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মধুসূদনের সাহিত্যপ্রতিভা বিকশিত হতে লাগল এবং একই সাথে অর্থকষ্টের দিনও আপাতভাবে শেষ হল।

'শর্মিষ্ঠা' অভিনীত হল বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৯, ৩রা সেপ্টেম্বর। মধুকবির জীবনে এল বাংলা নাটক ও কাব্যরচনার জোয়ার। ১৮৬০ সালেই প্রকাশিত হল 'পদ্মাবতী' নাটক ও 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত অভিনব সৃষ্টি 'পদ্মাবতী'। এই নাটকের অংশবিশেষে প্রথম প্রয়োগ ঘটল অমিত্রাক্ষর ছন্দের। Blank Verse বা অমিত্রছন্দ রীতির সাহায্যেই বাংলা নাটকের উন্নতিসাধন সম্ভব এ বিষয়ে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে মধুসূদনের কথোপকথন মধুসূদনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে। এই ছন্দের ব্যবহার পূর্ণরূপ পেল 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে।

ভারতীয় পুরাণের প্রতি দৃষ্টিপাত একাব্যের বৈশিষ্ট্য।

মহাভারতের সুভদ্রা এবং সুলতানা রিজিয়াকে নিয়ে লেখা দুটি রচনা অসম্পূর্ণ রইল দর্শকের সমাদর পাবে না আশঙ্কায়। ১৮৬১-তে প্রকাশিত হল একই সঙ্গে রাজপুতানার রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীকে নিয়ে বাংলাসাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী', জয়দেব, বিদ্যাপতির বৈষ্ণবভাবনার অনুসারী রাধার বিরহগাথা 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' এবং বাল্মিকী বিরচিত রামায়ণের রাবণ ও মেঘনাদকে ভালোবেসে বাংলাসাহিত্যে প্রথম ও একমাত্র মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'। বাংলার সাহিত্যজগৎ ধন্য ধন্য করল। মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-র সঙ্গে তুলনা করলেন অনেকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের নেতৃত্বে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' সংবর্ধনা দিল এবং উপহার দিল রূপার পানপাত্র। একই সঙ্গে বিচিত্র স্বাদের ভিন্ন ভিন্ন রচনা মধুসূদনের বিস্ময়কর প্রতিভার স্মারক। রোমান কবি ওভিদের Heroic Epistles আদর্শে ১৮৬২-তে লিখলেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। ওভিদের বীরপত্রাবলীর মতোই ভারতীয় পুরাণের বিখ্যাত নারী-ব্যক্তিত্বের পত্রাকারে লিখিত এ কাব্যে কবি আঁকলেন পতিপরায়ণা সাধ্বীর, কলঙ্কিনী প্রেমিকার এবং অভিমানিনী সতীর হৃদয়ের কথা।

এসময়ে মধুসূদন পুলিশ আদালতে কাজ করছেন। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারধর্ম পালন করছেন, বইবিক্রি এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে, এমনকি বাংলাভাষার সুপরিচিত লেখক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। সবদিক থেকেই সুখে থাকার উপকরণের অভাব ছিল না। কিন্তু বিলেত যাওয়ার আশৈশব স্বপ্ন সফল করার জন্য, ব্যারিস্টারি পড়ে অর্থকষ্ট দূর করার জন্য এবং য়ুরোপীয় ভাষায় আরও দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি ১৮৬২, ৯ই জুন ক্যান্ডিয়া নামের জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির কাছে জমা রাখলেন এই শর্তে যে, ঐ ব্যক্তি মধুসূদনের বিদেশযাত্রার খরচ দেবে এবং দেশে রয়ে যাওয়া স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিপালনের অর্থ দেবে, তাঁকেও বিদেশে টাকা পাঠাবে। ব্যারিস্টারি পাশ করলেন ১৮৬৬ সালে। প্রকাশিত হল 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', বাংলাভাষার প্রথম সনেট। ইংল্যান্ডে বাসকালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে তাঁর সম্বন্ধে একটি সনেট লিখে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে সন্নিবিষ্ট করলেন। কিন্তু তাঁকে দেওয়া সম্পত্তি বিষয়ক অর্থসংক্রান্ত কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষিত হল না। স্ত্রী হেনরিয়েটা সন্তানসহ উপস্থিত হলেন মধুসূদনের কাছে। একে মধুসূদন ছিলেন অমিতব্যয়ী তার উপর পরিবার প্রতিপালনের নিদারুণ অর্থকষ্টে লন্ডন ও ভার্সাই প্রবাসের দিনগুলি অসহনীয় হয়ে উঠল। এই সংঙ্কটে তাঁকে বারবার উদ্ধার করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিদ্যাসাগরকে লেখা মধুসূদনের চিঠিগুলি এক অসীম প্রতিভাধর মানুষের ফুরিয়ে যাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে মনকে ভারী করে তোলে।

মধুসূদন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন ১৮৬৭ সালে এবং কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস করতে শুরু করলেন। ১৮৭০ সালে ব্যারিস্টারি ছেড়ে হাইকোর্টেই অনুবাদকের কাজ নিলেন মাসিক হাজার টাকা বেতনে। অমিতব্যয়িতার কারণে তাঁর অর্থকষ্ট কিছুতেই দূর হল না।অর্থাভাব দূর করার আশায় স্কুলপাঠ্য হিসাবে লিখলেন 'ইশপস ফেবলস'-র আদর্শে 'নীতিমূলক কবিতামালা'। এই সময়েই প্রকাশিত হল গ্রীক মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড' অবলম্বনে 'হেক্টর-বধ' কাব্য। ১৮৭২সালে আবার ফিরলেন ব্যারিস্টারির কাজে। কিন্তু এসময় তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে নানাবিধ রোগ, নিত্যসঙ্গী ছিল ঋণভার, তার সঙ্গে ছিল তাঁর উদারতা ও দানশীলতা। নিজের শূন্যহাতকে শূন্যতর করে মানুষকে সাহায্য করেছেন, ওকালতিতে পারিশ্রমিক নেন নি। জীবনের শেষ পর্যায়ে ব্যারিস্টারিতে উন্নতির আশা ছেড়ে মানভূমের অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজার আইন উপদেষ্টার (Legal Advisor) পদ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাজার ব্যবহারে দুঃখিত হয়ে সেকাজ পরিত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে এলেন। স্ত্রী-পুত্র সহ অর্ধাশনে অনশনে দিন কাটানো কবি এসময় বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ণধার শরৎচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে রচনা করলেন তাঁর শেষ অসম্পূর্ণ নাটক 'মায়াকানন'। উত্তরোত্তর দুর্দশাগ্রস্থ কবিকে তখন নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কবিকে নিয়ে গেলেন তাঁর প্রাসাদে। এসময়ে কবি ও কবিপত্নী উভয়েই অসুস্থ। কবিকে যথাসাধ্য সেবা ও সান্ত্বনা দিলেন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র প্যারীমোহন ও পৌত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। অসুস্থ কবির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধুগন।

মধুসূদনের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে পুত্র সহ তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটাকে পাঠানো হল তাঁদের বিবাহিত কন্যা শর্মিষ্ঠার কাছে এবং তাঁকে ভর্তি করা হল আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে। কিছুদিন পরেই হেনরিয়েটা মৃত্যবরণ করলেন। ধন-জন-মানে পরিপূর্ণ দত্ত বাড়ির সন্তান মধুসূদন আত্মীয়-পরিজন বিহীন ভাবে সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। পত্নীর মৃত্যুতে সন্তানের চিন্তায় কাতর পিতা শুভাকাঙ্খী মনোমোহন ঘোষকে অনুরোধ

জানালেন, ''আমার শিশুগুলি যেন অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করে, এই দেখিও।''[৬] অবশেষে বহু শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগের পর ১৮৭৩, ২৯শে জুন, রবিবার দ্বিপ্রহরে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে পরলোক যাত্রা করলেন 'বঙ্গের পঙ্কজরবি' কবি মধুসূদন। সমস্ত জীবন বিলাসে অতিবাহিত করতে চাওয়া শৌখিন মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারও সংস্থান ছিল না। নিতান্ত সাধারণভাবে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হল তাঁকে। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর সমাধির উপর কোন স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপিত হয়নি। পরবর্তী কালে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কমিটি ১৮৮৮, ১লা ডিসেম্বর সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করে। সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ হল মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে স্বয়ং মধুসূদনের রচিত প্রয়াণলেখ,

> দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
> বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
> (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমনি
> বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
> দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন।
> যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ তীরে
> জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
> রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।[৭]

কবি জানতেন জন্ম-মৃত্যুর অমোঘ নিয়মে জীবননদের নীর সত্যই চিরস্থায়ী নয়। তাই বুঝি জন্মদাত্রী শ্যামল বঙ্গভূমির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন,

> অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
> ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
> মানসে, মা, যথা ফলে
> মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে।[৮]

দ্বিশতবর্ষ অতিক্রম করে সময়ের অতিবাহনে একথা স্পষ্ট মধুসূদনের জীবনের ব্যক্তিক ট্র্যাজেডি তাঁর জীবনকে দুঃখে কারুণ্যে ভরিয়ে তুলেছে কিন্তু আখেরে লাভবান হয়েছে বাংলাসাহিত্য। পরাধীন ভারতবর্ষের কপালে সম্মানের জয়টীকা পড়িয়েছিলেন মধুসূদন আপন প্রতিভায়। মধুসূদনের মৃত্যুর পর 'বঙ্গদর্শন'-র পাতায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যর্থাথই বলেছিলেন, ''যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃপ্রাপ্ত হন সে দেশের আরও সৌভাগ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য-গর্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? — বাঙ্গালির মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও মধুসূদন। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সে পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও — তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।''[৯] মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য পাঠে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয় যে, সাহিত্যমোদী বাঙ্গালিমানসে চিরদিন সহস্রদলে ফুটে থাকবে মধুসূদনের মধুময় মধুসাহিত্য। বচনে, বহিরঙ্গে, ব্যবহারে ধর্মান্তরিত কবি অন্তরের কবিধর্মে বঙ্গভাষার এবং দেশজননীর কৃতি সন্তান। তাই বুঝি মধুকবি থাকবেন তাঁর সমস্ত সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত থাকবেন তাঁর সমগ্রতায়।।

<u>সূত্র-সংকেত</u>ঃ

১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত/বঙ্গভূমির প্রতি/ মধুসূদন রচনাবলী/সাহিত্য সংসদ/ সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৮০ পৃষ্ঠা ১৮৬

২. মানকুমারী বসু/ আমার অতীত জীবন/সঙ্কলন ও সম্পাদনা, অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য/সেকেলে কথা/ নয়া উদ্যোগ/সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯/পৃষ্ঠা ১০৪

৩. সুকান্ত ভট্টাচার্য/আঠারো বছর বয়স/ সুকান্ত সমগ্র/সারস্বত লাইব্রেরী/৭ম সংস্করণ, ১৯৭৪/পৃষ্ঠা ৮৪

৪. রাজনারায়ণ বসু/আত্মচরিত/কুন্তলীন প্রেস/১ম সংস্করণ, ১৯০৯/পৃষ্ঠা ৪১

৫. যোগীন্দ্রনাথ বসু/মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত/দে'জ পাবলিশিং/৪র্থ দে'জ সংস্করণ, ২০১১/ পৃষ্ঠা ৮৯

৬. তদেব/পৃষ্ঠা ৪২৮

৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত/সমাধি-লিপি/মধুসূদন রচনাবলী/সাহিত্য সংসদ/ সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৮০/পৃষ্ঠা ১৯৬

৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত/ বঙ্গভূমির প্রতি/মধুসূদন রচনাবলী/সাহিত্য সংসদ/সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৮০/পৃষ্ঠা ১৮৭

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত/বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড/শিশু-সাহিত্য সংসদ লিঃ/১ম সংস্করণ ১৯৫৪/পৃষ্ঠা ৮৮৩

<u>সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি</u> ঃ

১. মাইকেল রচনাসম্ভার/প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত/মিত্র ও ঘোষ/২য় সংস্করণ, ১৯৬১

মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ঃ সময়ের ব্যাপ্তিতে

ড. মমতাজ বেগম

[**বিষয় চুম্বক** ঃ *চর্যাপদের পাদাকুলক ছন্দের গর্ভ চিরে জন্ম হয় পয়ার, মহাপয়ার, ত্রিপদী ছন্দের। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরাজী কবি মিল্টনের* Blank verse *রীতি অনুসরণ করে মিলহীন চতুর্দশাক্ষর পয়ার অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম দেন। পয়ারের কাঠামোর মধ্যেই ভাবের প্রবহমানতা সৃষ্টি করে, ছেদ ও যতি ব্যবহারের নতুনত্বে প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম দিলেন। সময়ের পথ ধরে বিভিন্ন কবির হাতে এই ছন্দ নতুন নতুন রূপে প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আধুনিক কবিরা এই ছন্দকে আরও সম্প্রসারিত, গতিময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছেন। সময়ের সাথে সাথে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপ্তিই ছন্দ গবেষণাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে।*

সূচক শব্দ ঃ *মধুসূদন দত্ত, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, পয়ার, প্রবহমানতা, ভাবের ব্যাপ্তি, মিলহীনতা*]

চর্যাপদের পাদাকুলক ছন্দের গর্ভ চিরে জন্ম হয় পয়ার, মহাপয়ার, ত্রিপদী ছন্দের। বাংলা ছন্দের দীনতা অনুভব করে ইংরাজী কবি মিল্টনের Blank verse অর্থাৎ Unrhymed lambic pentametre অর্থাৎ মিলহীন আয়াম্ভিক পঞ্চপদী রচনা রীতিকে অবলম্বন করে পয়ারের অনুসরণে মিলহীন চতুর্দশাক্ষর পয়ার অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম দেন কবি মধুসূদন দত্ত। পয়ার ছন্দে প্রতিটি চরণে ১৪টি অক্ষরের পর একদাঁড়ি এবং দুই চরণের পর দুই দাঁড়ি অর্থাৎ পূর্ণচ্ছেদ পড়তো। মধুসূদন দত্ত প্রতি লাইনে ১৪টি মাত্রা বজায় রেখেও ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহমানতাকে ব্যবহার করলেন।

১৮৬০ সালে প্রকাশিত 'পদ্মাবতী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন, পরবর্তীকালে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যে নতুন জোয়ার এনেছেন। মধুসূদন দত্ত, লাইনের অন্তে যে মিত বা বন্ধুত্ব থাকে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের তা না রেখে ভাবের প্রবহমানতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে বাংলা কাব্যে ছন্দ নতুনভাবে ধরা দিল।

যেমন -

সম্মুখ সমরে পড়ি। বীর চূড়ামণি। ৮ + ৬
বীরবাহু, চলি যবে।। গেলা যমপুরে।
অকালে, কহ, হে দেবি।। অমৃত ভাষিনি।
কোন বীরবরে বরি।। সেনাপতি - পদে, ।
পাঠাইলা রণে পুনঃ।। রক্ষঃ কুলনিধি।
রাঘবারি?

এখানে এক লাইন থেকে আর এক লাইনে ভাবের প্রবহমানতা লক্ষ্য করা গেছে, লাইনের অন্তে মিলহীনতা এবং ভাবের প্রবহমানতাই এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য। পয়ারের ৮ + ৬ অবস্থান প্রতিটি লাইনে বজায় থাকলেও ভাবের প্রবহমানতা অবশ্যই থাকতে হবে। এর ফলে ভাবের উপর কোনো আরোপ থাকবে না, তা হয়ে উঠবে স্বচ্ছন্দ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে মধুসূদন দত্ত ভাবের প্রবহমানতার উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার যাদুতে বাংলা কাব্য সাহিত্য নানাভাবে সৃজিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। ভাষার মধ্যে নতুন ছন্দ প্রয়োগ করে শুধু আধুনিক যুগের সূচনা

Dr. Momotaj Begam, Associate Professor, 'Dept. of Bengali, Uluberia College, Howrah

করলেন তাই নয়, এক বিপ্লব আনলেন সাহিত্যে। ভাবের গাঢ়ত্বে, মহাকাব্যিক ওজস্বিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দ খুবই উপযোগী। তৎকালীন যাপিত জীবনের বর্ণাঢ্যতাকে পুরাণের খোলস থেকে ছাড়িয়ে ভাষায়, ভাবে,ছন্দে-মিশিয়ে এক অপূর্ব ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে, যেমন -

'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে
জানিনু কেমনে আসি লক্ষণ পশিল
রক্ষঃ পুরে, হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী
সহোদর রক্ষঃ শ্রেষ্ঠ ? শূলী শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপূত্র বাসববিজয়ী
নিজগৃহপথ, তাত দেখাও তস্করে ?'

ভাষার ওজঃস্বিতাকে বজায় রেখে ৮ + ৬ রক্ষা করে ভাবকে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে বিস্তারিত করেছেন। পয়ারকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করে তার ফ্রেমের মধ্যেই ব্যাপ্তি ঘটালেন ভাবের। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হলো। মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁর নতুন সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা অর্থের দ্বারা সংকীর্ণ। কোনো একটি শব্দ একটি বিশেষ অর্থকেই প্রকাশ করে, যদি এই নির্দিষ্টতা না থাকত তাহলে ব্যবহারিক জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ত। কিন্তু কবিতায় ছন্দের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কাব্যে ছন্দ ভাষাকে অর্থের নির্দিষ্ট গন্ডি থেকে মুক্তি দেয়। তিনি বলেছেন

'মানুষের ভাষাটুকু অর্থবদ্ধ চারিধারে,।
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে, অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীন
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন'
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে'

সৃষ্টিধর্মী শিল্পসমন্বিত কাব্য সাহিত্যের ছন্দ ভাবের বিস্তৃতি দান করে। এই বিস্তৃতির ফলে বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। সময়কাল অতিক্রম করে অনন্তকালের দিকে যাত্রা করতে পারে। সুমিত পদস্থাপনার মধ্যে দিয়ে ভাবের উত্থান-পতনময় তরঙ্গভঙ্গিমা বা ধ্বনিস্পন্দন হল ছন্দে। ছন্দের এই মূল ভাবনাকেই মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এখানে অর্থ অনুসারে যতি না বসিয়ে ছন্দযতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সংস্কৃত ছন্দের যতি বিষয়ে ছন্দোমঞ্জুরী' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

যতির্জিহ্বেষ্ট বিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে
মা বিচ্ছেদ বিরামদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া।

অর্থাৎ জিহ্বা যেখানে স্বেচ্ছায় বিশ্রাম গ্রহণ করে, কবিরা তাকেই ছন্দযতি বলেছেন। যদিও ছেদ ও যতি দুটি এক কিনা এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও এই দুটিকে এক হিসেবে অনেকে গ্রহণ করেছেন। 'ছেদ শব্দটি যর্থাথ অর্থে ব্যবহার না করার ফলে মধুসূদন দত্ত বিভ্রান্তিতে পড়েছিলেন। একথা জানিয়ে বন্ধুকে লিখেছিলেন তাঁর কবিতার যতি "Naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th and 12th" অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দে চরণের যে কোনো স্থানেই যতি পড়তে পারে। কারণ ভাব এক লাইন থেকে অন্য লাইনে বিস্তার লাভ করে। মধুসূদন দত্ত ছেদ ও যতির বিচ্ছেদে প্রবহমানতাকে সৃষ্টি করেছেন। যদিও তাঁর অনুকরণকারীরা তা বুঝতে না পেরে অনেকসময় কেবল

মিলহীন লাইন লিখে এই ছন্দ সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। যেমন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা লাইনগুলি হলো -

'গভীর ধরণীগর্ভে গাঢ় তমোময়
নির্জন দুর্গমস্থান বিশাল বিস্তৃত
বিশ্বকর্মা-শিল্পশালা, ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ
একান্ত মুদগর-ধ্বনি কোটি কোটি যেন
পড়িছে আঘাতি শূর্মী নিনাদ বিকট
সহস্র বাসুকি গর্জ ভয়ঙ্কর যথা,
দগ্ধধাতুশ্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।'

এখানে লাইনের শেষে মিল নেই অর্থাৎ মিত নেই তাই অমিত্রাক্ষরতা বজায় আছে কিন্তু ছেদ ও যতির বিচ্ছেদ না ঘটায় এখানে যথার্থ ছন্দস্পন্দন সৃষ্টি হয়নি। ভাব তার পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে প্রবহমান অমিত্রাক্ষর ছন্দও সৃষ্টি হল না এবং ভাবও বিস্তার লাভ করতে পারলো না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় মিত্রাক্ষর ব্যবহার করেও ভাবের প্রবহমানতাকে দেখিয়েছেন। পয়ার ও মহপয়ারের গঠনকে বজায় রেখেও সমিল প্রবহমান পয়ার বা সমিল প্রবহমান মহাপয়ার ছন্দরূপ নির্মাণ করলেন। যেমন -

ক) 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে ৮+৬
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে ৮+ ৬
তীর্থস্নান লাগি।'

(পয়ারের কাঠামোয় মিত্রাক্ষর)

খ) এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে। রঙ্গময়ী ! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।

(মহাপয়ারের কাঠামোয় মিত্রাক্ষর)

সুতরাং অমিত্রাক্ষর ছন্দে মধুসূদন দত্ত যে ভাবের ব্যাপ্তি দেখিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গ্রহণ করেছেন তবে শুধু অমিত্রাক্ষর হিসাবে নয় মিত্রাক্ষর হিসাবেও।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে প্রথম জন্মগ্রহণ করলেও অন্যান্য শাখার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। 'মেঘনাদ বধ' কাব্য সম্বন্ধে তিনি মনে করতেন বাংলার প্রাকৃত ছন্দ স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্তে তা লেখা সম্ভব ছিলো একই ভাব বজায় রেখে। তিনি কাব্যটিকে এভাবে আরম্ভ করার কথা ভেবেছিলেন -

'যুদ্ধ যখন সাজ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে
কোন বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে নিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।'

ভাবের প্রবহমানতা বজায় রেখে মিলহীন স্বরবৃত্ত / দলবৃত্ত ছন্দে উপস্থাপন করলেন। একই ভাবকে নানাভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব তা দেখালেন।

কেউ কেউ 'আধুনিকতা' শব্দটিকে আপেক্ষিকতায় চিহ্নিত করেছেন। তবে আমরা আধুনিকতার কতগুলি লক্ষণ চিহ্নিত করেছি। যেমন বুদ্ধির চর্চা, মুক্তচিন্তা, যুক্তিবদ্ধতা, মননের অনুশীলন, প্রতিবাদী মন, সংশয়-সন্দেহের দ্বন্দ্ব, বিপ্লপবাদ এ সবের মধ্যেই আধুনিকতা আছে। শুধু ভাবের দিক থেকে হলে হবে না প্রকরণগত দিক থেকেও আধুনিকতার প্রতীতি গড়ে তুলতে হয়। মধুসূদন দত্ত অন্যান্য প্রকরণগত রূপের পাশে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা প্রবহমান পয়ার ছন্দকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করলেন। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন কবির হাতে তার বৈচিত্রময় রূপ প্রকাশ পেল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ তার ভাবের ব্যাপ্তিতে নব নব রূপ নিয়ে বাংলা কাব্যের আঙিনায় প্রকাশিত হলো।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অমিতাক্ষর ছন্দের ৮ + ৬ মাত্রাকে ৮ + ১০ মাত্রা হিসাবে চিহ্নিত করলেন। যেমন -

নিবে গেল দীপাবলী । অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন ৮ + ১০
যুদ্ধ হল প্রেক্ষাগৃহে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে ৮ + ১০
বাদ্য সমবায় হতে। আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী ৮ + ১০
নম্রকণ্ঠে সারথী আহ্বান ১০ (অর্কেস্ট্রা)

ছেদ ও যতির মাধ্যমে পৃথক অবস্থানের মধ্যে দিয়ে মধুসূদন দত্ত যে প্রগতিশীলতা ও ধ্বনিগৌরব সৃষ্টি করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাতে আর একটু বেশি স্ফুর্তি দান করলেন। জীবনানন্দ দাস বাইশ মাত্রার প্রবহমান ছন্দের রূপ দিয়েছেন কবিতায়। যেমন -

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর। অন্ধকার জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি। চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তুপ
জাম বট কাঁঠালের হিজলের অশথের করে আছে চুপ।'

এই সনেট কবিতাটিতে সনেটের মিল বজায় রেখেও ভাবের প্রবহমানতাকে অনেকটা স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের স্বাধীনতা দিয়েছেন। ফলে কবিদের মনের ভাব প্রবহমানতাকে অবলম্বন করে এক বিপুল ব্যাপ্তিতে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরলকলাবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রেও প্রবহমানতাকে দেখিয়েছেন। যাকে তিনি 'পঙক্তি লঙ্ঘন' বলে উল্লেখ করেছেন। ছন্দের বন্ধন থেকে ভাবকে মুক্তিদিতে যে প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম হয়েছিল পরবর্তীকালে তা থেকেই মুক্তক ছন্দ, গদ্যছন্দের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবহমান সমিল ও অমিল পয়ার, মুক্তক ছন্দ আধুনিক পর্বের কবিদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের এক রূপ দিলেন, জীবনানন্দ দাশ দিলেন অন্যরূপ। বুদ্ধদেব বসু অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন পর্ব - পর্বাঙ্গের বিন্যাস কৌশলের মাধ্যমে। যেমন -

'দূর থেকে আরো দূরে, জন্মান্তরে প্রাগৈতিহাসিক নীলিমায় - সেখানে, মাতার গর্ভে, নক্ষত্রপুরুষের মতো জ্বলে।'

পরবর্তীকালে শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী প্রমুখ কবিরা এই গতিপথকে আরও প্রশস্ত ও মুখরিত করে তুলেছেন। কখনো কখনো দেখা যায় একই কবিতার মধ্যে সমিল ও অমিল দু ধরণের প্রবহমান পয়ারই ব্যবহৃত হচ্ছে।

যে কোনো শিল্প সাহিত্য মানেই তা জীবনের অনুকৃতি, সেই অনুকরণ যখন সৃষ্টি হয়ে ওঠে তখন তার প্রকরণ ও প্রকাশকলাকে সুন্দর হতে হয় মাধ্যমে ভাব তার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে। মধুসূদন দত্ত যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম দিয়েছিলেন তা আজ ব্যাপ্তি লাভ করেছে নানাভাবে। মধুসূদন পরবর্তী কবিরা বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে, আদর্শের সঙ্গে তথ্যের সংযোগ সাধন করে যে চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করেন তাতে রসোত্তীর্ণতার মূল হাতিয়ার হিসাবে ছন্দ বিশেষ ভূমিকা নেয়। সাহিত্যে যে powerful and beautiful application of ideas' থাকে তা ভাব-ভাষা-ছন্দের যুগলবন্দীতে পূর্ণরূপ লাভ করে।

আধুনিক কবিতার ভাব প্রকাশিত হয় মূলত গদ্যছন্দের মধ্যে দিয়ে। গদ্যছন্দে ভাবের যে প্রবহমানতা তা মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা থেকেই বহমান হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সৃজিত ও সমৃদ্ধ করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্য

।

কবিতার মূল কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে অথবা ঈষৎ পরিবর্তন করে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন। আধুনিক কবিরা তাকে আরও সম্প্রসারিত, গতিময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছেন, এভাবেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ নতুন নতুন বাকভঙ্গী গঠনকৌশল ও দ্যোতনা সৃষ্টির প্রয়াস লাভ করেছে নানাভাবে Modern Tendencies in English Literature গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে -

"In the poetry of the great modern, Rabindranath Tagore, a fine balance of valves can be found; and that is so because his genius accepts the Age under the scrutiny of full poetic responsibility."

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রপত্রিকা ঃ

১. ছন্দ মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০০৮

২. সাহিত্যিকা, ড. সুবোধ চৌধুরী, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৯

৩. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ষোড়শ সংখ্যা, ১৪২২, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Section II

নৈতিক অনিশ্চয়তার দৃষ্টান্তরূপে নৈতিক দ্বন্দ্ব

লিথা ভট্টাচার্য

[বিষয়-চুম্বক ঃ *নৈতিকতার অন্যতম উদ্দেশ্যই হল সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের আচরণের প্রকৃতি নির্ণয় করা, ঔচিত্যমূলক কর্মগুলি নির্ধারণে সাহায্য করা। আচরণের ভালোত্ব ও মন্দত্ব নিরূপণের জন্য আধুনিককালে পাশ্চাত্য নীতিদার্শনিকেরা একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ণয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। নৈতিকতা আদর্শমূলক বলে ব্যক্তির আচরণের মূল্যায়নকারী মানদণ্ডগুলি প্রধানত সার্বজনীন হবে এমনই দাবী করেছেন। দার্শনিকেরা মনে করেন, এই মানদণ্ড অনুসারে সকল ব্যক্তির পক্ষেই কর্ম করা সম্ভব এবং উচিতও। জাগতিক ঘটনাবলী আমাদের কর্মের সিদ্ধান্ত এবং কর্মের ফলকে কখনও কখনও প্রভাবিত করে - এমন অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। কোনও কোনও দার্শনিক তাই মনে করেন নৈতিক অনিশ্চয়তার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা এমন কতকগুলি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন যা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত নৈতিকতা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধারণাগুলি বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। নৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি দুটি পরস্পরবিরোধী নীতি পালনের বাধ্যবাধকতা অনুভব করলেও উভয় নীতিই অনুসরণ অসম্ভব হয় বলে অনিশ্চয়তা অনিবার্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। কোনও একটি নীতি অনুসারে ক্রিয়া করলেও তাকে অপর নীতি অগ্রাহ্য করার কারণে নিন্দিত হতে হয়।*

কিন্তু যদি এই বিষয়ের উপস্থিতিকে স্বীকার করা হয় তাহলে নৈতিক মূল্যায়নকে অস্বীকার করতে হবে। কারণ নিয়ন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ব্যক্তির কর্মকে আমরা বিচার করতে পারি? স্বীকার করতে হয় যে নৈতিক মানদণ্ড যথেষ্ট নয়, যেহেতু তা বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য নির্বাচনে যথেষ্ট পারদর্শী নয়; মূল্যায়নের প্রয়োজনকেই অস্বীকার করতে হয় যেহেতু ব্যক্তিগত পছন্দ নৈতিকতার গুরুত্ব লাভ করে। ফলস্বরূপ অনিশ্চয়তা নৈতিক ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং বিচার করার প্রয়োজন নৈতিক দ্বন্দ্বের বৈধতার প্রসঙ্গটি।

সূচক-শব্দ ঃ *নৈতিকদ্বন্দ্ব, নৈতিক অনিশ্চয়তা, নৈতিকতা***]**

নৈতিক অনিশ্চয়তার একটি উদাহরণরূপে আমরা নৈতিক দ্বন্দ্বের ঘটনাগুলির আলোচনা করতে পারি। নৈতিকতা সম্পূর্ণরূপে মানবকেন্দ্রিক। ব্যক্তির আচরণ ভালো না মন্দ তা বিবেচনা করাই নৈতিকতার কাজ, মানবেতর প্রাণীর আচরণের মূল্যায়ন করা হয় না। নৈতিক বিচার করতে হলে আমাদের আচরণকে বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরী। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা সমাজ-নির্ভর। ব্যক্তির কর্ম, তার আচরণ অপর ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে বলেই নৈতিক মানদণ্ড, বিচার, মূল্যায়ন, পুরস্কার বা তিরস্কারের প্রয়োজন হয়। এক ব্যক্তির আচরণে অপর ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন যাতে না হয় সে জন্যই সমাজে নৈতিকতার উদ্ভব। কারণ সুষ্ঠ, ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠন করতে হলে, প্রত্যেকের জীবনকে মঙ্গলময় করে তুলতে হলে নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। গ্রীকদের মতে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে 'শুভ বা উৎকর্ষ অর্জন' যা প্রকৃতিপক্ষে তার দৃঢ় সদগুণসম্পন্ন চরিত্র ও সেই চরিত্র অনুযায়ী কৃত আচরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষ যেহেতু আত্মচেতন, বিচারশীল জীব এবং যেহেতু তার ব্যক্তিত্ব রয়েছে, সেহেতু সে অপরাপর জীব থেকে পৃথক। মানুষের কিছু ইন্দ্রিয়বৃত্তি উপস্থিত থাকলেও সেগুলিকে বুদ্ধি অনুসারে চালিত করতে মানুষ সমর্থ। এগুলিকে দমন করতে না পারলে, নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে প্রকৃত আত্ম-সচেতন তথা বৌদ্ধিক জীবন লাভ হয় না। বৌদ্ধিক জীবনেই রয়েছে মানুষের মুক্তি তথা সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি। মানুষের যুক্তিবোধের কারণেই সে উপলব্ধি করে যে, তার জীবনের উদ্দেশ্য সহজে সম্পূর্ণ করা সম্ভব অপর ব্যক্তির সঙ্গে যৌথভাবে। তাই সহযোগিতার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে মানুষ একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়। সমাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য সমাজ - নির্ধারিত এবং সর্বজনস্বীকৃত কিছু নৈতিক নিয়ম বর্তমান যা ব্যক্তির নিকট অবশ্য পালনীয় বলে গৃহীত

Litha Bhattacharya, Researcher, Dept. of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata

হয়। নীতিবিদরা প্রচলিত নিয়মগুলিকে পরিবর্তন বা পরিমার্জন করে এমন কতকগুলি সার্বত্রিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন অনুভব করেন যা ভালো-মন্দের, ন্যায় অন্যায়ের আদর্শরূপে গ্রাহ্য হতে পারে। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, আমাদের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের ধারণা সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তি সেই সামাজিক রীতি - নীতি পালনের জন্য অনুপ্রাণিত হয় যার প্রতি তার মানসিক সমর্থন বর্তমান। ব্যক্তি সেই নীতিই পালন করতে আগ্রহী হয় যা তার নিকট যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়।

একথা সত্য যে আদর্শমূলক শাস্ত্র রূপে নীতিবিজ্ঞান এমন নীতি পালনের উল্লেখ করে যা আমাদের অবশ্য করণীয় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। আধুনিক যুগের বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট তাঁর নীতি-নির্ভর তত্ত্বে কতকগুলি বুদ্ধিপ্রসূত, সার্বজনীন নিয়ম অনুসরণ করাই ব্যক্তির কর্তব্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তাঁর কর্তব্যবাদে যে কেবলমাত্র নীতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথাই বলেছেন তা নয়, ঐ নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতই নীতি নির্ধারিত কর্মটি পালন করার আবশ্যিকতার কথা ব্যক্ত করেছেন। আবেগ, স্বার্থ, অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম নির্বাচন করলে তা অপরের স্বার্থ ক্ষুন্ন করতে পারে এমন আশঙ্কার কারণেই কান্ট নিয়মগুলিকে অবশ্য অনুসরণীয় বলে বিবেচনা করেছেন। আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত কখনও কখনও কর্তব্য কর্মের অনুরূপ হলেও তার নৈতিক মূল্য থাকে না, কারণ সেগুলি আবেগ নির্ভর হওয়ার ব্যক্তি যে তা সকল ক্ষেত্রে পালন করবেই এমন নিশ্চয়তা থাকে না। তাই কান্ট সার্বিক নিয়ম অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করেছিলেন। সে কারণেই কান্ট কর্তব্যের জন্য কর্তব্য পালনকে নৈতিক আচরণের লক্ষ্য বলে গণ্য করেছেন। নৈতিকতার বিবিধ সূত্রগুলিকে স্বতন্ত্র্যভাবে মান্য করলে তাদের প্রাতিস্বিক রূপ সর্বজন গৃহিত ও অলঙ্ঘণীয় বলে মনে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিবিধ সূত্রগুলির মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া সম্ভব। এদের মধ্যে একটিকে বা একাধিক সূত্রকে লঙ্ঘন না করে অন্যটি রক্ষা বা পালন করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে নানা যুক্তির সাহায্যে কর্মকর্তা একটা বিকল্প নির্বাচন করলেও যে কার্যই সে সম্পাদন করবে তাতে কিছু নিয়মধর্ম লঙ্ঘিত হবেই। আমরা অনেক সময় মনে করি এসব ক্ষেত্রে যেটির গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক তাই পালনীয়। কিন্তু এই গুরু লাঘবের বিচার সর্বাপেক্ষা কঠিনতম কাজ। প্রাজ্ঞতম ব্যক্তিরাও এক্ষেত্রে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত কী হবে সে বিষয় দ্বিধা বোধ করেন। প্রত্যেক মানুষ তার জ্ঞানবুদ্ধি মতো অথবা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পরামর্শমতো এসব ক্ষেত্রে কর্তব্য নির্ধারণ করলেও কতকগুলি নীতিধর্মের প্রাতিস্বিক রূপ লঙ্ঘিত হবেই। সুতরাং এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, নৈতিক জীবনে সর্বদা কি নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব? এই অধ্যায়ে এই সমস্যাটির বিষয়েই আমি আলোচনা করব।

সমাজে প্রচলিত নৈতিক নিয়মগুলির মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে সংঘাত লক্ষ্য করা যায় এবং তার ফলে কোন নিয়মটি অনুসরণীয় তা সহজে নির্ণয় করা যায় না। নীতিবিদরা এই প্রকারের পরিস্থিতির নাম দিয়েছেন নৈতিক দ্বন্দ্ব। নৈতিক দ্বন্দ্বের প্রতিটি দৃষ্টান্তই একজন কর্মকর্তার নিকট একাধিক কর্ম পালনের বিকল্প উপস্থিত থাকে এবং প্রত্যেকটি কর্ম সম্পাদন করার পশ্চাতে যথাযথ নৈতিক যুক্তি থাকে। কিন্তু তাঁর পক্ষে একইসঙ্গে দুটি কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয় কারণ একটি কর্ম পালন করার অর্থ অপরটি পালন না করা। নৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি দুটি পরস্পরবিরোধী নীতি পালনের বাধ্যবাধকতা অনুভব করলেও উভয় নীতিই অনুসরণ অসম্ভব হয় বলে অনিশ্চয়তা অনিবার্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে কর্মকর্তাকে নৈতিক ভাবে ব্যর্থ বলে মনে হয়। কারণ ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে কর্মকর্তাকে কোনও একটি অবশ্য - পালনীয় কর্তব্যকর্মকে উপেক্ষা করতে হয়। কর্মের কর্তা অবশ্যম্ভাবী রূপে কর্তব্য পালন না করার জন্য তিরস্কৃত হয়ে থাকেন, অনুতপ্ত হয়ে থাকেন। বিষযটি স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। দার্শনিক প্লেটো-র Republic গ্রন্থ থেকে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে নৈতিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি বোঝানো যায়। রাষ্ট্র বা সমাজের নিয়ম হলো গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দেওয়া। কিন্তু কোনও বন্ধু যদি সুস্থ অবস্থায় একটি অস্ত্র আমার নিকট গচ্ছিত রেখে পরে মত্ত ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় এসে কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেটি দাবি করে, তাহলে অস্ত্রটি ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া ন্যায্য হবে এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় না।[১] এক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত দুটি নিয়মের মধ্যে সংঘাত ঘটেছে - 'গচ্ছিত সম্পদ প্রত্যর্পন করার অঙ্গীকার' এবং 'অপরের প্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব। অস্ত্র প্রত্যর্পন না করার অর্থ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং অস্ত্র প্রত্যর্পন করলে প্রাণরক্ষার দায়িত্ব থেকে চ্যুত হতে হবে। এই দুটি নিয়মের সংঘাত দূর করতে অপর কোনও উচ্চতর নিয়ম না থাকায় দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। আমরা ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র, ব্যবসায়িক নীতিশাস্ত্র, বায়োমেডিক্যাল নীতিশাস্ত্র, আইনগত নীতিশাস্ত্র এরূপ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাই। প্রতিটি দৃষ্টান্তেরই যা সাধারণ তা হল দ্বন্দ্ব। আমরা দৈনন্দিন জীবনে বহু ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই যেখানে ন্যায়-অন্যায়ের সীমানা স্পষ্ট হয় না। নৈতিক জীবন যাপন করতে হলে ন্যায়কেই অনুসরণ করতে হয়। এই নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি না করলেও, যদি দুটি নিয়ম বা দুটি কর্মের মধ্যে বিরোধ ঘটে তবে আমাদের কোনও একটিকে নির্বাচন করতে হয়। যেমন

- 'ক' প্রতিশ্রুতি দিল যে, সে আজ বিকালে 'খ'-এর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু দেখা করার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে খবর এল যে, তার আরেক বন্ধু 'গ' অসুস্থ হয়ে পড়েছে। 'ক' কি এখন 'গ'কে দেখতে যাবে না 'খ'কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে? যে কাজটি করার সিদ্ধান্তই সে গ্রহণ করুক না কেন অপর কাজটি করতে না পারার জন্য সে কিছুটা পীড়া সে অনুভব করবেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে কোনও একটি বিকল্প অনুসারে কর্ম পালন করতেই হবে। নৈতিক *দ্বন্দ্বের* গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল - কর্মকর্তার দুটি (বা তারও বেশী) কর্ম সম্পাদন করার প্রয়োজন হয়। কর্মকর্তা প্রতিটি কর্তব্যই সম্পাদন করতে পারে, কিন্তু কর্মকর্তা সমস্ত কর্তব্য একসঙ্গে করতে পারবেন না। এইভাবে কর্মকর্তার ভিতর একপ্রকার অনিশ্চয়তার জন্ম হয়। তিনি যে কর্মই সম্পাদন করেন না কেন কর্তব্য পালনে তিনি অপারগ হবেনই এবং ফলে তিনি সমালোচিত হবেন। এমন একটা কিছু করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন যেটি সম্পাদন করা তার কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

প্রাচীন এবং সমসাময়িক উভয় প্রকার সাহিত্যই এমন সমস্ত পরিস্থিতির বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে পরিস্থিতিগুলিকে নৈতিক দ্বন্দ্ব বলা যায় অথবা দুটি বলিষ্ঠ নৈতিক মানদণ্ডের মধ্যেকার অমীমাংসিত সংঘাত বলা যায়। গ্রীক সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উদাহরণগুলি দেখা যায়। যেমন - আন্তিগোনে এবং অ্যাগমেমননের বিয়োগান্তক ঘটনা, শেক্সপিয়ারের লেখা কিছু দুঃখদায়ক ঘটনা। Sophie's choice নামক উপন্যাসেও নৈতিক দ্বন্দ্বের উল্লেখ রয়েছে। এই গল্পগুলি এতই প্রচলিত এবং বাস্তব যে এগুলি নৈতিক দ্বন্দ্বের অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাও এই বিষয়টিকে সমর্থন করে। প্রায় প্রত্যেকেই নিজের জীবনে এমন কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যেখানে দুটি অসঙ্গতিপূর্ণ বিকল্পের প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও বলিষ্ঠ নৈতিক মানদণ্ড দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু এই সংঘাতের সমাধান করার কোনও বিষয়গত পন্থা নেই বলেই বোধ হয়। কিন্তু সব দার্শনিকেরা নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বিষয়ে অবশ্যই একমত না। গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী দার্শনিকেরা নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করলেও সাম্প্রতিক কালের কিছু দার্শনিক এই মতকে বাতিল করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে নৈতিক দ্বন্দ্বগুলি বাস্তব এবং অন্ততপক্ষে সম্ভব।

'Sophie's choice' গল্পে আমরা একটি অত্যন্ত করুণ ঘটনার উল্লেখ দেখি যেখানে একজন মায়ের তাঁর সন্তানকে রক্ষা করার সদিচ্ছা থাকলেও পরিস্থিতির কারণে তিনি তাঁর সন্তানের মৃত্যুর কারণ হন। সুতরাং কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য দায়ী একথা বলতে হয়। এই গল্পে আমরা জার্মানীর নাৎসী অত্যাচারের বিবরণ দেখতে পাই। গল্পের মুখ্য চরিত্র সোফি তার শিশু সন্তানদের নিয়ে নাৎসীদের ক্যাম্পে যেতে বাধ্য হয়। ক্যাম্পের প্রহরী তাকে তার দুই শিশু সন্তানদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার নির্দেশ দেন। সোফি যে শিশুকে নির্বাচন করবে তাকে নাৎসী প্রহরী মৃত্যুদণ্ড দেবে এবং অপর শিশুকে ক্যাম্পের সুরক্ষিত জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে সোফি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে সেটি কোনোভাবেই তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। অথচ সে কোনও না কোনও বিকল্প নির্বাচন করতে বাধ্য কারণ সে যদি কোনও বিকল্পই গ্রহণ না করে, অর্থাৎ কোনও সন্তানকেই নির্বাচন না করে তাহলে প্রহরী তার দুই শিশু সন্তানকেই হত্যা করবে। ফলত সোফি একটি অনৈতিক কার্য সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকবে, কেননা সে তার উভয় শিশুর মৃত্যুর কারণ হবে। ফলস্বরূপ সোফি নৈতিক দ্বন্ধের সম্মুখীন হয়। কেননা একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা করার অর্থ হল অপর শিশুর প্রতি অন্যায় করা। তার সিদ্ধান্ত অনৈতিক হবে এটি জানা সত্ত্বেও সোফি এখানে কোনও না কোনও সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য। তার কৃতকর্ম কর্তব্যবোধ বা শুভবুদ্ধির বিরোধ। এখানে সোফি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও সে নিজেকে তার সন্তানের মৃত্যুর জন্য নৈতিকভাবে দায়ী মনে করে। অর্থাৎ ইচ্ছার পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিকে এক্ষেত্রে তার কর্মের জন্য নিন্দা করা হয়, ব্যক্তি নিজে অনুশোচনা অনুভব করে। ব্যক্তি নিজে নিজের দায়িত্ব অর্থাৎ সন্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে অপরাগ হওয়ায় নিজেকে দোষারোপ করে।

স্বাভাবিকভাবেই নৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আমরা এক প্রকার অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হই। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা দূর করা সম্ভব। সোফিকে আমরা সন্তানের জন্য দায়ী করি না, সোফি নিজে নিজের কর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করে। কারণ সে মনে করে সে তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তার পরিস্থিতি তাকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছে একথা মানলেও সে মনে করে তার সন্তানকে রক্ষা করার কর্তব্য সে পালন করেনি। এখানে সোফির এই অনুতাপ, কর্তব্য পালনে তার ব্যর্থতাবোধ তার চারিত্রিক গুণাবলিকে স্পষ্ট করে তোলে। অ্যারিস্টটলের মতে, একজন নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির এই গুণাবলিই নৈতিক বিচারের বিষয়। ফলে কর্ম পালন করতে না পারার জন্য আমরা সোফিকে দোষারোপ করি না, বরং সোফির অনুতাপ, কর্তব্য পালনে তার ব্যর্থতাবোধ তাকে নৈতিক বিচারে ভালো ব্যক্তিতে পরিণত করে। ব্যক্তির চরিত্রের এই গুণাবলিই এখানে আমাদের বিচার্য বিষয়, কর্ম নয়। বুদ্ধি এবং আবেগ এই উভয়ের উপস্থিতিই ব্যক্তি - চরিত্রে কাম্য, কারণ এর দ্বারাই ব্যক্তি যথাযথ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে। সোফির কাতরতা, নিজেকে দোষী মনে করা, তার সন্তানের জন্য

অনুতাপ -এই বিষয়গুলিই তার চরিত্রের সদগুণগুলিকে প্রকাশ করে। অভিপ্রায় চরিত্র থেকে কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। মানুষের অভিপ্রায় মানুষের চরিত্রকে প্রকাশ করে। কোনও মানুষের অভিপ্রায় হল চুরি করা, একথা বললে বুঝতে হবে যে লোকটি অসৎ। কোনও কারণে সে চুরি করতে বিফল হলেও চরিত্র বিচারে সে অসৎই থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ তার অভিপ্রায় তার চরিত্রকে প্রকাশ করছে। বস্তুত চরিত্র হল মানুষের মনের স্থায়ী প্রবণতা, যা সে অভ্যাসমূলক ঐচ্ছিক ক্রিয়া সাধন করে অর্জন করে। মানুষ নিজের চরিত্র নিজেই সৃষ্টি করে। সুতরাং অভিপ্রায় যে মানুষের চরিত্রের প্রকাশক - এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভালো ব্যক্তির অভিপ্রায় স্বভাবতঃই ভালো হয়। তাই কোনও ব্যক্তির চরিত্র জানা থাকলে তার অভিপ্রায় জানা সহজ হয়। নিজেদের অভিপ্রায় সম্পর্কে আমরা সাধারণত সচেতন থাকি। অন্যের কর্মের নৈতিক বিচারের সময় আমাদের নিজেদের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে তাদের অভিপ্রায় অনুমান করে নিই। উপরোক্ত উদাহরণে সোফির অভিপ্রায় সম্পর্কেও আমরা অবগত। নিজের সন্তানকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেওয়া কখনোই তার অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার একটি সন্তানকে বাঁচানোর জন্য অপর সন্তানকে নাৎসী প্রহরীর হাতে সমর্পন করতে সে বাধ্য হয়। সুতরাং নৈতিক দিক থেকে আমরা কখনোই সোফিকে দোষী সাবস্ত করব না। নৈতিক দ্বন্ধের এই আলোচনা থেকে আমরা একথা দাবি করতে পারি যে নৈতিক দ্বন্ধের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে নীতিগুলি বা যে কর্মগুলির মধ্যে দ্বন্ধ দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই সেরূপ ঘটে না বলে নীতিগুলি যে পরস্পর বিরোধী সে কথা আমরা বলতে পারি না। সত্য কথা বলা এবং প্রাণরক্ষা নামক উভয় কর্তব্যই অনেকক্ষেত্রে আমরা রক্ষা করি। কিন্তু যদি এমন কোনও পরিস্থিতির সন্মুখীন ব্যক্তি হয় যেখানে তাকে প্রাণরক্ষা করতে হল মিথ্যা বলতে হবে তবে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। একজন ব্যক্তি কোনও একটি বিকল্পকে, অপর ব্যক্তি অন্য বিকল্পকেও গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করতে পারে যদি উভয় বিকল্পই সমগুরুত্বপূর্ণ হয়। কারণ বার্নাড উইলিয়ামকে অনুসরণ করলে ববলতে হয় কর্ম পালনের ব্যক্তিগত যুক্তি বা ব্যাক্তিকে কর্ম সম্পাদনের প্রণোদিত করে তা ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বার্নাড উইলিয়ামস নিজেও মনে করেন একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী হওয়া সম্ভব। সুতরাং সিদ্ধান্ত যে সর্বদা সর্বজনীন হবে, নিশ্চিত হবে এমন দাবি করা যায় না। তবে আপাত দ্বন্দ্বমূলক ক্ষেত্রেগুলিতে কোনও একটি বিকল্পই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার সেখানে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা থাকে না। তবে যে সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সর্বজনীন হয় না, ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন বিকল্প চয়ন করতে সমর্থ সেখানে এই অনিশ্চয়তা কিন্তু নিন্দনীয় নয়, কারণ সিদ্ধান্তটি কোনও না কোনও যুক্তি দ্বারা পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিশ্চয়তা আশা করি কারণ আমরা মনে করি মূল্যগুলি স্থায়ী, আবহমানকাল ধরে অপরিবর্তিত। কিন্তু আধুনিককালের দার্শনিকেরা এই মনোভাবেরই বিরোধিতা করেন এবং সামাজিক পরিস্থিতি, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান অনুসারে তার নৈতিক ধারণার পরিবর্তনকে সঠিক বলে মনে করেন। আমাদের নীতিবোধ আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রভাব অবশ্যই বর্তমান থাকবে, কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে নতুন পরিস্থিতির আলোকে আমাদের মূল্যবোধ যথাযথ পরিবর্তনকে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত, তাকে স্বাগত জানানোই বাঞ্চনীয়।

সূত্র সংকেতঃ

1. Plato, Republica Book 1.331. p-5
2. Styron, William, Sophie's choice 1980, p-589

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

1. Foot, Philippa, 1983, "Moral Realism and Moral Dilemma," The Journal of Philosophy, 80:379-398; reprinted in Gowans (1987) : 271-200.
2. Kant, Immanuel, 1784 [1998], Groundwork of the Metaphysics of Morals, M. Gregor (ed. and transl.) Cambridge : Cambridge University Press. ---1965/1797. The Metaphysical Elements of Justice : Part 1 of the Metaphysics of Morals, Trans, John Ladd, Indianapolis : Bobbs-Merrill.
3. Nussbaum, Martha, 1986, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge : Cambridge University Press.

4. Plato, 1997, Plato : Complete Works.J Cooper (ed.) Indianapolis: Hackett Publishing Company.

—1930, The Republic, trans, Paul Shorey, in The Collected Dialogues of Plato, E. Hamilton and H. Cairns (eds.), Princeton : Princeton University Press.

5. Sartre, Jean-Paul, 1957/1946, "Existentialism is a Humanism," Trans, Philip Mairet, in Walter Kaufmann (ed), Existentialism from Destoevsky to Sartre, New York : Meridian, 287-311,

—1946, "Dirty Hands," in No Exit and Three Other Plays, New York : Vintage Books.

6. Sinnott-Armstrong, Walter, 1988, Moral Dilemmas, Oxford : Basil Blackwell

7. Styron, William, 1980, Sophie's Choice, New York : Bantam Books.

জীব বৈচিত্র্যে সুন্দরবন ঃ
একটি গতিশীল বাস্তুতন্ত্র (ঔপনিবেশিকোত্তর ভারত)

ড. প্রদীপ কুমার মণ্ডল

[বিষয় চুম্বক ঃ সুন্দরবন প্রকৃতির এক বৈচিত্রময় অঞ্চল। নানা প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী, বাদাবন আর তার কাছাকাছি মানুষের বসবাসের বিচিত্র এক মেলবন্ধনে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে জল-জঙ্গলময় পরিবেশে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের এক অভিনব গতিশীল বাস্তুতন্ত্র। এককোষী প্রাণী থেকে মেরুদণ্ডী পর্বের মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রায় সকল শ্রেণীর অজস্র প্রাণী-সমৃদ্ধ অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের এই বাস্তুতন্ত্র (Ecology of Sundarban)। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে লবণাক্ত জল ও মাটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে লবণাম্বু' উদ্ভিদের (Halophyte) যে অরণ্য সুন্দরবন, তাকে বলা হয় 'ম্যানগ্রোভ' (Mangrove) অরণ্য, আর স্থানীয় ভাষায় 'বাদাবন'। সুন্দরবনে ভূ-জৈব-রাসায়নিক-চক্র সমন্বিত গতিময় বাস্তুতন্ত্রে উপাদক ফাইটোপ্লাঙ্কটন (উদ্ভিদকণা) ও ম্যানগ্রোভস এবং প্রাথমিক, গৌণ ও প্রগৌণ খাদকের মধ্যে খাদ্য-শৃঙ্খল অত্যন্ত নিয়মিত এবং সুস্পষ্ট। তবুও, সুন্দরবনের প্রাণীকূলের মধ্যে এমন কিছু জন্তু-জানোয়ারের কথা জানা যায়, যাদের অস্তিত্ব এক সময় থাকলেও এখন আর তাদের দেখা মেলে না। আবার এমন অনেক উদ্ভিদ, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও পক্ষীদের উল্লেখ করা যায় যাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন

সুন্দরবনের বনজ সম্পদ, যেমন - বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, বাগদার মীন, মধু, মোম, বিভিন্ন রকমের ভেষজ উদ্ভিদ, ফল, কাঠ প্রভৃতির সাথে জড়িয়ে আছে স্থানীয় মানুষের জীবন ও জীবিকা। শুধু তাই নয়, কলকাতাসহ সুন্দরবন অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষকে বঙ্গোপসাগরের বুকে সৃষ্টি হওয়া অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের থেকেও যেমন রক্ষা করে চলেছে এই বাদাবন, তেমনি প্রকৃতি থেকে নীলকণ্ঠের মতো বিপুল পরিমাণ বিষবাষ্প শোষণ করে বিশ্ব-উষ্ণায়ণ রোধে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে প্রতিদিন। এছাড়া, সুন্দরবনের সুবিস্তৃত সবুজ বনানী পরিবেশকে শীতল করে, জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করে বৃষ্টিপাত ঘটানোর উপযুক্ত পরিবেশ ও আবহাওয়া তৈরি করে, যা এই অঞ্চলের কৃষিকর্মের পক্ষে সহায়ক। সর্বোপরি, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের কার্বন আত্তীকরণের বিরাট ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে এই জঙ্গলকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি আরও নিবিড়ভাবে ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদের কৃত্রিম বনসৃজন করাও আশু প্রয়োজন।

সূচক-শব্দ ঃ ভূ-প্রাকৃতিক পরিচয়, সুন্দরবনের বিপন্নতা, ম্যানগ্রোভস, বাস্তুতন্ত্র, জীব বৈচিত্র, লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় জীব, সুন্দরবনের গুরুত্ব**]**

ভারতীয় সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থান ঃ কর্কটক্রান্তির সামান্য দক্ষিণে ২১° ৩১' থেকে ২২° ৩০' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°১০'থেকে ৮৯°১৫' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলটি অবস্থিত।[১] ব্রিটিশ শাসনকালে সুন্দরবন বলতে হুগলী এবং মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী বরিশাল, বাখরগঞ্জ, খুলনা ও অবিভক্ত ২৪ পরগণার প্রায় সমস্ত অঞ্চল জুড়ে এক বিশাল ভৌগোলিক এলাকাকে বোঝানো হোত। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে ভারতীয় ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবনের আয়তন অনেকটা কমে এসেছে। সুন্দরবনের বেশিরভাগটা রয়েছে অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে। আর ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলটি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে দুটি জেলা দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যে। নোনা জলে পুষ্ট, নদী-জালিকা দিয়ে ঘেরা, ছোট-বড়ো অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবন যে অংশটি স্বাধীনোত্তর ভারতীয় মানচিত্রের ভিতরে আছে, সেখানে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে জঙ্গল কেটে চাষ-বাস গড়ে

Dr. Pradip Kumar Mondal, Assistant Professor, Dept. of History, Netaji Shatabarshiki MahaVidyalaya, North 24 Parganas.

তোলা হয়েছে, আর বাকি ৪৮টি দ্বীপ রয়েছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে, যেখানে কোনো জনবসতি নেই। এই বসতি এলাকা এবং আর সংরক্ষিত বনাঞ্চল মিলিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা সুন্দরবনের মোট আয়তন ৯৬৩০ বর্গ কিমি।

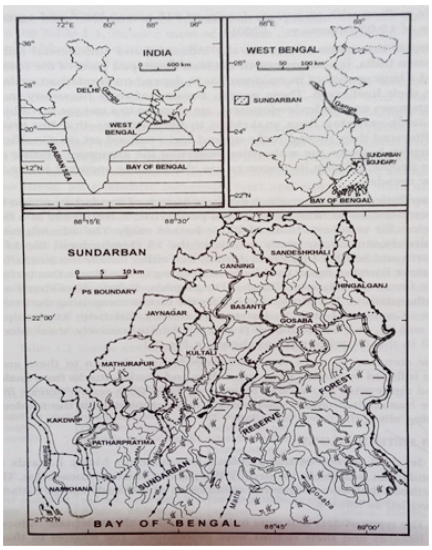

[ভারতীয় সুন্দরবন (source : Das C.S. & Bandyopadhyay S., Sharing Space : Human-Animal Conflicts in Indian Sundarbans, First Edition, 2012, Progressive Publishers, Kolkata, p.23)]

পরিবেশ পরিচিতিঃ

সুন্দরবন প্রকৃতির এক বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। নানা প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী আর বাদাবনের বিচিত্র এক মেলবন্ধনে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের জল-জঙ্গলময় ভৌগোলিক পরিবেশ। দিনে দু'বার লবণাক্ত জোয়ার-জলে ভিজে যাওয়া ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বনভূমি এই সুন্দরবন। এই বনভূমি মূলত আর্দ্র-ক্রান্তীয় বনভূমি (tropical Humid Forest)। পরিবেশ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দরবন একটি অভিনব গতিশীল বাস্তুতন্ত্র। সুন্দরবন ইতিমধ্যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষিত। আবার জীব ভূগোলের তত্ত্বানুযায়ী সুন্দরবন বাংলার বৃষ্টিস্নাত বনভূমি (Rain Forest)। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সুন্দরবন সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবেই স্বীকৃত [The IFA - 1972 came into force in Bengal and some other Provinces of India on 21.09.1927 - The Indian Forest Act (IFA), 1927 (Act XVI of 1927)][২]। 'দিনে দু'বার লবণাক্ত সামুদ্রিক জোয়ার জলে প্লাবিত হওয়ার দরুন সুন্দরবনের ভিজে মাটিতে সৃষ্টি হওয়া বনভূমির গাছগুলি চিরহরিৎ গোত্রের হয়েছে। সুন্দরবনের চিরহরিৎ লবণাক্ত উদ্ভিদের এই বনভূমি তাই চিরসবুজ উপকূলীয় বনভূমি নামেও পরিচিত।[৩] এত বৈচিত্র্যের কারণে IUCN* (International Union for Concern of Nature and Natural Resources) সুন্দরবনকে ১৯৮৪ সালে National Park রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। আবার UNESCO ১৯৮৭ সালে সুন্দরবনকে World Heritage Site রূপেও স্বীকৃতি দিয়েছে।[৪]

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে লবণাক্ত জল ও মাটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে 'লবণাম্বু' উদ্ভিদের (Halophyte) এই বিখ্যাত অরণ্য সুন্দরবন। লবণাম্বু উদ্ভিদের এই বনকে বলা হয় 'ম্যানগ্রোভ' (Mangrove) অরণ্য, আর স্থানীয় ভাষায় 'বাদাবন'। 'ম্যানগ্রোভ' শব্দটি পর্তুগীজ শব্দ 'ম্যাঙ্গু', স্পেনিশ শব্দ 'ম্যাঙ্গেল' ও ইংরেজি শব্দ 'গ্রভ' থেকে উৎপত্তি হয়েছে, এজন্য এর সঠিক কোনো বাংলা পরিভাষা পাওয়া যায় না। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বা অরণ্য এমন কতকগুলি বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদের সুষ্ঠু সুগাঠনিক সহাবস্থানের ফলে গড়ে ওঠে যা আবার জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব থেকে দূরে অন্যত্র এবং লবণহীন স্থানে সাধারণত জন্মায় না। অনুরূপভাবে অন্য প্রকৃতির উদ্ভিদ প্রজাতিরাও এই জোয়ার-ভাঁটাযুক্ত উচ্চ লবণের ম্যানগ্রোভ পরিবেশে জন্মাতে পারে না। এই বিশেষ কারণে ও বিশেষ বাস্তুরীতি অনুযায়ী ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদরা পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও অর্ধ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় (৩০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে) বলয়ের সমুদ্রোপকূলবর্তী

স্থানে, ছোট-বড়ো নদী মোহনায়, ব-দ্বীপ অঞ্চলে ও বিভিন্ন সামুদ্রিক দ্বীপাঞ্চলে একই জলবায়ুযুক্ত পরিবেশে জন্মায় এবং যেখানে জোয়ারের জল নিয়মিত পৌঁছায় এবং যে স্থান পলি-কাদা ও বালিকণা দিয়ে গড়ে ওঠে।

বিপন্ন ভারতীয় সুন্দরবন ঃ

সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল উভয়েই বৈচিত্র্যময়। তবে, কয়েকশত বছর আগের সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সাথে এখনকার সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের অনেক প্রভেদ রয়েছে। বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি সে সময় সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেদের দিব্যি মানিয়ে নিলেও পরবর্তীকালে তারা লোপ পেয়ে গেছে। এখন তাদের আদিম অস্তিত্বের একমাত্র প্রমান তাদের কঙ্কাল বা অস্থি। বুনো মহিষ, ব্রহ্মদেশীয় গণ্ডার, স্বর্ণমৃগ, বিশালকায় কুমির আজ আর সুন্দরবনে নেই। তেমনি উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরীবৃক্ষ (হেরিটিয়েরা ফোমিস) বা গড়িয়া (ক্যানডেলিয়া ক্যানভেল) উদ্ভিদও সুন্দরবনে আজ বিরল। পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের গভীর বনরাজি দুই শতকে প্রায় অর্ধেকে পরিণত হয়েছে। কারণ মানুষের হস্তক্ষেপ।[৫] বৃহত্তর সুন্দরবনের বাংলাদেশজ অংশে সুন্দরী গাছের উপস্থিতি এখনও যথেষ্ট দেখা গেলেও, ভারতীয় ভূ-খণ্ডে অবস্থিত সুন্দরবনে সুন্দরী গাছের উপস্থিতি খুবই কম। এর কারণ শুধুমাত্র বৃক্ষচ্ছেদন নয়। প্রধান কারণ জোয়ার-জলে ক্রমবর্ধমান লবণের মাত্রা। বর্তমানে শুধুমাত্র বর্ষা মরশুমে নদীবাহিত মিষ্টি জল দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনে পৌঁছায়। হিমালয় ও ছোটনাগপুর থেকে বয়ে আসা মিষ্টি জলের বিরাট উৎস মানুষের দ্বারা তৈরি কৃত্রিম-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুন হুগলী-ভাগীরথী নদী খাতে ওই জলের জোগান ভীষণভাবে কমে গেছে। এর ফলে সুন্দরবনে হুগলী-ভাগীরথী ও তার শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে মিষ্টি জলের প্রবাহ কম হওয়ার ফলে সেখানকার উদ্ভিদকুলের অনেকেই পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনে অপরাগ হচ্ছে। আর সেজন্যই সুন্দরী ও গড়িয়ার মতো উদ্ভিদের অস্তিত্ব ভারতীয় সুন্দরবনে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অপরদিকে, পদ্মা ও তার শাখা-প্রশাখার স্রোতে এখনো মিষ্টি জলের জোগান অব্যাহত থাকার ফলে বাংলাদেশের সুন্দরবনে সুন্দরী গাছসহ অপেক্ষাকৃত কম লবণসহিষ্ণু অন্যান্য ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলি ততখানি সঙ্কটপন্ন নয়। কিন্তু ভারতীয় সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভস আজ বিপন্ন। অথচ সুন্দরবনের এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানকে সমুদ্রে তৈরি হওয়া ঝড়ঝঞ্ঝা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে সক্ষম, তেমনি মাটির ক্ষয়রোধেও এই ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুন্দরবনের পরিবেশ প্রকৃতিতে ম্যানগ্রোভস-এর ভূমিকা ঃ

বিভিন্ন প্রজাতির প্রকৃতি ম্যানগ্রোভস ও ম্যানগ্রোভ-সহবাসী বা পশ্চাৎ-ম্যানগ্রোভস উদ্ভিদ লবণাক্ত জোয়ার-ভাঁটার এই অরণ্যে নানা ভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখেছে। প্রায় ৬৪টি ম্যানগ্রোভস ও তার সহবাসী প্রজাতি সমগ্র সুন্দরবনের উদ্ভিদকুলের সদস্য। শুধুমাত্র কাঠ উৎপাদন নয় - মধু উৎপাদন, বাঘসহ বিভিন্ন বন্য প্রাণীর বিচরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীদের প্রজনন, আশ্রয় — সমস্ত ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভস এর ভূমিকা রয়েছে।

সুন্দরবনের গতিশীল বাস্তুতন্ত্র ঃ

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র (Ecology) সর্বদা গতিশীল। দু-কূল ছাপিয়ে দিনে দু'বার করে জোয়ারের জল সুন্দরবনের লবণাম্বু উদ্ভিদের জঙ্গলে প্রবেশ করে। ফলে এই অঞ্চলের ভূমিরূপও পরিবর্তনশীল। ভূমিক্ষয় এখানকার নদনদীগুলির নিত্য প্রবাহের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আবার এই ভূমিক্ষয় কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করে গরাণ, বাইন, চাপাল-এর মতো উদ্ভিদরা। সুন্দরী গাছের অধিমূল, বাইন গাছের শ্বাসমূল (শূলো)[৬] মাটির উপরিভাগে বিন্যস্ত থাকে। লবণাক্ত এঁটেল মাটিতে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না বলেই শ্বাসমূলেরা মাটির উপরে উঠে আসে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য। সুন্দরবনের জঙ্গলে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই ধরণের শ্বাসমূল (Pneumatophores), অধিমূল বা ঠেস মূল (Stilt root), যাদের উপস্থিতির জন্য জোয়ার কিম্বা ভাঁটার সঙ্গে বয়ে আসা পলি ঐ সমস্ত মূলে আটকে যায়। ফলে পলি সঞ্চিত হতে হতে প্লাবিত চরভূমির উচ্চতা ধীরে ধীরে বাড়ে, সেই সাথে অপরিণত চরভূমি ক্রমশ পরিণত দ্বীপ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। নরম পলি স্তরে কেওড়া, হেঁতাল, সুন্দরী, গেঁওয়া, গর্জন, গরাণ, বাইন প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মায় বলে এই সকল উদ্ভিদ তাদের মূল বা শেকড়গুলিকে মাটিতে জালিকাকারে ছড়িয়ে দেয়, তাতে ভূমিক্ষয় রোধ হয়। এভাবেই বঙ্গভূমির দক্ষিণ প্রান্তে মানুষের বসতযোগ্য ভূমি তৈরিতে সহযোগী হয়ে উঠেছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ। আর তারই সংলগ্ন উঁচু ডাঙ্গার জঙ্গল কেটে বসত তৈরির ইতিহাসই নিম্নবঙ্গে জনপদ গড়ে ওঠার আদি ইতিহাস।[৭]

ভারতীয় সুন্দরবনে বিভিন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভ ও ম্যানগ্রোভসহবাসী উদ্ভিদের মধ্য থেকে উদাহরণ হিসেবে বেশ কিছুর নাম এখানে উল্লেখ করা হলো -

স্থানীয় নাম	বিজ্ঞানসম্মত নাম	স্থানীয় নাম	বিজ্ঞানসম্মত নাম
গর্জন	রাইজোফোরা মিউক্রোমেটা ল্যামার্ক	লতা হরগোজা	অ্যাকাস্থাম ভলুবিলিস ওয়াল
ভোরা বা ভরা	রাইজোফোরা এপিকুলেটা	বন জুঁই	ক্লিরোডেন্ড্রোম ইনারমি (লিন) গাটেন
কাঁকড়া	ব্রুগুইয়েরা জিমনোরইজা (লিন) ল্যামর্ক	হুদো	অ্যাক্রোস্টিকাম অরিয়াম লিন,
কাঁকড়া	ব্রুগুইয়েরা সেক্সাঙ্গুলা (লাউর) পয়ার	ধানী ঘাস	পোরটারেসিয়া কোয়ার্কটাটা টেকিওকা
মট গরাণ	সেরিওপস ত্যাগাল (পার) রবিন্স	বন ঝাউ	ট্যামারিক্স গ্যালিকা লিন,
জেলে গরাণ	সেরিওপস দেকান্দ্রা (গ্লিফিথ) ডিংহো	নোনা ঝাউ	ট্যামারিক্স ত্রাউপি হোল
গড়িয়া	ক্যান্ডেলিয়া ক্যান্ডেল (লিন) ড্রস	লাল ঝাউ	ট্যামারিক্স ডিওইকা রক্সবার্গ
জাত বান	অ্যাভিসিন্নিয়া অফিসিনালিস লিন,	নোনা কচু	পেন্টাট্রোপিস ক্যাপেনসিস বুল্লক
পেয়ারা বান	অ্যাভিসিন্নিয়া ম্যারিনা(ফ্রসকাল) ভিরাহ	বাউলে লতা	সারকোলোবাস ক্যারিন্যাটাস ওয়াল,
কাল বান	অ্যাভিসিন্নিয়া অ্যালবা ব্রুম	মান্দা লতা	হোয়া প্যারাসা ইটিকা ওয়াল
কেওড়া	সোন্নারেসিয়া অ্যাপেটালা বুচ হ্যাম	পরগাছা	ডেনড্রফথি ফালকেটা (লিন) ইটিং
ওড়া	সোন্নারেসিয়া গ্রিফিতি কার্জ	চুলিয়া কাঁটা	ডালবারজিয়া স্পাইনোজা রক্সবার্গ
ধুঁধুল বা ধোন্দল	জাইলোকার্পাস গ্রানাটাম কোয়েন	করঞ্জা	ডেরিস ইন্ডিকা বেনেট
পশুর	জাইলোকার্পাস মেকনজেনসিস পাইরি	পান লতা	ডেরিস ট্রাইফোলিএটা লাউর
আমুর	অ্যাগলাইয়া কুকুল্লাট পেলেগ্লিন	নাটা	সিজালপিনিয়া বন্দুক রক্সবার্গ
সুন্দরী	হোরিটিয়েরা ফোমিস বুচ হ্যাম	সিংগ্রিলতা	সিজালপিনিয়া ক্রিটা লিন,
তরা	অ্যাজিএলাইটিস রোটাণ্ডিফোলিয়া রক্সবার্গ	লতান বেগুন	সোলানাম ট্রাইলোবেটাম লিন,
খলসি	অ্যাজিসেরাস করনিকুলেটাম (লিন) ব্লাক্সো	যদুপালং	সেসুভিয়াম পরটুল্যাকাসট্রাম লিন,
কৃপাল	লুমনিটজেরা রেসিমোজা ওয়াইল ড	নোনা হাতিশুঁড়	হোলিওট্রফিয়াম কুরাসেভিকাম লিন,
গেঁওয়া	এক্সোকারিয়া অ্যাগালোচা লিন,	ছাগলকুঁড়ি	আইপোমিয়া পেসক্যাপরি সুইট
লতা সুন্দরী	ব্রাউনলোবিয়া ল্যানসিওল্যাটা বেন্থ	গিরিয়া শাক	সুয়েডা নুডিফ্লোরা রক্সবার্গ
বন লেবু	অ্যাটালানসিয়া কোরিয়াএম. রোয়েম	ভোলা	হিবিসকাস টিলিয়েসিইয়াস লিন,
গোলপাতা	নিপা থ্রুটিক্যানস ওয়ারম্ব	বনভেন্ডি	হিবিসকাস টুরটুওসাস রক্সবার্গ
হেঁতাল	ফোনিক্স লাপুডোজা রক্সবার্গ	নোনা ঝাঁঝি	রুপিয়া ম্যারিটিমা লিন,
হরগোজা	অ্যাক্সস্থাস ইলিসিফোলিয়াস লিন,	নোনা শাক	স্যালিকরনিয়া ব্যাক্রিয়েটা রক্সবার্গ

* তথ্যসূত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, কলকাতা, ২০০০, পৃ ৪২৫-৪২৭।

সুন্দরবনের বসত অঞ্চলের গাছগাছালি ঃ

সুন্দরবনের উদ্ভিদ বিষয়ক যে আলোচনা করা হলো তা অবশ্য এখানকার বাদা অঞ্চলের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। পাশাপাশি, বন কেটে যে বসত গড়ে তোলা হয়েছে সেই বসত অঞ্চলে জল-মাটির উপযোগী অনেক প্রজাতির গাছ-গাছালি লাগিয়েও সবুজ প্রকৃতি গড়ে তোলা হয়েছে। যদিও অধিকাংশ প্রজাতিগুলি মানুষের জীবিকা নির্বাহ ও আবাসিক প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই রক্ষা করবার চেষ্টা হয়েছে। তবে, এর বাইরেও অনেক প্রজাতির গাছগাছালি আছে যেগুলি প্রকৃতির কোপে স্বাভাবিক ভাবেই বেঁচে থাকতে পারে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল তথা বাংলার সমভূমি অঞ্চলে সাধারণ ভাবে পরিচিত প্রায় সমস্ত প্রকারের ফুল, ফল, এবং সব্জী, মশলা, ডাল, ভেষজ জাতীয় ও কাষ্ঠসমৃদ্ধ বিভিন্ন উদ্ভিদসহ বহু প্রজাতির উদ্ভিদ কম-বেশী দেখা মেলে সুন্দরবনের বসত এলাকায়।

প্রাণী বৈচিত্র্য ঃ

ঘন সবুজ ঘেরা জল-জঙ্গলময় সুন্দরবনের যে বিরাট বৈচিত্র্য, সেই বৈচিত্র্য প্রকৃতি শুধু তার উদ্ভিদরাজির (Flora) মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বৈচিত্র্যময় তার প্রাণীরাজ্যও (Fauna) ভারতীয় সুন্দরবনে protozoa বা আদ্যপ্রাণীসহ মোট ১৪৩৪ টি প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্বের সন্ধান মিলেছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে ৯৮৯ টি প্রজাতি অমেরুদণ্ডী শ্রেণীর, একটি প্রজাতি অপরিণত কর্ডাটা (hemichordata) শ্রেণীর প্রাণী এবং ৪৪৫টি প্রজাতি মেরুদণ্ডী শ্রেণীর প্রাণী (*So far, a total of 1434 species of protozoa and animals have been reported, comprising of 989 species of invertebrates, one species of hemichordates and 445 species of vertebrates.)।[৮] প্লারোব্রাকিইয়াম প্রজাতির টিনোফোরা পর্বের অন্তর্ভুক্ত আণুবীক্ষণিক এককোষী প্রাণী ন্যকটিলিউকা থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডী প্রাণী — হিংস্র বাঘ (রয়েল বেঙ্গল টাইগার) এবং হাঙর-কুমিরসহ বিভিন্ন ধরণের মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপ, শামুক, ঝিনুক, সরীসৃপ সুন্দবনের জীব পরিমণ্ডলের (Biosphere) সদস্য।

ভূ-জৈব-রাসায়নিক চক্র ঃ

সুন্দবনের ভূ-জৈব-রাসায়নিক-চক্র সমন্বিত গতিময় বাস্তুতন্ত্র উৎপাদক ফাইটোপ্লাঙ্কটন (উদ্ভিদকণা) ও ম্যানগ্রোভস এবং প্রাথমিক, গৌণ, ও প্রগৌণ খাদকের মধ্যে খাদ্য শৃঙ্খল অত্যন্ত নিয়মিত এবং সুস্পষ্ট। অহরহ বিয়োজোকের দ্বারা জৈব পর্দাথ অজৈব পদার্থে পরিণত হচ্ছে এবং তার জন্য পুষ্টির উপাদানগুলির পুনরাবর্তনের কারণে পুষ্টি প্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে সুন্দরবন।[৯] উল্লেখ্য এভাবে মাছ উৎপাদনে সুন্দরবন বিশ্বে তার নিজস্ব একটি জায়গা সে করে নিতে পেরেছে।

এককোষী থেকে মেরুদণ্ডী পর্বের মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রায় সকল শ্রেণীর অজস্র প্রাণী সমৃদ্ধ অঞ্চল নিয়ে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র (Ecology of Sundarban)। সুন্দবনের বাস্তুতন্ত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো উদ্ভিদকণা ও প্রাণীকণা। এ পযর্ন্ত সুন্দরবনে উদ্ভিদকণা বা ফাইটোপ্লাঙ্কটন-এর ৩৬টি প্রজাতি এবং প্রাণীকণা বা জুপ্লাঙ্কটন-এর ৫৯টি প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়ার ২২টি, শৈবাল ১৬টি এবং ছত্রাকের ১৮৪টি প্রজাতির শনাক্তকরণ হয়েছে।[১০]

সুন্দরবনের প্রাণীকুলের অনেকগুলি লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় ঃ

সুন্দরবনের প্রাণীকুলের কথায় এমন কিছু জন্তু-জানোয়ারের কথা জানা যায়, যাদের অস্তিত্ব এক সময়ে থাকলেও এখন আর তাদের দেখা মেলে না। আবার এমন অনেক স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও পক্ষীদের উল্লেখ করা যায় যাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। যেমন, সুন্দরবনের জঙ্গলে একসময় হাতি, গণ্ডার (গ্যাঁড়া), বুনো মোষ (বয়ার), বাইসন, চিতাবাঘ, সজারু প্রভৃতি বাস করত, কিন্তু এখন তাদের অস্তিত্ব শুধুমাত্র তাদের হাড়-কঙ্কাল ও জীবাশ্মে মেলে। 'আইন-ই-আকবরি'তে সুন্দরবনে হাতির অস্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন-এর মতে, ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সুন্দরবনে অনেক গণ্ডার ছিল। ১৯ শতকের মাঝামাঝি বা তারপরেও রায়মঙ্গল, ঝিলা প্রভৃতি নদীর মোহনায় বা তীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে গণ্ডারের দেখা মিলতো। কমল চৌধুরীর লেখা 'চব্বিশ পরগণা ঃ উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন' গ্রন্থে আচার্য প্রফুল্লচন্দের স্মৃতিচারণামূলক একটি লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত আছে। সেখান থেকে সুন্দরবনে গণ্ডারের উপস্থিতির বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়।

সেই সাথে একথাও জানা যায় যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যকালে তাঁর পিতা সুন্দরবনের শিকারিদের কাছ থেকে কখনো কখনো হরিণের মাংস ও গণ্ডারের মাংস উপহার হিসেবে পেতেন। তাঁর রচনাংশে রয়েছে - ''আমার বেশ মনে আছে হরিণের মাংসের ন্যায় কোমল না হইয়া গণ্ডারের মাংস বড়ই শক্ত বোধ হইত। গণ্ডারের মাংস শাস্ত্রমতে পবিত্র এবং আমাদের বাড়িতে গণ্ডারের খড়্গ পাথরে ঘষিয়া চন্দনের ন্যায় প্রলেপস্বরূপ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত এবং গণ্ডারের চামড়ায় তৈরী নানা রকমের ঢাল ছিল''।[১১]

সুন্দরবনে অস্তিত্ব রক্ষায় বিপন্ন বা লুপ্তপ্রায় কয়েকটি প্রাণী ঃ

স্তন্যপায়ী		সরীসৃপ	
প্রজাতির নাম	বিজ্ঞানসম্মত নাম	প্রজাতির নাম	বিজ্ঞানসম্মত নাম
মেছো বিড়াল	Prionalius Viverrian	মোহনায় কুমির	Crocodilus Porosus
লেপার্ড ক্যাটস	Felis Bengalensis	সামুদ্রিক অলিভ রিডলে কচ্ছপ	Lepidochelys Olivcea
ভারতীয় ভোঁদড়	Lutra Perpicillaza	গোসাপ	Varanus Salvetor
জলজ স্তন্যপায়ী যেমন —শুশুক	Platinista Gangetica	গোসাপ	V. Bengalensis V. Flaviseense
ইরাবতী ডলফিন	Orcella Bravirostris	-	-

সুন্দরবনের পক্ষীকুল ঃ

সুন্দরবনে পক্ষীকুলের মধ্যে একসময় প্রচুর শুকুনের দেখা মিলতো। আজ আর এদের দেখা মেলে না। সুন্দরবনের জঙ্গলে যে যে ধরণের পাখির দেখা মেলে তারা হলো - বিভিন্ন প্রজাতির হেরণ, ওপেন বিল স্টর্ক, মেছো বাজ, চিল, বালি হাঁস, পানকৌড়ি, সারস, কুচবক, মাছরাঙা, খড় হাঁস, ব্রাহ্মণী চিল, ছাতার পাখি প্রভৃতি। এছাড়া পায়রা, ঘুঘু, কাক, চড়াই, দোয়েল, কোকিল, ফিঙে, টিয়া, শালিখ, টুনটুনিসহ নানা প্রজাতির পাখিদের দেখা মেলে সুন্দরবনের বসত অঞ্চলে।

সুন্দরবনের জলজ প্রাণী (সম্পদ) ঃ

সুন্দরবনের নদী-নালায় লবণাক্ত জলে হাঙর (স্থানীয় ভাষায় 'কামট'), কুমিরসহ বহু প্রজাতির মাছ ও কাঁকড়ার উপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া, খয়রা, ফ্যাসা, আমুদি, ভেটকি, ট্যাঙরা, আড় ট্যাঙড়া, কানমাগুর, পাঙ্গাস, লটে (নিহেড়ে), বেলে, ভোলা, পারসে, ভাঙ্গরসহ বহু প্রজাতির মাছ রয়েছে। সেই সাথে শোল, কই, ল্যাঠা, মাগুর, সিঙ্গি, পুঁটি, মৌরলাসহ নানা প্রজাতির মিঠা জলের মাছ রয়েছে সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে। তবে, নয়না বা ন্যাদেস ও বোয়ালের মতো বেশ কিছু মাছ হারিয়ে গেছে সুন্দরবনের জনবসতি থেকে।

এখানকার জল-জঙ্গলময় প্রকৃতিতে অনেক প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। ১৯৮০-র দশক থেকে সুন্দরবনের নদী-নালায় জোয়ার জলে ভেসে আসা বাগদা মীন সংগ্রহ করে স্থানীয় দরিদ্র লোকেদের অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। তবে, ঘন নাইলনের জাল (স্থানীয় ভাষায় 'নেট-জাল') দিয়ে এই বাগদা মীন ধরবার সময় বাগদা চিংড়ির মীনের সাথে আরও অন্যান্য মাছের পোনা ধরা পড়ে, যেগুলি রক্ষা করবার চেষ্টা প্রায় হয় না বললেই চলে। এর ফলে, সুন্দরবনের নদীতে বা সমুদ্র বহু মাছ পোনা অবস্থাতেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যা সুন্দরবনের বাস্তুরীতির পক্ষে একটি বিশেষ সঙ্কট।

মৌমাছি ঃ

সুন্দরবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হলো মৌমাছি। বাদাবনের বুনো ফুলের আকর্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করে এই

মৌমাছি। সুন্দরবনে মৌমাছিদের উপস্থিতির দরুণ সঞ্চিত উৎকৃষ্ট মধু (চৈত্র মাসের পাঁচ মেশালি ফুলের মধু সব থেকে উৎকৃষ্ট) ও প্রাকৃতিক মোম সেখানকার একটি অর্থকরী সম্পদ।

অন্যান্য প্রাণী ঃ

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে রয়েছে আরও বহু প্রজাতির প্রাণী। বন বিড়াল, চিতল হরিণ, বুনো শুয়োর, শুশুক, বাঘরোল, বাঁদর, বড়ো বড়ো বাদুড়, সামুদ্রিক কচ্ছপ, বিষধর ও বিষহীন নানা প্রজাতির সাপ, গেছো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ প্রভৃতি।

বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীদের প্রজনন ক্রিয়ার স্থান বা আঁতুরঘর ঃ

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বা এই অরণ্যের পরিবেশ সামুদ্রিক ও স্থলজ জীবকুলের মাঝে এক মধ্যবর্তী অবস্থা (interphase) বা সংযোগ রক্ষাকারী বাস্তুতন্ত্র হয়ে উঠেছে। বহু সামুদ্রিক প্রাণী, অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রজাতির আদর্শ বাসস্থান বা বিচরণভূমি এই ম্যানগ্রোভ বনভূমি। খাদ্যের অন্বেষণে, প্রজনন ক্রিয়ার তাগিদে বা আঁতুড়ঘর রূপে ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে বেছে নেয় বহু প্রজাতির সামুদ্রিক তথা মোহনার জীব, পক্ষী ও কিছু কিছু স্থলজ প্রাণী।[১২]

উপসংহার ঃ

সুন্দরবনের বনজ সম্পদ, যেমন - বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, বাগদার মীন, মধু, মোম, বিভিন্ন রকমের ভেষজ উদ্ভিদ, ফল, কাঠ প্রভৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় মানুষের জীবন ও জীবিকা। শুধু মানুষ নয় বহু বিলুপ্ত-প্রায় প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল হলো সুন্দরবনের এই জল-জঙ্গলময় পরিবেশ। কলকাতাসহ সুন্দরবন অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষকে বঙ্গোপসাগরের বুকে সৃষ্টি হওয়া অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের থেকেও যেমন রক্ষা করে চলেছে এই বাদাবন, তেমনি প্রকৃতি থেকে নীলকণ্ঠের মতো বিপুল পরিমাণ বিষ-বাষ্প শোষণ করে বিশ্ব-উষ্ণায়ণরোধে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে প্রতিদিন। শুধু তাই নয়, সুন্দরবনের সুবিস্তৃত সবুজ বনানী পরিবেশকে শীতল করে, জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করে বৃষ্টিপাত ঘটানোর উপযুক্ত পরিবেশ ও আবহাওয়া তৈরি করে, যা এই অঞ্চলের কৃষিকর্মে পক্ষে বিশেষ সহায়ক। সর্বোপরি, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের কার্বন আত্তীকরণের বিরাট ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে এই জঙ্গল রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি আরও নিবিড়ভাবে ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদের কৃত্রিম বনসৃজন করাও আশু প্রয়োজন।

<u>সূত্র সংকেত</u> ঃ

১. Das C.S. & Bandyopadhyaya S. Sharing Space : Human-Animal Conflicts in Indian Sundarbans, Progressive Publishers, First Edition, 2012, Kolkatam, p. 22.

২. Directorate of Forest; 150 Years of Forestry (1864-2014), Published by Directorate of Forest, Aranya Bhawan, 2014, Kolkata, p. 85.

৩. দাস গৌতম কুমার, সুন্দরবন ঃ মানুষ ও পরিবেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটরস, কলকাতা, পৃ ঃ ১

৪. https:/en.m. wikipedia.org>wiki(Google search : Sundarbans National Park).

৫. নস্কর কুমুদরঞ্জন - পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ঃ প্রকৃতি ও পরিচিতি, 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা, ২০০০, পৃঃ ৪০৫

৬. টীকা ঃ 'শূলো' - বাইন গাছের শ্বাসমূলের অংশবিশেষ মাটির উপরভাগে মাথা তুলে শূলের মতো উঁচু হয়ে থাকে। মাটির উপর উঠে আসা শ্বাসমূলের এই অংশ-এর মতো দেখতে, তাই স্থানীয় লোকেরা একে 'শূলো' বলে থাকে।

৭. ভট্টাচার্য শীলাঞ্জন, 'প্রকৃতি নিরবে তৈরি হচ্ছে' , আনন্দবাজার দৈনিক পত্রিকা, ১৯শে মার্চ, ২০০৯, পৃঃ ৪

৮. Das A.K. and Nandi N.C. - 'Fauna of the Indian Sundarban Mangals and their role in the Ecosystem', Guha Bakshi /D.N. Sanyal P. & Naskar K.R. (Ed.) - Sundarban Mangal, 1999 , Kolkata, pp.n 418-47

৯. দাস গৌতম কুমার, সুন্দরবন ঃ মানুষ ও পরিবেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটরস, কলকাতা, পৃ ঃ৪২

১০. দাস গৌতম কুমার, সুন্দরবন ঃ মানুষ ও পরিবেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটরস, কলকাতা, পৃ ঃ৪২

১১. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভিত্তিক স্মৃতিচারণামূলক রচনার থেকে উদ্ধৃতাংশ, দ্রষ্টব্য - চৌধুরী কমল, 'চব্বিশ পরগণা ঃ উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন', দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৪০৪

১২. নস্কর কুমুদরঞ্জন - পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ঃ প্রকৃতি ও পরিচিতি, 'পশ্চিমবঙ্গ', পত্রিকা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা, ২০০০, পৃঃ ৪১৫

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ক্ষিতিমোহন সেন

ড. অরুণিমা বিশ্বাস

[বিষয়-চুম্বক ঃ *ক্ষিতিমোহন সেন -- পণ্ডিত পর্যটক অধ্যাপক এবং সর্বাপেক্ষা সমাজ সচেতন এক অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসাবে শান্তিনিকেতন সহ ভারতবর্ষের বিদ্বান ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত ও পরিগণিত হয়ে থাকেন আজও। তাঁর একনিষ্ঠ পরিশ্রম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি গভীর নির্ভরশীলতা তাঁকে আজকের বিশ্বভারতীর এক অনিবার্য ভাস্কর করে তুলেছিল। বিদ্যাচর্চার যে অন্যতর ও অনবদ্য এক মহাবিশ্বের মত পৃথিবী বর্তমান, ক্ষিতিমোহন সেনেদের মতো মানুষেরা তা মহাকালকে সাক্ষী রেখে আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে চলেছেন এবং এই আলোর পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ছায়াটুকুই আমার এই আলোচনার অন্তর্গত-ক্ষেত্র। তাঁর বৃহৎ জীবন-যাপনের, বিদ্যা-চর্চার, সমাজ-বোধের এবং সর্বোপরি মানবমানস-চর্চার সামান্য কিছু পরিসরকে আমাদের পাঠককুলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং অপরিচিতের কাছে পরিচিতির পথ খুলে দেওয়ার মধ্যেই এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি তার রাজ্য-রাজত্ব বিস্তার করেছে। সেখানে এ প্রবন্ধ অথবা আলোচ্য মানুষটির নয়; বরং প্রাবন্ধিকের মননে আলো পড়েছে সুনিবিড়—আর এইটুকু এ লেখার একমাত্র সার্থকতা।*

সূচক-শব্দ ঃ *ক্ষিতিমোহন, বিদ্যার ভার নয়, শিক্ষার আলো, বিশ্বভারতীর রূপকার, গুরুদেবের ভাবশিষ্য, নিঃস্বার্থ, নিরহংকারী বিরল ব্যক্তিত্ব***]**

অধিকাংশ প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রাথমিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যকে উদ্ধৃতি করে তুলে ধরা আমাদের অন্যতম অস্বাস্থ্যকর অভ্যেসে পরিণত হয়ে গেলেও, আবারও সেই একই বদভ্যাসের পুনরাবৃত্তি এ লেখাতেও করতেই হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে লেখকের পক্ষের যুক্তিও কিন্তু নিছক তুচ্ছ নয়। কারণ যে মানুষটি সম্বন্ধে আমাদের আজকের আলোচনা এবং বিস্ময় -- যুগপৎ বিস্তারলাভ করবে;তাঁর জীবনের অন্যতম আবিষ্কারক ছিলেন 'গুরুদেব' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - স্বয়ং। এমনকি তাঁর বিষয়ে আলোচনার সূত্রে আপ্লুত হয়ে তিনি এও বলেছিলেন যে -- ''তাঁর সাহিত্যনুরাগ ও বিদ্যাবুদ্ধির কথাতেই যে আমি উৎসাহিত হয়েছি তা নয়, এঁর মধ্যেও ঐ লোকপ্রেমের সংবাদ পেয়েছি। ... লোকসেবার উৎসাহ তাঁর পক্ষে যে কিরকম স্বাভাবিক সেইটে জেনেই আমি তাঁকে বোলপুরে আবদ্ধ করতে এত উৎসুক হয়েছি।... সুশিক্ষিত সুযোগ্য এম.এ. ডিগ্রীধারী বেতন দিলেই পাওয়া যায়, কিন্তু যে জিনিসটা পুঁথিগত নয়, সেটা আমাদের দেশে কত দুর্লভ তা' তো জানো।''

এ কথা তাহলে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া সমীচীন, ক্ষিতিমোহন সেন (২ ডিসেম্বর, ১৮৮০-১২ই মার্চ, ১৯৬০) হলেন বাংলা সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের এমন একজন মানুষ, যিনি অফুরান মেধা ও মনন নিয়েও তপস্বীর মতো জীবনাচরণে অভ্যস্ত থেকেছেন আমৃত্যু। আর এই বিদ্বান মানুষটির কাছে শান্তিনিকেতন ছিল এক মহাবিশ্ব -- যেখানে বসবাস করতেন তাঁর সেই পরমাত্মীয়; যিনি তাঁকে তাঁর 'আকার' প্রদান করেছেন -- ''আমরা ছিলাম মাটির তাল, গুরুদেব আমাদের হাতে ধরে গড়ে পিটে তৈরি করে নিয়েছেন - তিনি না থাকলে আমরা কিছু হতাম না।'' না, আজ আমরা নিশ্চতভাবে জানি যে ক্ষিতিমোহন সেন 'মাটির তাল' নয়; বরং তিনি ছিলেন আপাদমস্তক এক 'সোনার তাল' - আর সে সোনা ''কাঁচা সোনা''। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন -- ''ক্ষিতিমোহনবাবু মাটির তাল নন, সোনার তাল। রবীন্দ্র প্রতিভার বহ্নিস্পর্শে সে স্বর্ণাভা উজ্জ্বলতর হয়েছে। ক্ষিতিমোহনের প্রতিভা তিনিই আবিষ্কার করেছেন এবং প্রতিভাকে উদ্দীপিত করার জন্য যে উৎসাহ ও প্রেরণা আবশ্যক তাও তিনি যুগিয়েছেন। ... তাহলেও বলব ক্ষিতিমোহনবাবু শুধু

Dr. Arunima Biswas, Guest Lecturer (P.G. Section), Dept. of Bengali, Uluberia College, Howrah

পাণ্ডিত্য নয় অন্যান্য যে সব অনন্যসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন তাতে তাঁর প্রতিভার যে কোনো স্থানে যে কোনো অবস্থাতেই হতে পারত।"

ক্ষিতিমোহনের মতো মানুষেরা 'বিদ্যেবুদ্ধিকে'সহজ কথায় সংজ্ঞয়িত করতে গেলেও ডাক পাঠাতে হয় সেই জোব্বাধারী মানুষটিকেই। কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি। আর সেই আলোতে ভর করেই ক্ষিতিমোহন খালি পায়ে হাতে বই-খাতার থলিটি ঝুলিয়ে বছরের পর বছর; যুগের পরে যুগ ধরে হেঁটে ফিরেছেন শান্তিনিকেতনের আনাচ-কানাচ জুড়ে। পথে চলতে চলতে যাকে চোখে পড়েছে; তারই সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটো ভালো-মন্দের কথা বলেছেন। সে কথায় কখনো মিশে থেকেছে স্নেহময় হাসি, আবার কখনো তাতে যোগ হয়েছে ভালোবাসার অভিভাবকত্ব। ''শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বিশ্বভারতী পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দুই বাহুস্বরূপ --বুদ্ধদেবের দুই প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত এবং মৌদ্গাল্যায়নের অনুরূপ রবীন্দ্রনাথের দুই শিষ্য ছিলেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন।" অতএব যে প্রত্যাশায় আর আকাঙ্ক্ষায় স্বয়ং গুরুদেব ১৯০৮ সালের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁকে, তারই বিমূর্ত ছবি আঁকা হয়ে থেকে গেছে এই মানুষটির প্রতিদিনকার স্বভাবধর্মে। প্রাচীন শান্তিনিকেতনের সেই যে অনাড়ম্বর আর আনন্দময় জীবন তথা জ্ঞানচর্চার ইতিহাস, সেই ঐতিহ্যের সবথেকে বড় রূপকার আর সংরক্ষকও হয়ে রয়ে গিলেন এই মানুষটি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে গুরুদেবকে দিয়ে রাখা সেই অঙ্গীকার তিনি যে শুধু নিষ্ঠাভরে পালন করেছিলেন তাই নয়; তাঁর জীবনের এবং মননের সমস্ত মূলধনকে তিনি অকাতরে, অপার ভালোবাসায় মিশিয়ে দিয়েছিলেন সেই মাটির সঙ্গে। এবং সেই থেকেই তিনি শান্তিনিকেতনের আর শান্তিনিকেতন - তাঁর।

আসলে এ যেন এক বিনিসুতোর স্মৃতির মালা, যে মালার প্রতিটি ফুলের গল্প-কথকতা-গান সবই পৃথক কিন্তু সংলগ্ন। কখনো আপাত চোখে সে স্মৃতির মূল্য তুচ্ছ; আবার কখনো বা সেসবের গুরুত্ব আমাদের মতো সাধারণের কাছে অপরিসীম। এই যেমন -- ১৯০৮ সালের বর্ষাকাল। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' কিনা জানা নেই, তবে ক্ষিতিমোহন কিন্তু বর্ষাকালেই এসে পৌঁছেছিলেন শান্তিনিকেতনের দোরগোড়ায়। সেই স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন - ''বোলপুর স্টেশনে যখন নামি, তখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় রাত্রি। আর তার পরের দিনের প্রভাতও কম স্মরণীয় নয়। বোলপুর থেকে পায়ে হেঁটে শান্তিনিকেতনের কাছে এসে শুনি উদাত্ত কণ্ঠের গান -- 'আপনি জাগাও মোরে।' দেহলী নামে তাঁর গৃহের দ্বিতলে দাঁড়িয়ে কবি গান ধরেছেন। আজও সেই গানের সুর আমার কানে লেগে আছে।" অতঃপর সেই সুরকেই সঙ্গী করে তিনি নিজের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ হয়ে, আর অবসর গ্রহণের সময় তিনি ছিলেন সেখানকার অস্থায়ী উপাচার্য। জীবনের একেবারে উপান্তে এসেও তাঁর ভালোবাসায়, তাঁর অন্তরাত্মায় কবির সেই প্রথম ভোরের বাণীটুকু একেবারে একাকার হয়ে রয়ে গিয়েছিল -- ''এখন ভাবি, ২০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটানা ৩৪ বৎসর গুরুদেবের সঙ্গে কাজ করিবার এবং ঘন সান্নিধ্যে আসিবার পরম সৌভাগ্য কয়জনের ঘটিয়েছে?" আবার অন্যদিকে এই আশ্রমের উত্তরসূরিরাও বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম-দর্শন, কাব্য-অলংকার এ নিয়ে গুরুদেব সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন তাঁর 'পরিবারের' দুই পণ্ডিতের সঙ্গে। এঁদের একজন হলেন ক্ষিতিমোহন সেন এবং অন্যজন হলেন স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়।এই বিশ্বভারতীর নির্মাণেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচিব ছিলেন বিধুশেখর এবং ক্ষিতিমোহন। আজ হয়তো বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর করে, তবে সে মূল্য যতই বৃহৎ হোক না কেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ক্ষিতিমোহন সেন যে মূলধন তাঁদের গুরুদেবের পদপ্রান্তে রেখেছিলেন, তার উপর নির্ভর করে চিন্ময়-মৃন্ময় ধ্যানে এবং কর্মকাণ্ডে -- অদ্যকার ব্রহ্মচার্যাশ্রম বিশ্বভারতী।... এঁদের কাছে বিশ্বভারতী চিরঋণী'।

তথ্য বলছে, ক্ষিতিমোহনের জন্মের তারিখ ২ ডিসেম্বর, ১৮৮০। এঁদের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বৈদ্যপ্রধান সমৃদ্ধ গ্রাম সোনারঙ্গে। সংস্কৃত চর্চার নাকি বিশেষ ঐতিয্য ছিল এই গ্রামের। সেই গ্রামেরই নাম করা এক অধ্যাপক বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ক্ষিতিমোহন। তাঁদের পরিবার সেখানে নিষ্ঠাবান ও আচারপরায়ণ বলে বিখ্যাত ছিল ঠিকই, তবে তার চেয়ে বেশী খ্যাতি ছিল তাঁদের পাণ্ডিত্যের। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যার তুলনায় অর্থের প্রাচুর্য সেখানে ছিল না বললেই চলে। তবে ক্ষিতিমোহনের চোখে তাঁর শৈশবের যে কোনো স্মৃতি মানেই তা মহাপুণ্যভূমি কাশী। ''কাশী আমার জন্মভূমি, শিক্ষাভূমি, গুরুস্থান। এই স্থানে আমি চিরবালক।" এই কাশীর পরিমণ্ডলেই বাল্য-কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে তাঁর। আর সেখানেই তিনি মিলিত হয়েছেন; পরিচিত হয়েছেন এমন সব সাধু-সন্ন্যাসী-ভক্ত-সাধক কিংবা

মহাসাধকদের সঙ্গে -- যাঁদের জীবনে, ধর্মে ও ভক্তিতে সংকীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। আর তাই-ই হয়তো সেই বালক বয়সের অন্তর, অবচেতনেই তাঁর বহির্দৃষ্টিকে অন্ধ হতে দেয়নি, মুক্তমনে দেখতে শিখিয়েছে পৃথিবীর সমস্ত আলো আর অন্ধকার -- উভয়কেই। হয়তো সেই কারণেই ধর্মতান্ত্রিকতার মোহও যেমন এই মহাজীবনকে আচ্ছন্ন করেনি, তেমনি সংস্কারমুক্ত মনের অতি শুদ্ধতার গোঁড়ামিও সে মনের চলার সহজ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিতেও ক্ষিতিমোহনের ঠিক এই অবয়বটিই ধরা পড়েছিল বারবার; 'শিক্ষক' চিনে নিতে 'কবি' কখনো কোনো ভুল করেননি বলেই মনে হয় – ''তিনি যদিও প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ, তথাপি আচরণে তিনি অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন এই ঔদার্য তিনি শাস্ত্র হতেই লাভ করেছেন। হিন্দুধর্মকে যাঁরা নিতান্ত সংকীর্ণ করে অপমানিত করেন তাঁদের মধ্যে এঁর দৃষ্টান্ত হয়তো কাজ করবে। অন্তত ছাত্রদের মনকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করবার পক্ষে ইনি অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন।'' সংকীর্ণতার এই তীব্র ভেদাভেদ–সে দূরত্বকে মুছে ফেলার যে শিক্ষা সেই সাধনার প্রবর্তকই তো হতে চেয়েছিলেন আমাদের বিশ্বকবি। পরিপার্শ্বের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে মানুষের, শিক্ষার সঙ্গে আচরণের, ধর্মের সঙ্গে লোকজীবনের যে ফারাক - সেই পার্থক্যকে লীন করে এক স্বপ্নময় ভারতবর্ষের সন্ধানে গড়ে উঠেছিল তাঁর 'শান্তিনিকেতন'। আর তাঁর এ স্বপ্ন-রূপায়ণের অন্যতম কারিগর অবশ্যই আমাদের আলোচ্য এই মানুষটি। ''রবীন্দ্রনাথ সেদিন মগ্ন বিস্ময়ে ক্ষিতিমোহনকে আবিষ্কার করেছিলেন; ব্যক্তিকে নয়, ব্যক্তি-চরিত্রের গভীরে তাঁর চিরস্বপ্নের মানুষের ধর্মকে - যা নিরন্তর ধারায় যুগ যুগ ব্যাপী মানব-ইতিহাসের বহমানতা।''

দিনের শেষে সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, নির্দিষ্ট কোনো প্রতিভা অথবা কর্মজীবনের নিরিখে তাঁর যোগ্যতা কিংবা অবস্থান নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য কাজ নয়। কারণ একদিকে যেমন তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত, অন্যদিকে মধ্যযুগের সন্ত-ধর্মের প্রচারক, রবীন্দ্রসাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক, বৌদ্ধধর্মের গবেষক, বাউল-ফকির গানের তত্ত্বসন্ধানী সংগ্রাহক, শব্দতাত্ত্বিক,প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার নিষ্ঠাবান ব্রতী, স্নেহময় অধ্যাপক, অসামান্য বাগ্মী ও অলৌকিক এক কথক। তাছাড়াও গান-নাটক-অভিনয়-অলংকার শাস্ত্রেও ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যায় যে, ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন সত্যিকারের সেই বিদ্বজ্জন, যিনি ভারতের অখণ্ড সত্তাকে ইতিহাস ও সত্যের আলোয় চিরভাস্বর করে রেখে যাওয়ার প্রয়াস করে গেছেন আজীবন। আর তাঁর মৃত্যুর পরদিন ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ বাংলা এবং ইংরেজির সব সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা হল - 'বাংলা আজ দরিদ্র। তার উপর ক্ষিতিমোহনের তিরোধানে বলতে ইচ্ছা হয় একে একে নিবিছে দেউটি।' তাঁর ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন - ''আমরা যারা বাল্য বয়স থেকে ক্ষিতিমোহন সেনের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছি এবং আশ্রমবাসী সকলেই যারা সেদিনও পর্যন্ত এখানকার সর্বজনপূজ্য আচার্যশ্রেষ্ঠরূপে [তাঁকে] পেয়ে সংকটের সর্বশ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী জেনে মনে মনে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতাম, আজ তাদের শোক সবচেয়ে বেশী।'' এ শোক কিন্তু কেবল তাঁর নয়, আপামর ভারতবর্ষেরও। আর সে দুঃখ তাঁর মৃত্যুর শোককে অতিক্রম করে আজ আরও এক অন্যতর অবসাদে পৌঁছে দেয় আমাদের। কী সে অবসাদ! ধর্মকে অস্ত্র করে; সম্প্রদায়কে হাতিয়ার করে আমার জন্মভূমি জুড়ে যে কদর্যতম ভেদ-বিশ্লেষণের চিত্রনাট্য রচিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত; ক্ষিতিমোহনের মতো মনীষাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই এখন সে চক্রব্যূহকে ভেঙে ফেলা বড় সহজসাধ্য ছিল। আজ এঁরা অনুপস্থিত, আর আমরা অসহায় অথবা তাঁর মতো সেই 'তিমিরবিদারী অলখ-বিহারী কৃষ্ণমুরারী আগত ঐ' এর তীব্র অপেক্ষায়, যে মানুষটি তাঁর 'গুরুদেবের' সুরকে শিরোধার্য করে শেষাবধি ধর্মের আচরণকে ব্যক্ত করেছিলেন আর কিছু নয় -- কেবল 'গীতাঞ্জলি' দিয়ে -

"Leave this changing and singing and telling of beads! Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee! He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path-maker is breakng stones."

<u>সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকা</u> ঃ

১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; শান্তিনিকেতনের এক যুগ; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলকাতা; ২০১২ প্রকাশকাল ১৯৮০;

২. সৈয়দ মুজতবা আলী, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; সং-ষোড়শ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২১; প্রকাশকাল দোলযাত্রা, ১৩৮৮;

৩. প্রণতি মুখোপাধ্যায়; ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; প্রকাশকাল ১৯আগস্ট, ১৯৯৯

৪. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি (১১ চৈত্র, ১৩১৪ ,২৪/৩/১৯০৮)

৫. 'মনীষী ক্ষিতিমোহন'; সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; যুগান্তর; ২০মার্চ, ১৯৬০

৬. 'নিত্যপথিক ক্ষিতিমোহন'; নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়;শারদীয়া দেশ, ১৪০৩

‘মন্দ্রিত তব ভেরী’ ঃ
নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে সিপাহী-বিদ্রোহ প্রসঙ্গ

প্রীতম চক্রবর্ত্তী

[**বিষয়-চুম্বক** ঃ *সিপাহী বিদ্রোহ অনতিদূর কাল বাংলা ছোটগল্পের সূচনা। কিন্তু প্রাথমিক পর্বে সেই রাজনৈতিক বিষয়টি বাংলা ছোটগল্পে চর্চিত হয়নি। আরও পরে, জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও স্বদেশচেতনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গল্প-উপন্যাস এমনকি নাটকের বিষয় হিসেবে এসেছে সিপাহী বিদ্রোহ। এখানে নির্বাচিত চারটি গল্পের বিশ্লেষণ করা হল, যেখানে শুধু ইতিহাসচেতনা বা স্বাজাত্যবোধ নয়, মানবতাবাদের সূক্ষ্ম সুরের অনুরণন ঘটেছে।*

সূচক-শব্দ ঃ *ছোটগল্প, সিপাহী বিদ্রোহ, স্বর্ণকুমারী দেবী, মিউটিনি, প্রমথনাথ বিশী, ছিন্নদলিল, নানাসাহেব, মহাশ্বেতা দেবী, লছমনের মা*]

১

‘**কত দিনের সাধনফলে**’ ...

জাতকের গল্প বা পঞ্চতন্ত্র, রূপকথা বা উপকথা - বাংলা ছোটগল্পের উৎস সন্ধানে প্রাচ্য ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা লোক-উপাদান, যে দিকেই তাকানো হোক, ঔপনিবেশিক ভারতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই সংরূপটির যথার্থ সৃষ্টি। অর্থাৎ — ‘উনিশ শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পত্রিকা-বাহিত এই নতুন সাহিত্য সংরূপ যখন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজের পরিসর গড়ে নিচ্ছিল প্রায় সেই একই সময়ে বাংলা সাহিত্যেও প্রাচীন কথা বা গল্প বিবর্তনের পথ ধরে আধুনিক ছোটগল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিল।’[১] বিদেশী ছোটগল্পের উৎসপথ চিহ্নিত করে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভবের প্রেক্ষাপটটিকে ভূদেব চৌধুরী চিহ্নিত করেছেন এভাবে --

> বাংলা সাহিত্যেও ছোটগল্পের প্রথম অসচেতন বিকাশ সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার প্রয়োজনের পথ বেয়ে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের সীমায় সাহিত্যের সকল শাখারই একটি হ্রস্ব হলেও পূর্ণাঙ্গ আস্বাদন পরিবেশন করা সাময়িক সাহিত্য-পত্রের সাধারণ আগ্রহ। উপন্যাসের আধারে গল্পরস পূর্ণাঙ্গ হলেও সাময়িক পত্রিকার বহু রুচি-চারণের পক্ষে তার পরিধি অতিমাত্রিক। অতএব, সীমিত পরিসরে অনুবৃত্তিহীন সম্পূর্ণ গল্প পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষাতেই ছোট আকৃতির উপন্যাস বা বড়গল্প (Novelette) জাতীয় রচনা বাংলা সাহিত্যে বহুল প্রচলিত হয়ে পড়ে। এইসব ছোট আকারের গল্পের বাহুল্য থেকেই শিল্পীর অবচেতনার মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তে বাংলা ছোটগল্প প্রথম জন্মলাভ করে। অতএব বাংলা ছোটগল্পের প্রথম জনয়িতা যিনিই হোন না কেন, সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকাই তাঁর প্রথম যথার্থ ধাত্রী।[২]

বোঝা যায়, বাংলা ছোটগল্পের ‘প্রথম জনয়িতা’র পরিচয় ও প্রকাশ ‘মুহূর্তে’র কাল সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য কিছুটা সন্দিহান। তথাপি আধুনিক ছোটগল্পের প্রথম সার্থক নির্মাতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করা হয় এবং আধার ও আধেয়র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পেরিয়ে ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘দেনাপাওনা’ (১৮৯১) গল্পটিকে বাংলায় প্রথম শিল্পসম্মত ছোটগল্পের মান দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও ভূদেব চৌধুরী জানাচ্ছেন --

> ‘... প্রথম সার্থকনামা বাংলা ছোটগল্প আবির্ভূত হয়েছিল ‘বঙ্গদর্শনের’র পৃষ্ঠাতেই। গল্পটির নাম ‘মধুমতী’,

Pritam Chakraborty, SACT-1, Dept. of Bengali, Uliberia College, Howrah

প্রকাশকাল ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস ('বঙ্গদর্শন' ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা)। গল্পের নিচে লেখকের নাম লিখিত ছিল 'শ্রী পূঃ' --ইনি ছিলেন বঙ্কিম - সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'মধুমতী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থনামা ছোটগল্প, কিন্তু তা স্রষ্টার অবচেতন মনের রচনা। 'বঙ্গদর্শনে' রচনাটিকে 'উপন্যাস' নামে পরিচিত করা হয়েছে। মূল গল্পাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন কাহিনির প্রভাব অনায়াসে চোখে পড়বে, -- বিন্যাস এবং ভাষাভঙ্গিতেও তাই। তাছাড়া মনে হয়, 'ইন্দিরা'র মতোই সংক্ষিপ্ত গল্প বা উপন্যাস হিসেবে কাহিনিটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শনে' 'ইন্দিরা'র বিস্তার প্রায় ১৮ পৃষ্ঠা; 'যুগলাঙ্গুরীয়' সমাপ্ত হয়েছে কিঞ্চিৎ অধিক ১৫ পৃষ্ঠায়। সেই একই আকারের মুদ্রিত পৃষ্ঠায় ১৪টির কিছু বেশী জুড়েছে 'মধুমতী'। কিন্তু আকৃতি সংক্ষিপ্তির জন্যেই 'মধুমতী' ছোটগল্প নয়; স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির হ্রস্বতা ও আপেক্ষিক সীমায়তিই বরং যথার্থ ছোটগল্পের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরিত করেছে।'[৩]

যদিও এই গল্পের সমাপ্তি প্রসঙ্গে সরোজমোহন মিত্র লিখেছেন -

'বস্তুত এই গল্পের আর কিছুই বাকি রইল না। সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল। এটা ছোটগল্পের ধর্ম নয়। Anecdote এর ধর্ম। কারণ 'Anecdote is already finished and complete ।'[৪]

অন্যদিকে সুমিতা চক্রবর্তী জানাচ্ছেন -

'মধুমতীকে আমরা অসংশয়ে অতি চমৎকার ছোটগল্প বলতাম এবং তাকে প্রথম বাংলা ছোটগল্পের মর্যাদা দিতাম যদি গল্পটি মৌলিক হত। টেনিসন-এর 'ইনোক আর্ডেন (Enoch Arden - 1864) নামক আখ্যান কাব্যের কাহিনির সঙ্গে এই গল্পটির আখ্যানের সাদৃশ্য সকলেরই চোখে পড়বে। যে শিল্পরূপ মৌলিক নয়, প্রকৃতপক্ষে তার প্রথম হওয়ার গৌরব প্রাপ্য হতে পারেনা।'[৫]

এ কারণেই , 'খুব লোভ হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়'-এর দ্বিতীয় ভাগের (১৮৫৫) দশম পাঠের ভুবন এবং ভুবনের মাসির গল্পটিকে আমরা প্রথম ছোটগল্প বলতে পারি না। গল্পটি 'ইসপ্-স্ ফেবল্স্'-এর একটি গল্পের অনুবাদ।'[৬] প্রাবন্ধিক তাই উনিশ শতকের সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত নানা চূর্ণক-আখ্যানকের প্রতি মুগ্ধতার কথা স্বীকার করেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী প্রথম বাংলা সার্থক ছোটগল্প হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ের জীবন্ত মানুষ' রচনাটিকে (প্রকাশ 'বঙ্গদর্শন', কার্তিক ১২৭৯/অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৭২)। এই 'গল্প অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটির কথা' সরিয়ে রেখে তিনি কাহিনিটির 'ঐক প্রতীতি', রূপকের আড়ালের সমকালীন বাস্তবতা, 'একমুখী গতি' ও 'সূত্রপাত এবং সমাপ্তিবিন্দুর মধ্যে আখ্যানের বিকাশ এবং সঙ্গতি' লক্ষ্য করে, 'বর্ণনার বাহুল্য' ক্রুটিটুকু মাথায় রেখেও রচনাটিকে অতীব সুনির্মিত এবং তীক্ষ্ণ অথচ সরস, ব্যঙ্গপ্রাণ একটি আধুনিক ছোটগল্প'[৭] হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 'বাহুল্য বিবরণ' সহ 'ঘাটের কথা বা টানটান গঠন এবং ইঙ্গিতময় ভাষায় লেখা 'দেনাপাওনা' পূর্বের এই সৃষ্টি সম্পর্কে অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতামত- 'হাস্যরসের ছোটগল্প কি অসামান্য শিল্পময় হয়ে উঠতে পারে বাংলা সাহিত্যে তার উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রাজশেখর বসু। দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয় জীয়ন্ত মানুষ' সেসব গল্পের অতিসক্ষম অগ্রদূত।'[৮] এসবের সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' এবং 'দামিনী' রচনাদ্বয়কে, যেগুলি 'আকারে ছোট কিন্তু প্রকারে নয়। এই ধারাতেই আছে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'মশক', 'পূজার গল্প' প্রকৃতি রচনাগুলি।

২

'বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরুগুরু ...'

ঐতিহাসিকভাবে এ কথা সত্য সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় দু'দশক পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সৃজন বা সম্ভাবনার সূত্রপাত। আর যারা গল্প লিখছেন সিপাহী বিদ্রোহের মতো অনতিদূর ইতিহাসকে গল্পের বিষয় হিসেবে প্রাথমিক স্তরে সেভাবে গ্রহণ করেননি। মনে রাখতে হবে বাংলা ছোটগল্পের সূচনা পর্ব প্রাক্-স্বদেশী আন্দোলনের যুগ; জাতীয়তাবোধের সূত্র ধরে ঔপনিবেশিক বিরোধিতার সুর তেমন চড়া হয়নি। অন্যদিকে ১৯৭৬ সালে নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলের পাশাপাশি ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আইনও পাশ হয়ে গেছে। সিপাহী বিদ্রোহের আঁচ বাংলা ছোটগল্প সরাসরি আসেনি সেভাবে। কিন্তু ১৯১০ সালে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)-র 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের 'মিউটিনি' গল্পটি প্রথম প্রকাশ

পেয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকার পাতায়, ১৩০৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায়। গল্পটির আদিনাম 'ছোটখাট মিউটিনি'। এ কথা সর্বজনগ্রাহ্য শুধু বাংলা নয় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ছোটগল্পের উদ্ভবের পিছনে বিশেষ ভূমিকা ছিল সাময়িক পত্রের। আর মহর্ষিকন্যা তথা রবি ঠাকুরের 'ন'দিদি' স্বর্ণকুমারী নিজেই দুটি পর্যায়ে কখনো একা কখনো কন্যাদের সহযোগে আঠারো বছর সম্পাদনা করেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকা। 'দীপনির্বাণ' উপন্যাস লিখে সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ, উপন্যাসে পেয়েছেন জনপ্রিয়তা। তারপরেও বেশ কিছু 'ছোট ছোট গল্প' তিনি লিখেছেন। চিত্রা দেব জানাচ্ছেন -

> 'স্বর্ণকুমারী সফল উপন্যাস রচয়িত্রী হলেও তিনি আরও অনেক কিছু লিখতেন। তাঁর লেখা ছোটগল্পও বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যদিও বাংলা সার্থক ছোটগল্প প্রথম লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আগে যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁরা জানতেন না তাঁদের নতুন রচনাটিকে কী নামে ডাকা হবে। তাই স্বর্ণকুমারীর লেখা গল্প 'কুমার ভীমসিংহ'কে কখনো বলা হয়েছে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', আবার কখনো 'ঐতিহাসিক নাটক'। বাংলা ছোটগল্পের যখন এইরকম অবস্থা তখন স্বর্ণকুমারী বাঙালি মেয়েদের নিয়ে বেশ কয়েকটা ছোটগল্প লিখেছিলেন। 'মালতী', 'লজ্জাবতী', 'গহনা'র হেম ও ভাবিনী, যমুনা, 'প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে' লুকিয়ে থাকে হারিয়ে যায়। স্বর্ণকুমারী আঁকলেন তাদেরই লজ্জানত দ্বিধাজড়িত মুখের ছবি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা অবহেলিত। ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে মা-বাবা তার হাত খরচ যোগানোর চিন্তায় পীড়িত মেয়ের জন্য ডাক্তার ডাকতে চায় না। ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে। সেই অসহায় মেয়েরা উঠেছে স্বর্ণকুমারীর গল্পে। এসব ছবি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সমাজসেবা করতে করতে।'[৯]

'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক' স্বর্ণকুমারীর 'ছোটখাটো মিউটিনি' যখন প্রকাশ পেল তখন রবীন্দ্রনাথের সোনার ফসল উঠছে গল্পগুচ্ছের তরীতে। ইতিহাস দিয়ে সূচনা হলেও সামাজিক রচনাতেই স্বর্ণকুমারীর অধিক সাফল্য ও সিদ্ধি। আর গল্পের নাম 'মিউটিনি' থাকলেও গল্পের পটভূমি কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ নয়, প্রসঙ্গত মহাবিদ্রোহের কথা সেখানে এসেছে। অবশ্যই এ গল্পে মিশে আছে স্বর্ণকুমারীর স্বাজাত্যবোধ। মনে রাখতে হবে ঠাকুরবাড়ির আবহওয়ায় স্বদেশে চর্চার 'অনুকুল সমীরণ' ছিলই। কয়েক বছর পরে সেই বাড়ির শ্রেষ্ঠ মনীষা বাংলার মাটি-জল-বায়ু-ফুল-ফলের পুণ্যগানে রাখিবন্ধনের সূচনা করবেন। অন্যদিকে স্বর্ণকুমারী কন্যা সরলা দেবী বীরাষ্টমী বা প্রতাপাদিত্য উৎসব করেই থেমে যাননি, স্বদেশী আন্দোলনের 'বিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আর স্বয়ং স্বর্ণকুমারী -

> স্বামীর সঙ্গে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। তিনি কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে যোগদান করেন। ওই অধিবেশনে আরো দুজন মহিলা যোগ দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী স্বদেশ চিন্তা তার শেষ জীবনে লেখা উপন্যাস-ত্রয়ীতে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ছোট মেয়ে সরলার জীবনে। এমনকি তিনি ভেবেছিলেন সরলার বিয়ে দেবেন না, তাঁকে স্বদেশসেবায় উৎসর্গ করবেন।'[১০]

আলোচ্য গল্পে কানহোজি আংগ্রের সূত্রে স্বর্ণকুমারীর জাতীয়তাবাদী ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে --'একজন স্বাধীন ইংরেজের পক্ষে যাহা বীরত্ব, একজন দাস নিগরের পক্ষে তাহা ঘৃণ্য সাহস-দস্যুতা নয় ত আর কি।' গল্পে প্রথম পর্বে কথক ইংরেজ কেতাদুরস্ত মহিলার মুখে উৎকট আত্মগৌরব শুনে ('তিনজন ফ্রেঞ্চম্যান পাঁচজন জর্ম্মানের সমান, আর একজন ইংরেজ তিনজন ফ্রেঞ্চম্যানের সমান) শুধু 'মর্মে মর্মে' হীনতাই অনুভব করেননি, তৎসহ অনুভূতি - 'লজ্জায়, অপমানে আমার চোখ দিয়ে জল পড়িতে শুধু বাকি রহিল। মনে মনে দগ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে দাসজীবনের একমাত্র সান্ত্বনা স্বরূপ পুরাতন আর্য্যগৌরব স্মরণ করিতে করিতে সহসা বলিলাম --'ওই যে সতীস্তম্ভ, উহা আংগ্রে রাজারানীরদিগের - না?' যদিও মিসেস বি-এর কাছে বড় হয়ে উঠেছে কানহোজি আংগ্রের 'ভয়ানক নিষ্ঠুর আচার', তাঁর 'অধরোষ্ঠী ভঙ্গি'তে আছে ভারতীয়দের প্রতি তাচ্ছিল্য। আর কথক যেন লেখিকার কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন এভাবে -- 'উঃ আংগ্রে কি কাণ্ডই করিয়াছিল; পেশোয়া, ইংরাজ, মুসলমান, পর্ত্তুগিজ কেহই তাহাকে হার মানাইতে পারেন না।' ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রতি এই মারাঠা বীরের আরচণকে জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বারাই গল্পে তুলে ধরেছেন লেখিকা। এ প্রসঙ্গে রাজা প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী-কন্যা সরলার বিতর্কের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যায় --

> 'রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীর বলে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না, কারণ তাঁর চারিত্রিক আদর্শ মহান নয়। 'বউ ঠাকুরানীর হাটে' তিনি প্রতাপাদিত্যকে সেভাবেই এঁকেছেন। অথচ সরলা সেই নিয়ে, যাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সত্যি আছে কিনা বিচার না করে, মেতে ওঠায় তিনি বিরক্ত হন। সরলার উত্তর, তিনি প্রতাপাদিত্যকে নীতির নীক্তিতে বিচার করেননি, করেছেন রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে, 'একলা এক জমিদার হয়ে তিনি যে

মোঘল বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামে সিক্কা চালিয়েছিলেন, সে কথা তো সত্যি।'[১১]

বর্তমান উইকিপিডিয়াতে আংগ্রে সম্পর্কে বলা হয়েছে -

পর্তুগিজ এবং ব্রিটিশদের দ্বারা তার শত্রু জাহাজ আক্রমণ ও লুণ্ঠনের অধিকারপ্রাপ্ত বেসরকারি জাহাজ হিসেবে কার্যক্রম বন্ধ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আংরে ১৭২৯ সালে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ইউরোপীয় বণিক জাহাজ থেকে জাকাত দখল ও সংগ্রহ অব্যাহত রাখেন। ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজ দখলের নৌসেনাসুলভ দক্ষতা এবং গ্রেপ্তার এড়ানোর কৌশলের কারণে অনেক ইতিহাসবিদ কানহোজিকে ভারতের সামুদ্রিক ইতিহাসের সবচেয়ে দক্ষ ভারতীয় নৌ-বাহিনী প্রধান বলে মনে করেন।'[১২]

আর এ কথা অনস্বীকার্য স্বর্ণকুমারীর আদর্শ লেখক' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'আনন্দমঠ' বা 'দেবীচৌধুরানীর'র মতো উপন্যাস -- ভবনী পাঠক, দেবীচৌধুরানী বা বিদ্রোহী সন্ন্যাসীর দেশভাবনা জাতীয়তাবাদের মঙ্গলঘটকে পূর্ণ করেছিল। স্বর্ণকুমারীও আংগ্রে প্রসঙ্গকে গল্পে সেভাবেই তুলে ধরেছেন।

গল্পের দ্বিতীয় অংশের কথক মিসেস -এ --সেখানেই এসেছে মিউটিনি প্রসঙ্গ। কিন্তু গল্পটির পটভূমির সঙ্গে মিউটিনির সময়ের ব্যবধান অনেকখানি। কারণ মিউটিনির সময় মিসেস এ জন্মাননি। তাঁর স্কচ পিতা সে সময় ভারতে থাকলেও সৈনিক না হওয়ার কারণে সেই বিদেশি ভদ্রলোকও সিপাহী বিদ্রোহের সন্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু একটি অতি সামান্য ঘটনা যা 'ছোটখাট' মিউটিনি হিসেবে মিসেস-এ বর্ণনা করেছেন, সেখান থেকে সিপাহী বিদ্রোহ বিদেশী শাসক মনে যে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -

'১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ও মধ্য ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা যায়, যার ফলে সেসব অঞ্চলে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন ভেঙ্গে পড়ে। সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর সাহায্যে শাসন-শৃঙ্খলা আবার ফিরিয়ে আনা হয়। কোম্পানি ও বিদ্রোহী উভয় তরফেই ব্যাপক হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসন যেমন সতর্কভাবে হিংসার একাধিকত্ব গড়ে তোলে' তেমনি এদেশীয়রাও সেই হিংসার সমুচিত জবাব পাল্টা হিংসার মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশরা যদি বিদ্রোহের বিরুদ্ধে দমনমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিদ্রোহীদের প্রকাশ্য ফাঁসি দিত, কামান দিয়ে উড়িয়ে দিত অথবা গ্রামের পর গ্রাম নির্বিচারে পুড়িয়ে দিত, তবে বিদ্রোহীরাও নির্দয়ভাবে স্ত্রী ও শিশুসহ সাদা চামড়ার অসাময়িক মানুষদের ধ্বংস করে দিত।'[১৩]

ইংরেজদের মধ্যে এই ঘটনার আতঙ্ক স্থায়ী ছিল দীর্ঘকাল। তাই শঙ্করের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর যখন দু চারদিন গ্রাম-তত্ত্বাবধানে যান, 'দাস দাসী সিপাই শাস্ত্রী'তে বাংলো ভরে থাকার পরেও তার 'একাকী' স্ত্রীকে অরক্ষিত বলেই মনে করেছে সরকারি পুলিশ। অথচ নিজের দেশে সেই ইংরেজ মহিলা সিপাহী বিদ্রোহের 'বীভৎস অত্যাচারের'র কথা শুনে এদেশের সেনাদের 'পশুবৎ নিষ্ঠুর, ভীষণ প্রকৃতি ও বিশ্বাসঘাতক' ভাবলেও এখানে এসে সে ভুল তাঁর ভেঙ্গেছিল - '... আমাদের দেশের তুলনায় এদেশের ছোটলোকেরা সৈনিকেরা বহুগুণে শিষ্ট, শান্ত; এবং চাকর দাসীরা নির্ব্বোধ তো নহে অধিকন্তু খুবই প্রভুপরায়ণ। আমার নিজের সিপাহী পাটাওয়ালাদের উপর ত আমার অগাধ বিশ্বাস জন্মিল; এরূপ প্রভুভক্ত ভৃত্যবেষ্টিত থাকিয়া আমি যে সম্পূর্ণ নিরাপদ তাহা বেশ জানিতাম।'

অ্যাসিস্টান্ট কালেক্টর স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সিপাহীদের প্রতি মিসেস-এ-র ভরসা থাকলেও পুলিশকর্তা ভরসা রাখতে পারেননি। তাই রাতে তিনি মিসেস-এ র বাংলোয় নিজ উদ্যোগে কিছু সিপাই পাঠিয়েছিলেন। বাংলোয় কর্তব্যরত সেপাইরা সে ঘটনায় অপমানিত হয়। অতঃপর দুই দলের সিপাহীদের মধ্যে শুরু হয় সন্মুখ সমর। আর 'আধো-জাগরিত তন্দ্রার ঘোরে' মিসেস-এ এই ঘটনার মধ্যে ১৮৫৭র মিউটিনির পুনরাবৃত্ত অনুমান করে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাঁর খাস আয়ার 'ভক্তিপূর্ণ' ও 'সম্মানসূচক' আচরণেও তিনি ভরসা রাখতে পারেননি। 'অস্ত্রের ঝনঝনা' আর 'ভীষণতর' কলরব শুনে তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। 'ভীষণ রাত্রি' অতিক্রম করার পরে কিছু কিছু ইংরেজি বলতে পারা সিপাইয়ের কাছে বিগত রাত্রির সমস্ত ঘটনা জেনেছে মালকিন, যা বিদেশি ভাষায় অপটু আয়ার 'পুলিশ সিপাই লড়াই' -- এই কয়টি কথার আড়ালে আবৃত ছিল। যদিও এ লড়াই শুধু পুলিশ-সিপাই এর আত্মভিমানের লড়াই মাত্র নয়, ত্রিকোণ প্রেমের একটি বিষয় সেখানে যুক্ত হয়েছিল। বাংলোর পাটাওয়ালা ও একজন পুলিশ সিপাই, দুজনেই ছিল আয়ার

প্রণয়ার্থী। আর 'প্রণয়ীদ্বয়ের এই ঈর্ষা-স্ফুলিঙ্গেই সে রাত্রে দুই পক্ষের সিপাইগণের বিদ্বেষানল প্রথম জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।' বলাবাহুল্য গল্পটি কৌতুকময়তার শেষ হলেও সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গকে ব্যবহার করে স্বজাতির বাহুবলের দিকটিকে আলোকিত করেছিলেন গল্পকার স্বর্ণকুমারী।

৩

'ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি ...'

সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের 'দুঃখ-বেদনা-আর্তির জীবনগাথা' রচনা করেছিলেন প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'লালকেল্লা' উপন্যাসে; অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের সূচনা, এই প্রেক্ষাপটে লেখা কালজয়ী উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সি' লিখে তিনি পেয়েছিলেন 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার'। নাটোর জেলার জোয়াড়ি গ্রামের জমিদার বাড়ির ছেলে প্রমথনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র তথা রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। ছাত্রাবস্থাতেই লিখেছিলেন 'দেশের শত্রু' উপন্যাস; পরে উপন্যাস ছাড়াও লিখেছেন ছোটগল্প, নাটক প্রভৃতি, অধ্যাপনা করতে গিয়ে হয়ে উঠেছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক। বিভিন্ন সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও রাজ্যসভার সদস্যও থেকেছেন। তবে তাঁর সমাজচেতনা ও স্বদেশচেতনা ছড়িয়ে আছে রচনার বৈচিত্র্যে। বিশ শতকে দাঁড়িয়ে গত শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি, যার অন্যতম নিদর্শন, ১৮৫৭ মহাবিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা 'ছিন্নদলিল' ও 'নানাসাহেব' গল্পদুটি।

বেগম রোকেয়া তাঁর 'নিরীহ বাঙালি প্রবন্ধ শুরু করেছিলেন এভাবে -

> 'আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙালি। এই বাঙালি শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙালি কোন বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যুথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা -- এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙালি গঠিত হইয়াছে, আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের ক্রিয়া-কলাপও সহজ ও সরল।''[১৪]

উপনিবেশিক ভারতে এই শ্রেণীর বাঙালিকেই কষাঘাত করেছেন প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'ছিন্নদলিল' গল্পে। লেখক সম্পর্কে কেশব আড়ু জানাচ্ছেন -

> 'প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) ছিলেন বিচিত্র প্রকৃতির বিচিত্র স্বাদী সরল গল্পকার। 'বসুমতী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি'তে যেমন লিখেছেন, তেমনি একদা 'কল্লোল', 'কালিকলমে'ও লিখেছেন। তিনি কোন গোষ্ঠীভুক্ত হতে চাননি। আবার অসঙ্গতি দেখলে তির্যক ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। মূলত তিনি হৃদয়য়ানুভাবের কোমলতায়, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচায় জীবনের অসঙ্গতিকে, স্খলন-পতনকে পরিহাস-পটু শিল্পীমনে ধরেছেন।''[১৫]

এই ভাবনা ধরা আছে কানপুরের পটভূমিতে লেখা 'ছিন্নদলিল' গল্পে, সিপাহী বিদ্রোহ ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়ায় ভীত কয়েকজন প্রবাসী বাঙালী ও তাদের অন্যতম মুখ বদ্যিনাথ মুখুজ্জ্যের উপস্থাপনায়।

মনে রাখতে হবে -- '১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন তারিখের কানপুর হত্যাকাণ্ড ঔপনিবেশিক শাসনাধীন এদেশীয়দের হিংসাশ্রয়ী ঘটনার মধ্যে 'সীমালঙ্ঘনকারী' ঘটনা যেটি উপনিবেশকারীদের হিংসার একাধিপত্যকে ভেঙ্গে দেয়।''[১৬] কোম্পানি যখন পুনরায় কানপুর অধিকার করেছে, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য একদল প্রবাসী বাঙালির অন্ধ-রাজভক্তিকে গল্পকার এমন ভাবে তুলে ধরেছেন, তাতে শুধু পাঠক নয় অবাক হয়েছেন কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মি. শেরারও। আগ্রা, মিরাট, সীতাপুর বা কানপুর চাকুরিরত বাঙালি প্রবাসীরা শেরারের পায়ে পড়েছে এই বলে --

উই বেঙ্গলীস
ভেরি লয়াল
কোম্পানীকা নোকর

তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি বদ্যিনাথ মুখুজ্জ্যে তো 'সাহেবের বুটজুতার উপরে পড়িয়া বলে, হাম তো ইওর বুটশিপকা

লয়াল সার্ভেন্ট হ্যায়।' মনে পড়বে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনি-আশ্রিত তরুণ মজুমদারের কালজয়ী ছবি 'শ্রীমান পৃথীরাজে'র কথা যেখানে, রায়বাহাদুর উপাধির আশায় নেটিভ জমিদারেরর নিলর্জ্জ সাহেববন্দনা। উৎপল দত্তের নিপুণ অভিনয়ে প্রাণ পেয়েছিল চরিত্রটি। পরে 'ভূতের ভবিষৎ' ছবিতেও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি-প্রতিনিধির ভূত দর্পনারায়ণ চৌধুরী সাহেব-ভূতের কাছে নিজের নামের অর্থ বলেছিল - ' Your most obidient servent ।' গল্পেও 'রাজভক্ত বঙ্গসন্তানে'রা সিপাহী বিদ্রোহের কারণে 'লংড্রেন ফাস্টিং বা একটানা একাদশী' করে কোম্পানীর প্রতি আরও বেশি 'লয়াল হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা বাংলার সেনাবাহিনীতে ছিল বেশিরভাগ অযোধ্যার সেনা আর সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে যে বেসামরিক বিদ্রোহ ঘটেছিল সেখানে '...যেসব অঞ্চল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসাদ পেতো তারা বিদ্রোহে নামেনি। যেমন বাংলা ও পাঞ্জাব শান্তিপূর্ণ ছিল।'[১৭] সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে বাঙালির এই 'দ্বিপ্রান্তিক মতামত' জনিত দ্বন্দ্ববীজ অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নয়নতারা' উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করে দেবলীনা শেঠ (মুখোপাধ্যায়) লিখেছেন -

'এখানে সেই সাধারণ মানুষেরই ইতিহাস কথা। যেমন সচেতন সিপাহি বুজরুক আলি বলে 'ইংরেজ আমাদের শাসন করে আমাদের দিয়েই। আমরা সিপাই হয়ে আমাদের দিকেই গুলি ছুঁড়ি' জাতীয়তাবোধের জাগরণ। এখানে বুজরুকের পেশাই কিন্তু বন্দুক বিক্রি। কেউ বোঝেই না, কীভাবে সব বিক্রি করা বন্দুকের নিঃশব্দ অভিমুখ হয়ে যায় ব্যারাকপুরের সিপাহি ছাউনি। — আমরা জানি ইতিহাস বলে এই সময়ের যেকোনো ইস্যু নিয়েই বাংলার সমাজ সরাসরি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যেত ইংরেজ শাসকদের পক্ষে আর বিপক্ষে। তা সে বিধবা বিবাহই হোক কিংবা নীল চাষ আর সিপাহি বিদ্রোহ হোক।'[১৮]

ইতিহাসের এই সত্যকে অস্বীকার করেননি গল্পকার। তাই গল্পে শেরার কানপুরের বাঙালিদের রাজভক্তির প্রতি ভরসা রেখেছে এই ভেবে, 'তথাকার (বাংলার) শিক্ষিত বাঙালিগণ সিপাহীদের আচরণ সমর্থন করে না, তাহাদের অনেকে নাকি সিপাহীদের কার্যের নিন্দা করিয়া বহুতর গদ্যপদ্য রচনা লিখিয়া ফেলিয়াছে।' আর মুখুজ্জ্যে অনায়াসে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বাঙালি জাতির চরম অসম্মানের চিহ্ন তুলে দেয় শেরারের হাতে - 'It is well known, your excellency's lordship that we, the Bengalees, are a cowardly people.' এবং এর বিনিময়ে সেই 'Chilldron taming people' অর্থাৎ 'ছাঁপোষা মানুষ'গুলো পায় শেরারের সইসহ নিরাপদে থাকার আরেকটি উপকরণ 'This house belongs to one Mukarjee, very loyal subject, please not to molest'। এইগুলি যে গল্পকারের স্ব-কপোল-কল্পিত জাতিনিন্দা নয়, তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ সহ। আর বাঙালিদের এই চরিত্রগুণেই যে বাংলা 'কোম্পানির রাজ্যের প্রথম বনিয়াদ', তাও বুঝে নিয়েছেন বিদেশী সাহেব; তিনি এই মনে করেছেন 'বাঙালির কাছে শিখিবার অনেক কিছু আছে'। মুখুজ্জ্যের এই 'পলিটিক্স'কে তাদের জনৈক সহ-আবাসিকের 'অত নীচু' হওয়া বলে মনে হলেও, অভিজ্ঞ ব্যক্তিটির প্রতিক্রিয়া 'আরে নীচু না হলে জুতো চুরি করা যায়! তাছাড়া নীচুটাই বা কি হলাম। দরখাস্তখানা তো মিথ্যা নয়। তার ওপরে দুটো মিষ্টি কথা বলেছি এই তো! তা রাজার জাতকে অমন বলতে হয়।'

বিবিঘরে ২০০ জন ব্রিটিশ মহিলা ও শিশুর নির্মম হত্যার পর কোম্পানির ফৌজের নিষ্ঠুর 'অত্যাচারে' কানপুর 'মূহ্যমান', তখন ওই দরখাস্তই ছিল প্রবাসী বাঙালি গোষ্ঠীটির আশ্রয়স্থল — 'মুখুজ্জ্যে অনেক ঠকিয়া বুঝিয়াছিল যে সময় বিশেষে ভগবানের চেয়ে শেরার সাহেব প্রবলতর।' তার অভিজ্ঞতা — 'ঠকানোটাই জীবনের উদ্দেশ্য, দুঃখ পাইতে পাইতে শিখিয়াছে যে দুঃখটাই জীবনের ধর্ম, ভয় পাইতে পাইতে শিখিয়েছে যে ভীত বোধ না করিলে কার্যোদ্ধার হয় না; আর রাজভক্তি! বাল্যকালে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের প্রতি ভক্তি তারপরে জমিদার, মহাজন, গুরু-পুরুতের প্রতি ভক্তি - এই সমস্ত রাজভক্তির ভূমিকা।'

স্থির জলে হঠাৎ ঢিল পড়ার মতোই তাদের মাঝে এক আগন্তুক বাঙালি যুবকের আগমন; পরিচয় হিসেবে নাম বলেছিল তারকচন্দ্র রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ; কাজের সন্ধানে কাশী থেকে এলাহাবাদ হয়ে কানপুর এসে সিপাহীদের দ্বারা সে সর্বশ্রান্ত। কিন্তু এই ভীরু বাঙালিদের চেয়ে স্বভাবে যে পৃথক বুঝিয়ে দিয়েছিল রাতেই। কানপুরে নিত্য হত্যালীলার মাঝে রাতের 'আর্ত বামা কণ্ঠস্বর' নতুন হলেও মুখুজ্জ্যে বা তার পারিষদ 'দরজা জানালার অর্গল পরীক্ষা' করে চুপ করে বসে থাকলেও স্থির থাকতে পারেনি আগন্তুক। জানালার দিকে এগিয়ে যেতেই মুখুজ্জ্যের দল তাহার উপর গিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী' করেই থামেনি 'বিছানার চাদর দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে'। সকালের আলোয় শেরার-সাহেবের সই-সহ অপমানজনক দলিল দেখে গর্জে উঠেছে ছেলেটি -- তেলেঙ্গি লড়ছে, পূরবিয়া লড়ছে, শিখ লড়ছে, মুসলমান লড়ছে, আর আপনাদেরই যত ভয়।' এই কারণেই তো বাঙালি ফৌজিতে না গিয়ে কাজ করে 'কমিসারিয়েটে'। 'ছোকরা'র তর্ককেও তাই কেউ গুরুত্ব দেয় না।

পরে ছোকরার আসল পরিচয় মুখুজ্জ্যে কোটওয়ালিতে পেয়েছে, ছেলেটি 'সিপাহীপক্ষের লোক'। তার গতিবিধি অনুমান করলেও মুখুজ্জ্যে যে রাজভক্তি ও ভীরুতার পরিচয় শেরার পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর সন্দেহের তির ওই বাড়ির দিকে যায়নি। মুখুজ্জ্যে 'গোলমাল' এড়িয়ে পরদিন লোকটিকে 'বিদায়' দেওয়ার ভাবনা মাথায় রেখে বিষয়টি জানাজানি করেননি। যদিও তার আগেই ছেলেটি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে; ছিঁড়ে কুটিকুটি করে রেখে গেছে শেয়ার সাহেবের পরোয়ানাটি। আর লিখে রেখে গেছে 'This house boengs to traitors to the country - NANA Sahib'। এ শুধু কতিপয় বাঙালির প্রতি নিন্দা মাত্র নয়, ঔপনিবেশিক ভারতে আত্মঘাতী জাতির প্রতি তীব্র কষাঘাতও বটে।

৪

'বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে ...'

সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে সমস্বরে যে-কটি নাম উচ্চারিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম নানাসাহেব -- প্রমথনাথ বিশী ওই নামেই লিখেছিলেন ছোটগল্প। সমনামেই দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন উপন্যাস, আবার গজেন্দ্রকুমার মিত্র 'বহ্নিবন্যা' উপন্যাসে নানাসাহেবকে একটু অন্যভাবে দেখিয়েছেন -

> সিপাহী বিদ্রোহে কুঁয়ার সিং, ঝাঁসির রানী, তাঁতিয়া টোপী যে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, নানাসাহেবের মধ্যে তার কিছুই ছিল না। এমনকি তাকে কখনো কখনো কাপুরুষও মনে হয়েছে। একদিকে তিনি সিপাহীদের পক্ষ নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আবার পরমুহূর্তেই গোপনে ইংরেজের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন নিজের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে। বিদ্রোহের শেষে দেখা যায় সামান্য জমিদারের মতো ভৃত্যকে নিয়ে গভীর রাত্রে তিনি কুয়োতে সমস্ত ধন দৌলত নিক্ষেপ করেছেন দেশে অরাজকতা দূর হলে সব ফিরে পাবেন এই আশায়।'[১৯]

আলোচ্য 'নানাসাহেব' গল্পের পটভূমি সিপাহী বিদ্রোহের সমাপ্তির কাল। ততদিনে লড়াইয়ের ময়দানে মৃত্যু ঘটেছে ঝাঁসির রানীর, ফাঁসি হয়েছে তাঁতিয়া টোপীর, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ নির্বাসনে; আর দ্বিতীয় বাজিরাও-এর পোষ্যপুত্র নানাসাহেব - যিনি কানপুরের বিদ্রোহের নেতা, তিনি তখন নিরুদ্দেশ। খোঁজ পাওয়া যায়নি নানার 'দক্ষিণহস্ত' আজিমুল্লা খাঁ এবং বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের কাণ্ডারী জোবেদা বিবি - 'নানাসাহেবের 'হারেমের একজন ক্রীতদাসী'। নানাসাহেবকে ধরার জন্য সরকারী পরোয়ানা, সঙ্গে আছে 'প্রচুর অর্থমূল্য', সন্ধান চলছে উত্তরে নেপাল থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ, পূর্বে আসাম থেকে ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত। এই খোঁজাখুঁজি সূত্রে গল্পকার সিপাহী বিদ্রোহ-উত্তর কালে শুধু নানাসাহেব সম্পর্কে নানাজনের ধারণা মাত্র নয়, পরাধীন জাতীর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও তজ্জনিত পরিস্থিতিতে মূল্যবোধের অবক্ষয়কেও চিহ্নিত করেছেন।

ভারত ইতিহাসে নানাসাহেবের সামাজিক অবস্থান বা রাজনৈতিক উত্থান স্পষ্টক্ষরে লেখা হলেও মৃত্যুর রহস্যে ঢাকা। তাঁর অন্তর্ধানের অবস্থান নিয়ে প্রচলিত আছে বহু কিংবদন্তি। গল্পে কানপুরে জেলখানায় পাশের হোটেলে হেড ওয়েটার ইসাকের ছদ্মবেশে নানাসাহেবের অবস্থান। যদিও এ সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে গল্পের শেষে ছদ্মবেশে আগত আজিমুল্লা খাঁ ও জুবেদা বিবির সামনে।

নানাসাহেবের পরিণতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাবনার উল্লেখ করেছেন গল্পকার, কারোর বিশ্বাস তিনি মারা গেছেন। কেউ ভাবেন বেঁচে থাকলেও 'সে পলাতক আসামী, দেশে তাহার আর প্রভাব নাই।' আর সরকারি কর্মচারীদের কাছে নানাকে ধরার এই তোড়জোড় 'উপরি' রোজগারের বড় জায়গা। বিলেত থেকে বিশেষজ্ঞ এসেছেন সেই কাজে নিযুক্ত হয়ে। অতএব নানাসাহেবের মৃত্যু ঘোষণা করে তাদের ফেরত পাঠানোর হাঙ্গামা এবং 'পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরে ভারত সরকারের অকর্মণ্যতা ঘোষিত' হওয়া আটকাতে 'সরকার নীরব'। তারই মাঝে নানাকে নিয়ে নানা প্রশ্ন; মামুদের হোটেলে তার উপস্থিতি এককালে ছিল, সেই সূত্রে কৌতূহলী জিজ্ঞাসা 'তার প্রিয় খাদ্য কি ছিল?' 'ঘরে আর কোন আসবাব ছিল?' মামুদের মুখে নানা গরুর চোনা খেতো শুনে 'কেহ কেহ আবার মনে মনে যুক্তিজাল বুনিয়া স্থির করিত উক্ত বস্তু যখন খায় উক্ত বস্তুর আধারটিকে অবশ্য খাইত।' ফরাসি মশিয়ে লুবলিনের ভাবনায় নানাসাহেব কাশ্মীরি পোশাক পরে বালজাকের বই পড়তে পড়তে অর্ধনগ্ন ইরানি মেয়েদের চিমটি কাটতো। তখন তাঁর কোলে থাকত মিশরীয় বিড়াল, আর চোখে নাক-টেপা-চশমা। সিপাহী সঙ্গিনের ডগায় ইংরেজ শিশু বিঁধে তার সামনে নিয়ে আসত। অন্যদিকে ইংরেজ জর্জের কল্পনায় প্রাচ্য দেশের মানুষ হিসেবে নানার চেহারা 'কুৎসিত' - 'তার মাথাটি প্রকাণ্ড একটা হাঁড়ির মতন, লেখাপড়া কিছুই জানে না, কোন অনুচরের উপরে রেগে গেলে তখনই পদাঘাতে তাকে নিকেশ করে ফেলে। আর তার প্রিয় খাদ্য শিশুদের

লিভার। আর রোজ রাত্রিবেলা সে কুমারী মেয়ের হৃদপিণ্ডের চাটনি খায় স্বাভারিক শক্তি অর্জনের আশায়'। আর এরপর ইসাকের মুখে নানার যে বর্ণনা তারা শুনেছিল, তাতে মনে হয়েছিল নানা ইসাকের মতো দেখতে।

সত্য-মিথ্যার মায়া তৈরি করতে পারতো ইসাক — মামুদের হেড ওয়েটার তাই তার কাছে অমূল্য। কোন কিছুর বিনিময় ইসাককে ছাড়তে চায় না মামুদ। ইসাকবেশী নানার সরকারী মহলেও বিশেষ 'প্রতিপত্তি', কারণ 'সে নানাসাহেবকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিত, সে ছিল সরকাররী সনাক্তকারী'। অর্থাৎ সরকারের চোখে ধুলো দিতে পারঙ্গম নানাসাহেব; মনে পড়বে শরৎচন্দ্রের একতম রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'র সব্যসাচীকে। বিঠুর ও কানপুরে ইসাক নানাকে বহুবার দেখেছে, এমন বিশ্বাস থেকেই নানাসাহেবের মধ্যে থেকে আসলকে খুঁজে বার করার 'যোগ্যতম ব্যক্তি' ও 'একমাত্র রক্ষাকর্তা' হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে সে।

প্রতি সপ্তাহে 'সনাক্তকরণ প্যারেডে' উপস্থিত থাকতো প্রায় দুই হাজার নানাসাহেব - বিবিধ বয়স, বিভিন্ন আকৃতি বহু জাতি — সাধু সন্ন্যাসী থেকে পীর-ফকির সবই ছিল। তার ওপর ১৮৬৪তে উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষের পর নানাসাহেবের সংখ্যা গেল আরো বেড়ে। যদিও গল্পকার বিষয়টিকে কৌতুকের আকারেই বর্ণনা করেছেন তবুও নিম্নবিত্ত মানুষের পরিণতির কথা ভাবলে শঙ্কিত হতে হয়। আগে নানাসাহেব খুঁজে আনতে হতো; দুর্ভিক্ষের সময় আসামী সেজে নিজেরাই ধরা দেয় - 'গৃহীর খাদ্যাভাব, সাধুফকিরের ভিক্ষার অভাব। সকলেই জানে যে হাজতে রাখিলে খাইতে দেয়, আরও শুনিয়াছে যে একবার আসামী বলিয়া সনাক্ত হইতে পারিলে পুলিপোলাও চালান হইবে তখন আর খাওয়া পরার চিন্তা করতে হবে না।' নিজেকে নানাসাহেব হিসেবে প্রমাণ করতে পাঠশালার পণ্ডিত থেকে 'গুলি'ওয়ালা হাতের সন্ন্যাসী প্রতিযোগিতায় নেমেছে। শুধু কানপুর নয় — উত্তর ভারতের সব থানাতেই অনুরূপ 'দৃশ্যের অভিনয়' চলছিল — 'আর এই সব নানার ধারা যে মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হইত সেই কানপুর শহরের দৃশ্য উপভোগ করা সহজ হইলেও বর্ণনা করা সহজ নয়।' জেলখানায় আর সেই নানাসাহেবদের দলকে রাখা যায় না, আশেপাশে কিছু বাড়ি ভরে গিয়ে অতঃপর 'খোলামাঠে তারের বেড়া' দিয়ে তাদের রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। মামলা আর বন্যায় 'সর্বস্বান্ত' হয়ে বাঙালি নানাসাহেবের দলও এসে হাজির হয়েছে। নানাসাহেব হিসেবে চিহ্নিত হবার দাবিতে কাঁদুলে জাতির তকমা ছেড়ে বাঙালিও 'গণবিক্ষোভ' থেকে 'প্রায়োপবেশন'-এর দিকে এগিয়েছে। গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুলেছে 'বাংলার দাবি মানতে হবে, অবাঙালি নানা চলবে না।' একই দাবী নিয়ে হিন্দু-সন্ন্যাসী আর মুসলমান-ফকিরের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে থামাতে গিয়ে কৌতুকের ছলে ইসাক যখন নিজেকে 'নানাসাহেব' বলেছে তখন ছদ্ম নানাসাহেবদের হাতে মার খেয়েছে আসল নানাসাহেব। এরপর ইসাক ছুটি চেয়েছে এই কাজ থেকে। যদিও জেনারেল সাহেব নির্ভরযোগ্যতার কারণে তাকে ছাড়তে একেবারেই নারাজ।

গল্পের শেষে ইসাকের আসল পরিচয়টুকু দিয়েছেন, অবশ্যই রহস্য উন্মোচনে রেখেছেন আকস্মিকতা। তবে নানাসাহেবের জীবনের কোন নির্দিষ্ট পরিণতির ইঙ্গিত না দিয়ে ইতিহাসের সত্যকে যথাযোগ্যতা মর্যাদা দিয়েছেন ঐতিহাসিক গল্পের রচয়িতা প্রমথনাথ বিশী, যেখানে কৌতুক রসের সঙ্গে মিশিয়েছেন জীবন রসকেও।

৫

'জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ...'

ঐতিহাসিক রচনায় মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে বলিষ্ঠ আবির্ভাব মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল 'ঝাঁসির রানী' -

> 'এমন অসাধারণ লেখা বাঙালি পাঠক বেশি পড়েননি। উপন্যাস নয়, ইতিহাস বইও নয়। দীর্ঘ গবেষণার ফল, কিন্তু সে গবেষণার ধরণ আলাদা। সমস্যাময় জীবনযাপনের মধ্যে থেকেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি মেয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ভালো করে জানবে রানিকে। ... 'ঝাঁসির রানি'র মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এমন এক লেখককে উপস্থিত করল ইতিহাস-অতীত ও সমকালীন ইতিহাসই যাঁর নিজেস্ব ভূমি। ঘটমান সমকাল মুহূর্তে মুহূর্তে অতীত হয়ে যাচ্ছে, বর্তমান হয়ে যাচ্ছে ইতিহাস। মহাশ্বেতা সেই বহমানতার মধ্যে স্থিত মুখগুলিকে তুলে দেখাচ্ছেন। তবু একমুহূর্তও তারা সেই সময়ধারা থেকে, সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে বিচ্যুত হয়ে আসছে না।'[২০]

মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যিক জয়া মিত্র এই কথাগুলই লিখেছিলেন। আর তাঁর লেখনী সম্পর্কে জানিয়েছেন —'প্রথম থেকেই ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরে থাকা মানুষদের নিয়ে তাঁর লেখা। কখনও ক্রীতদাসী, কখনও নিচু

জাতের মানুষ, বিধবা, ডাকাত, বন্ধুয়া মজদুর শেষ পর্যন্ত ...'[২১] 'ঝাঁসির রানি' সম্পর্কে লেখিকা নিজেই জানিয়েছিলেন —'এটা তো আমি চিরদিনই বিশ্বাস করেছি যে, ইতিহাস কোনো ছাপা বইয়ে থাকে না। ইতিহাস সন্ধান করতে হয়।'[২২] মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পের আলোচনা করতে গিয়ে অলোক রায় জানাচ্ছেন -

'... সাহিত্যের ছাত্রী মহাশ্বেতার আগ্রহ প্রথম থেকেই ইতিহাসের দিকে। তবে সে ইতিহাস রঙচঙে বর্ণাঢ্য রাজারাজড়ার ইতিহাস নয়। দেশকালকে জানার জন্যে তাঁর ইতিহাসচর্চা, আর তাই তিনি বলেন, 'আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বার বার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি The voiceless section of Indian Society, এই অংশ এখনও নিরক্ষর, স্বল্প সাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়ই বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানালে ভারতকে জানা যায় না।[২৩]

ঝাঁসির প্রেক্ষপটে মহাশ্বেতা দেবী লিখলেন 'লছমনের মা' গল্পটি। কিন্ত সেখানে রানীর ইতিহাস নেই, আছে এক অসহায় জননীর স্নেহ আর করুণ পরিণতির গাথা। পালিত পুত্র দামোদরকে রাজা করার জন্য লক্ষ্মীবাঈয়ের লড়াই নিয়ে 'বিদ্রোহিনী' নাটক লিখেছিলেন বাংলা থিয়েটারের প্রবাদ-প্রতিম ব্যক্তিত্ব তৃপ্তি মিত্র। অবশ্যই তাতে মিশে গিয়েছিল নারীর সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদী চেতনা। মহাশ্বেতা দেবীও উপলব্ধি করেছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'মধ্য ভারতে এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান' গড়ে উঠেছিল ঝাঁসির রানীর নেতৃত্বে। আর তারই সঙ্গে লেখিকার কলমে প্রান্তিক মানুষের সজীব স্বর বারে বারে প্রাণময় হয়ে ধরা দিয়েছে। এই ধারাতেই উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'লছমনের মা' — গল্পের কেন্দ্রে আছে বিধবা গঙ্গা। যারস্বামী ঝাঁসির কেল্লায় ঘোড়ার ঘাসের যোগান দিত। গল্পের সূচনায় কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ ঝাঁসিতে পৌঁছয়নি। সদ্য স্বামীকে হারিয়ে গঙ্গা রানীর 'মহালের বড় ঘরে' নিজের অসহায়তার কথা জানাতে গেলে, রানীর উত্তর 'রাজ্য কি আমার আছে? আমি যা পাই তাতে আমার চলে না। কি ব্যবস্থা তোমার করি বলো তো?' সঙ্গে গল্পকারের সংযোজন - 'রানীর যথাসর্বস্ব গয়নাগাটি টাকাকড়ি সব যে ইংরেজরা কেড়ে নিয়ে রেখে দিয়েছে এ কথা আর ঝাঁসিতে কে না জানে।' তবুও কিশোরী রানী গঙ্গার উপায় করে দেয়, কেল্লায় দুধ জোগান দেবার কাজ সে পেয়েছিল। পরাধীন ভারত, ঔপনিবেশিক আগ্রাসন আর তার মাঝে এক দুই নারীর বেঁচে থাকার লড়াই দুরকম।

মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস রচনা করেননি। সে দায় তাঁর ছিলও না। বরং সেই ইতিহাস থেকে সেঁচে এনেছেন মানুষের সুখ-দুঃখ-স্নেহ-প্রেম, লিখেছেন 'অরণ্যের অধিকার,' 'আঁধার মানিক' বা 'কবি বন্দ্যঘটীগাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু'র মতো উপন্যাস। আর সেই পাথুরে বুন্দেলখণ্ডের কড়া মাটিতেই গঙ্গার মত স্নেহপ্রবণ এক বাস্তব নারীকে গড়ে তুলেছিলেন মহাশ্বেতা। মিলিটারি সাহেবরা দূরে ক্যান্টমেন্টে থাকলেও 'আপিসে' কাজ করা ইংরেজরা থাকতেন কেল্লাতেই। সেখানেই ছিল মাতৃহীনা ইংরেজ বালক উইলিয়াম ওরফে 'বিল', তার কাকা টার্নবুল ঝাঁসির রেভিনিউ বিভাগের কর্মচারী, বাবা থাকে পাঞ্জাবে। ছেলেটি দাসীদের তত্ত্বাবধানে থাকে, আর তাদের ধমক খায়। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পিসিদের কাছে ছেলেটিকে রেখে আসা সম্ভব হয়নি টার্নবুলের। সেই বিল হয়ে উঠেছিল দুধওয়ালি গঙ্গার ছেলে -- 'সত্যি ছেলে নয় আবার মিথ্যে বলাও ভুল।'

গোরা শিশুটির প্রতি গঙ্গার ছিল আন্তরিক টান। ঝাঁসিতে মহাবিদ্রোহ শুরুর আগেই তো মায়ের মন 'কু' ডেকেছিল, ভাইপোকে নিয়ে ঝাঁসি ছেড়ে চলে যাবার অনুরোধ করে টার্নবুলের ধমক খেয়েছিল গঙ্গা। ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য অনুসারে বিদ্রোহের কারণ বা বিবরণ মহাশ্বেতা তার ছোটগল্পে না দিলেও আমরা জানি 'স্বত্ববিলোপ নীতি' সংকট তৈরি করেছিল 'ভারতবর্ষের পরস্পরাগত উত্তরাধিকার ব্যবস্থায়'। সিপাহীদের বিদ্রোহ সেদিন 'বৈধ' হয়ে উঠেছিল সিংহাসচ্যুত রাজাদের নেতৃত্বে। কানপুরে নানাসাহেব, লখনৌতে বেগম হজরতমহল বা রোহিলখণ্ডে খান বাহাদুর খানের মতো - '... ঝাঁসিতে সিপাহীদের নেত্রী ছিলেন রানী লক্ষ্মীবাঈ। যদিও রানী কিছুদিন আগেও ব্রিটিশের প্রভুত্বকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন, যদি ব্রিটিশ তাঁর দত্তকপুত্রকে ঝাঁসির সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার করত।'[২৪] অতএব সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ঝলসে গেল ঝাঁসির ইংরেজ শাসন, কেল্লায় কাটা পড়লো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাদা চামড়ার শাসকশ্রেণী। সিপাহীদের তাণ্ডবোত্তর কেল্লায় এক রুদ্ধ ঘর থেকে বিলকে উদ্ধার করেছিল গঙ্গা, মায়ের চোখে শিশু ধর্মহীন 'মানবপুত্র'। শমন ঘেরা শ্মশান থেকে উদ্ধার করে আনলো সে ছেলেটিকে — 'গঙ্গা ওকে পিঠের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর তার মাথা ঢেকে, শরীর ঢেকে, নিজের মাথা ঢেকে চাদর মুড়ি-সুড়ি দিয়ে নিয়ে কেল্লা ছেড়ে বেরোল।' আশ্রয় দিল নিজের ঘরে। এজন্য বেশ কিছু কৌশলও অবলম্বন করতে হয়েছিল তাকে। বিলের সাদা চামড়া ঢাকতে তার গায়ে মাখানো

হলো রঙ, বিল হয়ে গেল রামের ভাই 'লছমন', আঞ্চলিক ভাষার সাহেব-শিশু স্বচ্ছন্দ না হওয়ার কারণে লছমনবেশী বিলকে বোবা সাজিয়ে রাখার প্রচেষ্টাও চালাতে হয়েছিল।

ইতিহাসকে স্বীকৃতি দিয়ে গল্পকার জানাচ্ছেন - 'সিপাহীরা চলে গেল দিল্লির দিকে। রানী ঝাঁসির রানী হয়ে বসলেন। দশ মাস ধরে আজ এই রাজ্যের সঙ্গে কাল ও রাজ্যের সঙ্গে রানীর যুদ্ধ লেগেই রইল, সে তো তোমরা জানো। তবু দশ মাস ধরে ঝাঁসিতে যেন সুখ শান্তির সীমা রইল না।' আর চাপা উৎকণ্ঠায় ছেলের অসুখের বাহানা নিয়ে লছমনকে আড়ালে রেখে গঙ্গা দুই সন্তানের রুটিরুজির ব্যবস্থা করে চলে। এই ভিখারিনীর কুঁড়ে ঘরেই যেন 'লছমন' হয়ে বিল একটু আনন্দে বাঁচে, গঙ্গার স্নেহ, রামের সাহচর্যে জীবনের খুশিটুকু খুঁজে পায় সে। গঙ্গাও চায় বিলকে সারা জীবন নিজের কাছে রাখতে। বিলকে বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে তুলে দিলে বকশিশ পেতে তারা, কিন্তু রামের মুখে সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ মাত্র শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল গঙ্গা — 'ও যে এখানে আছে, সে কথা কারুকে বললে তোকে কুচি কুচি করে কেটে ওই জলে ফেলে দেব।' ইতিহাস তো বলে শুধু রাজা-রানীদের কথা, তাদের স্নেহ-প্রেমের গগনচুম্বি নির্দশনকে বাঁচিয়ে রাখে ভবিষ্যতের জনতা। আর মহাশ্বেতার মত মরমী কথাকারেরা তার ফাঁক থেকে বার করে আনে গঙ্গা মতো মায়েদের কথা — প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সেই অনামা-অখ্যাত জীবনের জলছবিতে।

বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া শুরু হলো দ্রুত — বিদেশী কোম্পানী শুরু করল এবার 'প্রতিশোধে'র পালা। পনেরো-ষোল দিন যুদ্ধের পর 'রানী তাঁর ছেলেকে নিয়ে ঝাঁসি ছেড়ে গোয়ালিয়র চলে গেলেন।' রাম-লছমনকে নিয়ে গঙ্গা যাবে কোথায়? আছে তো কেবল একটি দুর্বল ঘোড়া, নিজের স্বামীর সম্পত্তি। ননদের কাছ থেকে যেটি চাইতে গিয়ে বিরাগভাজন হতে হয়েছিল গঙ্গাকে। সেই ঘোড়াও তিনজনকে বইতে পারবে না। আরো একটা ঘোড়া আনতে রাম বেরোল পথে। শহরের পথ রুদ্ধ, কিন্তু পাঁচিল ভেঙে গেছে কামানের ঘায়ে। রাম ঘরে ফেরে না। গঙ্গা নীরব অশ্রুপাত দেখেছে। তার গায়ের রং তুলে গঙ্গা আবার 'লছমনকে 'বিল' করে তুললো। কিন্তু গঙ্গা বিলকে ফিরিয়ে দিলে বড় সাহেবের কাছে। দোভাষী বুঝিয়ে দিল গঙ্গার আর্জি - 'সবাই অবাক হয়ে গেল। মুখে আর কথাটি নেই। এমন করে কেউ পরের প্রাণ বাঁচায় নাকি? শত বিপদ মাথায় নিয়ে?' বিনিময়ে বকশিস চায়নি গঙ্গা, ফিরে পেতে চেয়েছিল তার গর্ভজাত ছেলে রামকে, যে তখন মৃতদের স্তূপের মধ্যে পড়ে। গল্প শেষে গঙ্গার যাত্রা জ্বলন্ত শহরের দিকে, সাহেবদের চিৎকৃত সাবধানবাণী আর তার কানে পৌঁছয় না।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মার্চ ঝাঁসির রানীর কণ্ঠে ঐতিহাসিক উচ্চারণ ছিল -- 'মেরী ঝাঁসি দুংগী নহী'; তারই আড়াল থেকে মহাশ্বেতা বের করলেন গঙ্গার লড়াইটি। 'লছমনের মা' মনে করায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের আনন্দময়ীকে, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অনাথ আইরিশ শিশুকে কোলে নিয়ে ব্রাহ্মণ ঘরের নিষ্ঠাবতী বধূ সেদিন বাহ্যিক আচার-সর্বস্বতাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছিল। তবুও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সেই চরিত্র রূপায়ণে আইডিয়ার প্রাধান্য ছিলই। ক্রান্তদর্শী মনীষীর স্বদেশ-ভাবনা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ সেখানে মিলেমিশে একাকার। কিন্তু মহাশ্বেতার গল্প আরো মাটির কাছাকাছি, যেখানে 'পাথর আর মাটির চাপড়ায় রোদে পুড়ে ঝামার মতো শক্ত' হওয়া ঘরের মায়ের স্নেহের ধারায় শুধু বিদেশী শিশু সিক্ত হয়না, তার অমৃত সিঞ্চনে প্রাণরক্ষা করে।

সূত্র-সংকেতঃ

১. শম্পা চৌধুরী, 'প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প ঃ স্বাধীনাতার আগে ও পারে', রত্নাবলী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ-১২

২. ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-১১, পৃ৪৭-৪৮

৩. তদেব, পৃ ৪৮

৪. সরোজমোহন মিত্র, 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রজ্ঞা সংস্করণ, ২০১১, পৃ ৫৯

৫. সুমিতা চক্রবর্তী, 'ছোটগল্পের বিষয়-আশায়' পুস্তক বিপনি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০২১, পৃ ১৬

৬. তদেব, পৃ ১৬

৭. তদেব, পৃ ১৯

৮. তদেব, পৃ ২০

৯. চিত্রা দেব, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ ৩৭

১০. তদেব, পৃ ৪০

১১. তদেব, পৃ ১১৩

১২. উইকিপিডিয়া, অন্তর্জাল সংগ্রহ

১৩. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পলাশি থেকে পার্টিশন,' ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২, পৃ ২০৭-২০৮

১৪. বেগম রোকেয়া, 'নিরীহ বাঙালি' (প্রবন্ধ), সুতপা ভট্টাচার্য (সম্পা), 'বাঙালি মেয়ের ভবনামূলক গদ্য' সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ ২১২

১৫. কেশব আড়ু, 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের কথা', দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, পৃ ২০৩

১৬. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ' পলাশি থেকে পার্টিশান', পৃঃ২০৮

১৭. তদেব, পৃ ২১০

১৮. দেবলীনা শেঠ (মুখোপাধ্যায়), 'ইতিহাসের প্রত্ন নির্মাণ ঃ অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস', (প্রবন্ধ), বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ৩১তম সংখ্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ ৯৪

১৯. রাহুল দাশগুপ্ত, 'বাংলা উপন্যাসকোশ', প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ ১৬০

২০. জয়া মিত্র, 'মহাশ্বেতা', রোববার, সংবাদ প্রতিদিন, ১০.০২.২০০৮, পৃ ১৬-১৭

২১. তদেব পৃ ২১

২২. মহাশ্বেতা দেবী, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জয়া মিত্র, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন, ১.০২.২০০৮, পৃ ১৭

২৩. অলোক রায়, 'ছোটগল্পে স্বদেশ-স্বজন', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ ২৩৯

২৪. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পলাশি থেকে পার্টিশান,' গ্রাগুক্ত, পৃ ২১১

‘নীল ময়ূরের যৌবন’ ঃ
অন্তজ্যশ্রেণীর প্রতিবাদের আখ্যান

ড. লিংকন দাস

[বিষয়-চুম্বক ঃ *বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদকে অবলম্বন করে যাঁরা সাহিত্য সৃজন করেছেন সেলিনা হোসেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশ শতকের বাঙালির ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে লেখিকা দশম-দ্বাদশ শতকের চর্যাপদের পটভূমিতে রূপক-ছলে ব্যাঞ্জিত করেছেন। বিশ শতকের প্রগতিশীল সময়ে দাঁড়িয়ে যেখানে ভাষার উপর আক্রমণ নেমে এসেছিল সেখানে দশম-দ্বাদশ শতকে যখন বাংলার আদিকবিরা চর্যাপদ লিখেছিলেন তখন তাদের সংগ্রাম কত কঠিন ছিল তাই ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসের মূল বিষয়। আলোচ্য উপন্যাসে চর্যাপদের কবি, চর্যায় উল্লিখিত চরিত্র, রাগরাগিণী, সমাজজীবনের টুকরো টুকরো ছবির কোলাজে প্রাচীন বাঙালির শোষিত নিপীড়িত বঞ্চনায় ভরা জীবনের কথা, উচ্চবর্ণীয় সমাজ ও শাসকের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তৎকালীন অন্ত্যজশ্রেণীর প্রতিবাদের কথা ভাষারূপ দিয়েছেন লেখিকা।*

সূচক-শব্দ ঃ *অন্ত্যজশ্রেণী, আবহমান, উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ, গীত, চর্যাপদ, প্রতিবাদ, ভাষা আন্দোলন*]

বাংলা সাহিত্যের যে-ক’জন লেখক চর্যাপদকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখিকা সেলিনা হোসেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি লেখালেখি শুরু করলেও নিজের প্রতিভাবলে নিজস্ব পরিধি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন নিঃসন্দেহে। একজন সাহিত্যিকের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে তা তিনি কখনো ভুলে যাননি। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই সেলিনা হোসেনের লেখায় উঠে আসে সমকালীন সমাজবাস্তবতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, নারীর অধিকার সচেতনতা, মুক্তিযুদ্ধের কথা, ভাষা আন্দোলনের মতো জ্বলন্ত বিষয়গুলি। আসলে সকল যুগেই সাহিত্য গড়ে উঠে ছিল জীবনকে আশ্রয় করে। তাই সাহিত্যিক তাঁর যাপিত জীবনে যে সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠেন, সেই সময় ও সমাজ তার সৃষ্টি-ভুবনে ভাষারূপ লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন জন্মগ্রহণের বছর থেকে ১৯৫২ ভাষা আন্দোলন, ১৯৬১ ভাষা-সংগ্রাম, ১৯৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনার অভিঘাত সেলিনা হোসেনের মানস জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জনগণের উপর শাসকের অত্যাচারের যে রক্তাক্ত দিনগুলি দেখেছেন তাই তাঁর সাহিত্যের রসদ জুগিয়েছে। সেলিনা হোসেন কেবল সমকালেই যে তাঁর সাহিত্যে ভাষারূপ দিয়েছেন তা নয়; সমকালকে অতীতের পটভূমিতে স্থাপন করে এবং অতীতকে বর্তমানের দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ সময়ে টেনে এনে অতীত ও বর্তমান মধ্যে যোগসূত্র রচনার প্রয়াস করেছেন। সেলিনা হোসেনের রচনায় ইতিহাস চেতনার গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। সমকাল যেমন তাঁর লেখার রসদ যোগায় তেমনি অতীতের স্বর্ণ খনিতেও আজকের বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্বের সন্ধান করে ফেরেন তিনি। আসলে উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল অতীত ইতিহাসের পাতায় বর্তমানের শেকড়ের সন্ধান করা। সেই অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই সেলিনা হোসেন অতীত ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার ও পুনঃনির্মাণের মধ্যে দিয়ে এক অখণ্ড ইতিহাস নির্মাণের প্রয়াস করেছেন ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসে। বাংলা ও বাঙালির আজকের যে সংকট ও সংগ্রাম তা যে আবহমান কালের বাঙালির সংকট ও সংগ্রাম তাই যেন বলতে চেয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

সেলিনা হোসেন তাঁর যাপিত জীবনে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরেও বিশ্বে একমাত্র বাঙালিকে একাধিকবার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। কোনো জাতির শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়ে তাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার ঘটনা

Dr. Linkan Das, Guest Lecturer, Dept. of Bengali, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar

বিশ্ব-ইতিহাসে দুর্লভ নয়। ১৯৫২ সালের স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক উর্দু ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইলে তৎকালীন বাঙালি জাতি নিজের মাতৃভাষা রক্ষার জন্য তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি মানসে যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল তাই ধীরে ধীরে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন যার চূড়ান্ত পরিণতি। সেলিনা হোসেন 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে বর্তমান বাংলা ও বাঙালির ভাষা-সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার লড়াইকে ভাষারূপ দিয়েছেন দশম-দ্বাদশ শতকের চর্যাপদের পটভূমিতে। বাঙালির পূর্বপুরুষেরা অর্থাৎ চর্যাকারেরা যখন তাঁদের আঞ্চলিক মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন তখন তাদেরও নিশ্চয়ই লড়াই করতে হয়েছে তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। লেখিকা অতীত ও বর্তমানের এই দুই ভিন্ন সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। ভাষার স্বীকৃতির লড়াইকে কেন্দ্র করে প্রাচীন বাংলার অন্ত্যজ বাঙালি সমাজ রাজশক্তির শোষণ, শাসন, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কিভাবে একজোট হয়ে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল তারই কল্প-ঐতিহাসিক আখ্যান 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাস।

আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যান গড়ে উঠেছে চর্যার কবি, চর্যার চিত্রিত চরিত্র, বর্ণ ব্যবস্থা, নিম্নবর্গের তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায় সম্বলহীন জীবনচর্যা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। কাহিনির কেন্দ্রে চর্যাপদের লেখক কাহ্নপাদ। কাহ্নপা একজন রাজকর্মচারী। শবরী তার স্ত্রী। দু'বেলা খাবারের অভাব তাদের নেই। দরবারে পাখা টানার কাজ ও স্ত্রীর ভালোবাসায় দিন চলে যায় কাহ্নর। তবুও কাহ্নপার বুকের মধ্যে কী যেন খচখচ করে। রাজসভায় তার প্রতি উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণদের অবহেলা, অবজ্ঞা, অপমান তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। অন্ত্যজদের শ্রমের দৌলতে ভোগ বিলাসে আকণ্ঠ ডুবে থাকে রাজা, মন্ত্রী ও পার্ষদগণ। রাজসভার এই লেখা জোকাহীন ঐশ্বর্য, ভোগ-লালসার যারা যোগানদার; নগরে বসবাসের জন্মগত অধিকার তাদের নেই। সেই সকল শত শত দরিদ্র নিচু জাতের, যাদের 'রক্ত নীল' তাদের কোন কিছুতেই অধিকার নেই। উচ্চবর্ণীয়দের এঁটোকাঁটা চেটেই ওদের খুশি হতে হয়। বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্রের প্রবল প্রতাপ। সেই প্রতাপের কাছে রাজা স্বয়ং কোণঠাসা হয়ে থাকে। নগরের বাইরে অরণ্য সংলগ্ন টিলায় বসবাসকারী কানুর মতো শত শত অন্ত্যজ প্রান্তজন এই রাজতন্ত্রের শিকার। কাহ্নদের ''জীবনের চারপাশে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতাপ। সে শ্বাসরোধী প্রতাপ ওদের কোন দিকেই এগোতে দেয় না। ... কাহ্নপাদ বিষণ্ণ হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ্যবাদের সেই পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায় কিন্তু পথ খুঁজে পায় না।[১] মনের কথা কলমের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রতিবাদ করতে চায়। কিন্তু সরাসরি অন্যায়ের কথা, প্রতিবাদের কথা বলতে পারে না। যাতে রাজরোষে পড়তে না হয় তাই প্রতিবাদের ভাষাকেও আবরণে আবৃত করতে হয়। কাহ্নদের পল্লীর বেশির ভাগ লোকই চাষাবাদ করে, কেউ কার্পাস বোনে। বাকিরা চাঙারি বানায়, নয়তো শিকার করে।' কিন্তু কাহ্ন কবিতা লেখে বলে সবাই মনে করে ও তাদের থেকে আলাদা। তাই বিপদে আপদে সকলে কাহ্নপাদের কাছে ছুটে আসে। তার কথা সবাই মেনে চলে। ওরা যে কাহ্নপাদকে নিজেদের দলপতি বা নেতা রূপেই দেখে। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেওয়ায় কাহ্ন সন্দিহান। বৌদ্ধ রাজা বুদ্ধমিত্র ''বেদ-বিরোধী হলেও আর্য সংস্কারের বিরোধী নয়। ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে আপোষ করেছে বুদ্ধ মিত্র। সে কারণে তার রাজসভায় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অনেক রাজকর্ম চারী নিযুক্ত রয়েছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এখানে নিত্যদিন আসর বসায়। স্বভাবতই বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকর্মের হোতা হয়ে ওঠে তারা। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের গভীরে এ শিকড় প্রোথিত হয়ে যায়, আর এই আধিপত্যের শিকার হয় নিম্নবর্ণের মানুষ।''[২]

রাজসভায় কোণঠাসা হয়ে থাকা কাহ্ন মুখ খোলার সামান্যতম সুযোগ পায় না। কিন্তু কাহ্ন সৃষ্টিশীল মানুষ; তাই প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র হয় তখন রাজ্যসভা তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করে কাহ্নর। সে অনুভব করে উচ্চবর্ণীয়দের রাশভারী সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি ওদের মুখের ভাষা লৌকিক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কেননা এ ভাষাতেই কাহ্নর মতো শত শত অন্ত্যজ সর্বহারা মানুষ কথা বলে। ব্রাহ্মণেরা যতই হাসাহাসি ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করুক না কেন, এই লৌকিক ভাষাই কাহ্নপাদের মুখের ভাষা, বুকের ভাষা। সংস্কৃতের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। তাই রাজসভায় যে গীতের আসর বসে কাহ্নপা সেখানে তার লৌকিক ভাষায় লেখা গীত পড়ার জন্য দেবল ভদ্রের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও সে অনুমতি পায় না। উল্টে দেবল ভদ্র ব্যঙ্গ করে 'ছুঁচোর কেত্তন' বলে ভাগিয়ে দিয়েছে তাকে। দেবল ভদ্র বলে - ''লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য, অকথ্য। ... এটা ম্লেচ্ছ ভাষা, এই ভাষা ব্যবহার করলে অপরাধ হয়, যদি কেউ ব্যবহার করে তাকে প্রায়শ্চিত করতে হবে।''[৩] অথচ রাজদরবারে ও পূজার্চনা ছাড়া দেবল ভদ্রদের সংস্কৃত ভাষার কোন মুল্য নেই। কাহ্নর লৌকিক ভাষা অন্ত্যজদের মুখে মুখে বেঁচে থাকবে। এসব ভাবতে ভাবতে কাহ্নপার ''দেবল ভদ্রের টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলতে

ইচ্ছা করে। নিজের মুখের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে।"[৪] তাই মন্ত্রী দেবল ভদ্র অনুমতি না দিলেও অনড় কাহ্ন রাজার কাছে গীত পড়ার অনুমতি আদায় করে। আনন্দে আত্মহারা কাহ্ন মল্লারীকে বলে ''এতদিনে আমাদের ভাষার মর্যাদা হবে মল্লারী। আমি দেখাবো ওদের ওই বড় বড় তালের মত শব্দগুলো কেবল ভাষা নয়। আমাদের ভাষা ঝরঝরে, প্রাণবন্ত। আমাদের ভাষা সজীব। ... ওদের ঘাড়ে পা রেখে আমার ভাষার শক্তি দেখাতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে নিজের ভাষাটা ওদের সামনে মুকুটের মতো মাথায় পরি।" কিন্তু কি লিখবে তা ভেবে স্থির করতে পারে না। কখনো ভাবে সে নিজের যন্ত্রনার কথা, রাজার অন্যায় অবিচারের কথা বলবে। কিন্তু এমনটা করলে তো ওকে ওরা মেরে ফেলবে। মরতে সে ভয় পায় না। এখনও কাহ্নর অনেক কাজ বাকি আছে যে।

গীত লিখতে বসে কাহ্নর কুক্কুরীপার আবরণে ঢাকা 'রুখের তেনত্তলি কুম্ভীরে খাঅ' গীতটি মনে আসে। ''ওদের জীবন গাছের তেঁতুল ওই দেবল ভদ্রের মতো হোঁতকামুখো কুমিরে খায় বলেই ওদের এত যন্ত্রণা। সমাজে ঠাঁই নেই মুখের ভাষার দাম নেই ঘরে নিত্য অভাব।"[৫] তা না হলে এত ধান, কার্পাস, নদী-পুকুরে মাছ কিসের অভাব ওদের? তাদের কায়িক শ্রমে উৎপাদিত ফসলের সবই রাজার ভাণ্ডারে যায়, ছোট লোকেদের ভাগ্যে কেবল নেড়াকুটা। অনেক কাটাকুটির পর কাহ্নপা পুরোনো একটা লেখাকে এভাবে লেখে - 'আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা' পদটি। রাজসভায় জলসা চলতে থাকে, রাত গভীর হয় কিন্তু কানুর গীত পড়ার ডাক আর আসে না। মন্ত্রীকে বললে সে 'ছুঁচোর কেত্তন' পড়ার অনুমতি না দিয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কাহ্ন রাজার অনুমতির কথা বললে দেবল ভদ্র বলে ''রাজা কে? এই দেবল ভদ্র সব। এখানে রাজার অনুমতিতেও কোন কাজ হয় না।" অপমান আর অবজ্ঞায় রাজসভা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কাহ্ন পথ চলতে থাকে। কাহ্ন অনুভব করে আজকের এই অপমান শুধু তার একার নয়। তার সমাজের সকলের। আজকের গীত না পড়তে পারার দুঃখও তার একার নয়; তার মতো শত শত ছোটলোকের। এতদিন ভাষার স্বীকৃতি নিয়ে যে লড়াই করেছে তা ছিল কাহ্নর একার কিন্তু আজ থেকে এ লড়াই সকলের। রাজসভায় দেবল ভদ্র কিভাবে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল সে কথা মল্লারীকে বললে সে তেড়ে উঠে বলে - ''কিছু করলে না? মাথা ফাটিয়ে দিতে পারলে না?" এভাবে কাহ্নর ব্যক্তি ভাবনা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমাগত। কাহ্নর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করে মল্লারী। ''বাতাস মল্লারীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে যায়, ছড়িয়ে যায় লোকালয়ে, সব মানুষের ঘুমন্ত চেতনায় প্রোথিত হয় প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা।"[৭] খেয়াঘাট, অরণ্য, হালচাষের জমি সবকিছুর উপর রাজার একচেটিয়া অধিকার; যা রাজকোষের আয়ের উৎস। যেনতেন প্রকারে কর আদায় করতে হবেই। তা করতে গিয়ে রাজার লোকেরা অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করে। অন্ত্যজদের জন্য রাজা দশ রকমের শাস্তি বিধান করে রাখে। আইনকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে বদলে নেয়। নিজেদের অন্যায় ব্যভিচারকে বৈধতা দেওয়ার লগ্নে দেবল ভদ্ররা আইন প্রণয়ন করে, ''এক, ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে-কোন ধরণের মেলামেশা করতে পারবে, সে যদি তার বিবাহিত স্ত্রী নাও হয় তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এমনকি গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলেও সংসর্গ দোষ ছাড়া অন্য কোনো নৈতিক অপরাধ হবে না। দুই অন্যের বিবাহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করা কম দোষের হবে। তবে নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হবে অমার্জনীয় অপরাধ।'[৮] আসলে দেবল ভদ্রের মতো উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণেরা নিম্নবর্ণীয় অগণিত লোককে মানুষ মনে করে না। তাদের ব্যবহার্য দ্রব্য মনে করে। তাই তাদের দরকারে কাছে রাখবে; প্রয়োজন ফুরালে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এতদিন ব্রাহ্মণেরা ছোটলোকদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলত। কিন্তু দেবল ভদ্র প্রণীত নতুন আইন ব্রাহ্মণদের দ্বিচারিতা ও ব্যভিচারকে আইনি স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক বৈধতা প্রদান করে। তাই যখন রাজ্যে এই আইন ঢেড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হয় তখন সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। কম বেশী সকলের মনে অসন্তোষের দানা বাঁধে। দেশাখ চিৎকার করে বলে - এতদিন আচার-আচরণে আমরা ছোটলোক ছিলাম। আইন করে নেড়ি কুকুর বানিয়ে দিল। দেশাখের উত্তেজিত চেহারায় বিদ্রোহের যে আগুন কাহ্নপা দেখেছিল তাতেই একটা কিছু রদবদল হয়ে যায়। কাহ্নপাদ দেশাখকে বলে - ''আমি ঠিক করেছি চল আমরা ছোটলোকেরা আলাদা হয়ে যাই। আমাদের ভিতর থেকে একজনকে রাজা বানাই, একজনকে মন্ত্রী। তারাই আমাদের কথা ভাববে। আমাদের উপকার করবে।"[৯] অত্যাচার সহ্য করতে করতে ওদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে; তাই ওরা অত্যাচারী, ব্যভিচারী, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু যাদের নিয়ে কাহ্নপাদ ভেবে অস্থির ওরা তো বাক্যহারা। ওরা কি শাসকের বিরুদ্ধে লড়বে? হতাশায় কানুর বুক মোচড়ায়। দেশাখ শিকারের নামে তীর ধনুকের একটা দল করার কথা ভাবে, যা ধীরে ধীরে এক বিরাট বাহিনী হয়ে যাবে। আসলে যখন লক্ষ্য এক হয় তখন কাউকে ডাকতে হয় না; সবাই নিজের গরজেই এসে জড়ো হয়। দেশাখের তীর ধনুক, ডোম্বীর ছুরি আর

কানুর কলম রাজশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়।

অন্ত্যজশ্রেণীর শ্রেণীর মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনে অগ্নি সংযোগ করে ভৈরবীর যমজ সন্তানের জন্মদান। কেননা রাজার আইন অনুযায়ী 'এক নারীর গর্ভে দুই সন্তানের জন্ম মানে দু'জনের সঙ্গে যৌনসঙ্গম। অর্থাৎ অসতী হওয়ার অপরাধে ভৈরবী ও ধনশ্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ রচিত হয়। কিন্তু ধনশ্রী প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে বলে ''আমার অসতী বৌ নিয়ে যদি আমি ঘর করি তাতে রাজার কী? আমাদের ভালো রাজার দেখতে হবে না। চাই না এমন রাজা।''[১০] ধনশ্রী বড় শক্ত কথা বলেছিল। শাসকের বিরুদ্ধে ধনশ্রীর এই বজ্রনির্ঘোষ প্রতিবাদ আইনের পুরো পাশা পাল্টে দেয়। অনেক ভেবে চিন্তে কাহ্নপাদ রাজসভার কাজ ছেড়ে দেয়। অপমানের অন্ন তার মুখে রুচবে না। কিন্তু ছোটলোকদের মুখে না শব্দ শুনতে দেবল ভদ্র অভ্যস্ত নয়। দেবল ভদ্রের কাছে ছোটলোক হলো কেবল হুকুম শোনার জন্যে। তাই কাহ্নপার ধৃষ্টতা দেবল ভদ্রের কাছে অসহ্য। কাহ্নপার রাজসভার কাজ ছেড়ে দেওয়াকে দেশাখ সমর্থন করে বলে - ''ওদের বোঝাতে হবে আমাদের ভেতরও মানুষ আছে। কেবল ছোটলোক নেই।''[১১] নিজের মাতৃভাষার স্বীকৃতির বিষয়ে এতদিন যে ভাবনা ছিল সেই ভুল ভেঙ্গে যায় কানুর। দেশাখকে বলে - ''কেবল রাজদরবারই কোনো ভাষাকে টিকিয়ে পারে না। ওরা যতই সংস্কৃতির কদর করুক ওটা কারো মুখের ভাষা নয়। ওটাকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? আমাদের ভাষা আমাদের মুখে মুখে বেঁচে থাকবে দেশাখ।''[১২] ভাষাকে কেন্দ্র করে যে স্বাজাত্যবোধ জাগরিত হয়েছিল; রাজার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল, তাই ধীরে ধীরে রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষকে।

এতদিন রাজরোষের ভয়ে কাহ্নপা আবরণে ঢেকে গীত লিখলেও এখন সরাসরি নিজের জীবনের কথা, যন্ত্রণার কথা অত্যাচারের কথা, ব্রাহ্মণদের দ্বিচারিতার কথা লেখে তার গানে। কাহ্ন গীত লেখে -

নগর বাহিরেরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুঁড়িআ।

ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িআ।।

গীতটা শুনে শবরী চেঁচিয়ে বলে ''ঠিকই লিখেছ কানু। ওই এক জায়গায় বামুনেরা ছোটলোকের শরীরের কথা ভুলে যায়। তখন সব পবিত্র হয়।''[১৩] বুনো উল্লাসে ডোম্বী এই গীত গায়। এই গানে তারই জীবনের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সকলের মুখে মুখে কাহ্নর এই গীত ছড়িয়ে পড়ে নিমেষে। পর দিন গীত লেখার অপরাধে রাজার লোক কাহ্নপাদকে নিয়ে যায়। শবরী কাঁদলেও ডোম্বির চোখে সেদিন আগুন ছিল। প্রাথমিক শাস্তিস্বরূপ রাজার লোকেরা তাকে চুনের গুদামে আটকে রাখে। দেবল ভদ্র একটা শর্তে কেবল কাহ্নকে ছাড়তে পারে যদি সে রাজার প্রশস্তি রচনা করে। কিন্তু কাহ্ন দৃঢ় কণ্ঠে জানায় - ''রাজাকে আমি চিনি না। ... আমি আমার লোকেদেরই চিনি। আমি ওদের কথাই বুঝি।'' কাহ্নপাদকে আবার চুনের গুদামে আটকে রাখে। অন্ধকার গুদাম ঘরে বসে কানু একটা নতুন দ্বীপের স্বপ্ন দেখে। কিভাবে সেই দ্বীপকে গড়ে তুলবে তার পরিকল্পনাও করে। পুনরায় কাহ্নকে রাজপ্রশস্তি, মন্ত্রীর কথা লিখতে বললে সে জানায় তার ভাষায় কেবল তাদের সমাজের লোকের কথাই বলা যায়। রাজা রাজড়ার কথা নয়।

কানুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার দু'দিনের মধ্যে ডোম্বি তার অপমানের প্রতিশোধ নেয়। যেদিন দেবল ভদ্রের ভাগ্নে রাতের অন্ধকারে ডোম্বির ঘরে প্রবেশ করেছিল, সেদিন সুযোগ বুঝে ডোম্বি তার কোমরের ধারালো ছুরি ওর বুকে বসিয়ে দিয়েছিল। নির্বিকার ডোম্বি দেশাখকে বলেছে - ''কানু আমাদের সবার জন্য লড়ছে। একটা বামুন মেরে দেখালাম আমরাও মারতে পারি। আমরা শুধুই ছোটলোক নই''[১৪] শাস্তি স্বরূপ ডোম্বির ফাঁসি হয়। পুনরায় দেবল ভদ্রের দরবারে নিয়ে যাওয়ার সময় কাহ্নপাদ ডোম্বির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। ডোম্বির হাসি কানুর বুকের মাঝে বাজে। সে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায়। দেবল ভদ্রের আদেশে কানুর দুহাত কেটে অজ্ঞান অবস্থায় নদীর ধারে ফেলে দিয়ে যায়। যাতে কাহ্ন কোনদিন আর গীত লিখতে না পারে। গ্রামবাসীরা কাহ্নকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। জগা কবিরাজ গাছগাছালির ঔষধ দিয়ে কাহ্নকে সুস্থ করে তোলে। কানু অনুভব করে সবাই আজ ওর কাছাকাছি এসে গেছে। সবাই কানুর কথা বুঝতে পারছে।

ডোম্বির ফাঁসি, কাহ্নপাদের হাত কেটেও দেবল ভদ্র নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। পূর্ণিমার রাতে রাজার লোকেরা তাই কানুদের পাড়ায় আগুন দেয়। জীবন বাঁচিয়ে সবাই বনের কাছাকাছি টিলায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দেশাখের তৈরি মিলিশিয়া বাহিনী একটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু পেরে ওঠেনি। দেশাখদের এই পিছিয়ে আসা কেবল বেঁচে থাকার

জন্য নয়; নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য। কাহ্নপাদ বলে - ''তোরা কেউ দুঃখ করিস না দেশাখ'' আমাদের তেমন একটা জায়গা একদিন হবে। আমরাই রাজা হবো। রাজা-প্রজা সমান হবে। আমাদের ভাষা রাজ দরবারের ভাষা হবে। তেমন দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে দেশাখ। দার্শনিক সূলভ এই দীপ্ত ঘোষণা শোষণে-শাসনে, অপমানে-অত্যাচারে জর্জরিত হতোদ্যম অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিবাদীসত্তাকে জাগিয়ে কাহ্ন স্বৈরাচারী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ডাক দেয়। তারা পলিমাটি ভরা সবুজ শ্যামল এক স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখে। যেখানে সাম্যবাদী সমাজ বিকশিত হবে। তাদের মুখের ভাষা হবে রাজদরবারের ভাষা। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাস এভাবে প্রাচীন বাংলায় অন্ত্যজশ্রেণীর শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিরোধের আখ্যান হয়ে উঠেছে। প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালির এই সংগ্রামের রূপক-ছলে সেলিনা হোসেন ব্যঞ্জিত করেন ১৯৫২ সালের ভাষা সংগ্রাম, মুক্তি যুদ্ধ ও স্বাধীন দেশ গঠনের ইতিবৃত্তকে।

সূত্র-সংকেতঃ

১. সেলিনা হোসেন 'নীল ময়ূরের যৌবন, নয়া উদ্যোগ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯, পৃ-৫

২. তদেব পৃঃ ৩৪

৩. তদেব, পৃঃ ৩৫

৪. তদেব, পৃঃ ৩৫

৫. তদেব, পৃঃ৩৬

৬ তদেব, পৃঃ৩৮

৭. তদেব, পঃ ৫০

৮. তদেব, পৃঃ৫৫

৯. তদেব, পৃঃ ৬০

১০. তদেব, পৃঃ১০২

১১. তদেব, পৃঃ১১৪

১২. তদেব, পৃঃ১১৪

১৩. তদেব, পৃঃ১২৮

১৪. তদেব, পৃঃ১৩৪

১৫. তদেব, পৃঃ১৪৪

শঙ্খমালা ঃ কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের নারী

শ্রাবন্তী মজুমদার

[**বিষয়চুম্বক** ঃ *বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) এক বিস্ময়। রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে এসে যিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে নির্মাণ করতে পেরেছিলেন নিজস্ব জগৎ। প্রকৃতি-প্রেম-বেদনার সম্মিলনে জীবনানন্দ দাশ যে কাব্যভাষা রচনা করেছেন তা আধুনিক বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর নারীরা নাম ও সংবেদনশীলতায় প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা দ্বারা চিহ্নিত। জীবনানন্দের কবিতায় নারী এসেছে বারবার, স্বনির্বাচিত দূরত্বে থেকে তিনি নারীকে পেতে চেয়েছেন আশ্রয়ে, আতঙ্কে, বিষাদের আধারে।*

সূচক-শব্দ ঃ *নারী, বিষন্নতা, অন্ধকার, অন্বেষণ, প্রকৃতি, কাব্যভাষা, শৈলী*]

তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।[১]

কে এই নারী ! যে নারীর রূপকে একে একে বনলতা, শঙ্খমালা, সুদর্শনা, শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সবিতা, সুচেতনা, আকাশলীনা, দীপ্তি, বিপাশা, অরুণিমা বা কমলাবতীরা প্রেমের সুনিবিড় এক আবর্ত রচনা করে চলে ! কে সেই নারী যার আকুলতায় কত শত রাধিকাকে ফুরিয়ে যেতে হয় ! আসলে এই অনিঃশেষ নারী জন্ম হলো এক চৈতন্যময় আলো যা ব্যক্তিগত অনুভব হয়েও নৈর্ব্যাক্তিক নির্মাণের আবহে মিলে যায় ... মিশে যায় জীবনান্বেষণে।

কবি জীবনানন্দ দাশের *বনলতা সেন* এবং *মহাপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থ দুটির প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যায় যে এই পর্যায়ে কবিমন নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন সময়েই প্রশ্নময় হয়ে উঠেছে। এই প্রশ্নমালার সমাধানকল্পে তিনি ঈশ্বরিক প্রেমের পরিবর্তে *মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়*-এর অনুধ্যান করেছেন। আর তাই তিনি কেবল মাত্র একটি নারীর জন্য একটি অসীম সংখ্যার প্রতীক হিসেবে হাজারটি বছর পথ হাঁটতে চেয়েছেন ... তিনি দণ্ডিত হয়েও জীবনের শোভা দেখে যেতে চেয়েছেন এমনকী তিনি দেখাতেও চেয়েছেন -- নারী আজ সময়ের নিজের আধার ! জীবনানন্দ দাশের এই নারী ভাবনা এবং প্রেমচেতনা ধরা পড়ে তাঁর বহু কবিতায়। তবে 'শঙ্খমালা' হয়ে অন্য কোনো নারী হয়তো এতো বার আর আসেনি।

'শঙ্খমালা' কবিতাটি *কবিতা* পত্রিকায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই পরে *বনলতা সেন* (প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৪৯, ডিসেম্বর ১৯৪২) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।১৯৩৬-৩৭ সালে অর্থাৎ প্রায় এক বছরের বেশী কিছু সময় ধরে (পৌষ ১৩৪২ - চৈত্র ১৩৪৩) কবিতা পত্রিকার ছ'টি সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশের নতুন বারোটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল যার সবই ছিল বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের। এবং তার মধ্যে পরমতম কবিতা হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায় 'শঙ্খমালা' কবিতাটিকে। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্লীন ভাষ্যে মুকুরিত হয়েছে প্রেম এবং বিষন্নতা। ব্যথাতুর আলো হয়ে প্রতিটি কবিতাই অন্ধকারকে ভালোবাসতে চেয়েছে। আর তাই কবি প্রকৃতির নিয়ম মোতাবেক আলোচ্য কবিতাতেও দু'হাত বাড়িয়ে খুঁজতে চেয়েছেন আঁধার-সঞ্জাত কিছু আলো। কবি শুনতে পান -- 'কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে' কে এক নারী এসে তাঁকে ডাকছে। জীবনানন্দের অপরাপর নায়িকাদের থেকে কিছুটা অভাবনীয় ভঙ্গিতে এবং যথেষ্ট সাবলীল সুরে 'তোমাকে চাই' বলে এই নারী কবিকে ডাকে ! আর কবি তাকে ডেকে ওঠেন শঙ্খমালা বলে, কবি তাকে সুনিবিড় ভাবে ডেকে ওঠেন শঙ্খিনীমালা বলে। অবশ্য তিনি দ্বিধাতুর, হাল ভাঙা নাবিকের বিভ্রান্তি নিয়ে সেই সে এক নারী- কে আবিষ্কার করে টের পান -- 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।'

Srabanti Majumder, Researcher, Dept. of Bengali, Rabindra Bharati University, Kolkata

'শঙ্খমালা' কবিতাটি ভাবব্যঞ্জনায় দুটি পৃথক অবয়ব নির্মাণ করে চলে। যার এক দিকে রয়েছে কবিকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাকুলতা অন্যদিকে কবি নিজেই বর্ণনা করে চলেন তাঁর শঙ্খমালাকে। কবিকে ঘিরে শঙ্খমালা এমনই এক বিভ্রম রচনা করে যে সে নিজে ধরা না দিলে তাকে ধরা যায় না। তাই সন্ধ্যার অন্ধকারে, যখন সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন এক মায়াজালে নিজেকে মুড়ে নেয় ঠিক তখনই সে কান্তারের পথ ছেড়ে কবিপথ অনুসরণ করে। এই নারীর উপস্থিতি রহস্য বাড়িয়ে দেয় এবং সে যেন ভাবলেশহীন হয়ে জানায় সে কবিকে চায়। এই অভিব্যক্তিটুকুই কেবল আমরা পাই, আর বিশেষ কিছু বলে না আমাদের শঙ্খমালা। অন্ধকারের মধ্যে 'শাদা' শুভ্র এই উপস্থিতি কোথাও যেন ক্রমাগত এক আলোর জন্ম দিয়ে চলে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আলো-অন্ধকারের এই অনায়াস যাতায়াত যেন কবি চেতনায়ও বার বার খেলা করে এবং শেষ পর্যন্ত তা রূপান্তর ঘটায়। তাই কবিও যেন দিনের স্বচ্ছ আলো ভুলে নির্জন বিলাসীর মতো অন্ধকারের পথ বেয়ে বেছে নিয়ে চলে যেতে চান দূরতর নক্ষত্রের কাছে। কবি জীবনানন্দ দাশের এই অন্ধকার প্রিয়তার বর্ণনায় জহর সেন মজুমদার বলেন --

> নগ্নতা, মত্ততা এবং নির্জনতা ... এসবের সঙ্গে যখন এসে পৃথিবী মেশে, বেদনার রঙ থেকে মানবতার উত্থান হয় এবং চতুর্দিকে ঘনিয়ে ওঠে এক ভয়াবহ অবুঝ স্তব্ধতা, তখন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে অন্ধকার ছিঁড়ে বার হয়ে আসতে চান অন্ধকার প্রক্রিয়ার সন্তান জীবনানন্দ।[২]

'বনলতা সেন' কবিতায় কবি তাঁর কাঙ্খিত নারীকে নিয়ে অন্ধকারেই মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন। সেখানে তিনি বনলতার অন্বেষণ করে গেছেন হাজার হাজার বছর ধরে আর 'শঙ্খমালা' কবিতায় শঙ্খমালা নিজে এসে কবিকে ডেকেছে। প্রেম এবং বিরহের এই পরিভ্রমণ এসে শেষ হয়েছে সন্ধ্যের অন্ধকারে। প্রেমাস্পদকে পাওয়ার যে দুর্গম পথ তাকে আরো দুর্বোধ্য করে তোলার জন্যই কি কবি এই ব্যঞ্জনা তুলে ধরেন! আলোচিত কবিতায় কবি শঙ্খমালার কাছে পরম আরাধ্য হয়ে ওঠেন। শঙ্খমালা বলে ওঠে -- 'তোমারে চাই'। এবং তারপরই বেতের ফলের মতো নীলাভ দুটি চোখকে আঁকড়ে ধরে আবার নক্ষত্রলোকে পাড়ি দেওয়ার এক যাত্রাপথ রচিত হয়। কবিকে তীব্র ভাবে পেতে চাওয়ার বাসনা ঘনীভূত হতে থাকে --

> সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
> জোনাকির দেহ হতে --- খুঁজেছি তোমারে সেইখানে
> ধুসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে
> ধানসিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
> সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে আর ধানে
> তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।[৩]

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে কবির অন্তদৃষ্টি পাঠককেও জাগিয়ে তোলে, এবং আমরা শঙ্খমালা চিনে নিতে চাই। শঙ্খমালার এই আবির্ভাব কিছুটা মায়াবী কিছুটা অশরীরী মনে হয়, মনে হয় কোনো এক বিমর্ষ পাখির রঙে তার দেহ নির্মিত হয়েছে। পাখিটির বৈশিষ্ট্যও কবি নির্দিষ্ট করে দেন। সে পাখিও সন্ধ্যের অন্ধকারে ভিজে শিরীষের ডালে এসে ধরা দেয়। এখানে 'অন্ধকার' এবং 'ভিজে' -- দুটি শব্দে যৌনবোধ ভাস্বর হয়ে ওঠে। চাওয়াটা দৈহিক বলেই কি সে আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে কামনাতুর হয়ে উঠতে চায়! কারণ শুধু মাত্র আলোর বিভা সঞ্চারই তো তার কামাই নয়, উজ্জ্বল কোনো নায়িকা হয়ে তো উঠতে চায়নি এই নারী। সে শুধু 'কড়ির' মতো 'শাদা' মুখ এবং 'হিম' হয়ে আসা দু'বাহু নিয়েই প্রমত্ত হয়ে ওঠে। কবিতার এই অংশে তার যে বর্ণনা পাই তাতে তো তার 'শঙ্খমালা' থেকে 'শঙ্খিনীমালা'য় উত্তরণ ঘটে --

> চোখে তার
> যেন শতাব্দীর নীল অন্ধকার!
> স্তন তার
> করুণ শঙ্খের মতো -- দুধে আর্দ্র -- কবেকার শঙ্খিনীমালার![৪]

সম্পূর্ণ কবিতাটির প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যায় এগারো লাইনের প্রথম অংশে শঙ্খমালা ব্যাকুল বাসনায় কবি-অন্বেষণ করছে বারো লাইনে গিয়ে কবি স্বয়ং শঙ্খমালাকে আবিষ্কার করছেন। এই অন্বেষণ এবং আবিষ্কার জীবনানন্দের বহু কবিতায় আমরা পেয়েছি। এর মাধ্যমে কেবল মাত্র বাহ্যিক জীবনভঙ্গি-ই নয় আভ্যন্তরীণ জীবনেরও মর্মোদঘাটন হয়েছে। যার ফলে শঙ্খমালার শরীর এবং উপস্থিতির মধ্য অভিব্যক্তিবাদ প্রকট হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি আলো-আঁধারের যুগপতে

শঙ্খমালার এই অভিসার করুণ ও বেদনার্দ্রও হয়ে উঠেছে।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতাজীবনের প্রথম পর্বে নারীকে দেখেছেন সৌন্দর্য-প্রেম-কামনার ত্রিবেণী সঙ্গমে। নারীর রহস্য নিঃসৃত দীপ্তি তখনো তাঁকে উদ্ভাসিত করতে পারেনি। সেই নারী ছিল অতীত সভ্যতার থেকে উঠে আসা বিষণ্ণময় এক মায়ার মতো, যে মায়াময়তার শক্তিতে সেই নারী বিদিশা, শ্রাবন্তী, বিদর্ভের দূরত্ব মোচন করে দু'দণ্ড শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে চায়। এই বিষণ্ণ অতীতচারিতা কেন্দ্রিভূত হয়ে এক অমোঘ আকষর্ণের জন্ম দেয়। আর তাই শঙ্খমালার চোখে ফুটে ওঠে শতাব্দীর নীলাভ অন্ধকার, তার স্তন হয়ে ওঠে করুণ শঙ্খের মতো ব্যাকুল এবং শেষ পর্যায়ে গিয়ে তার চোখের ভাষার ব্যক্ত হয় সমস্ত শরীর জ্বলে-পুড়ে ওঠার দাউদাউ কামনা। শুধু শঙ্খমালা বা বনলতা সেনই নয়, পাড়াগাঁর আরো নারীকুল ওই একই আবহ রচনা করে। কবি চেতনায় লুকিয়ে থাকা ক্রিস্টিক রোমান্টিসিজম এভাবেই রূপমুগ্ধতা লাভ করে।

এই নারীকেন্দ্রিক ভাবনা জীবনানন্দের সমগ্র কবিজীবনকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। ভাবনা বিন্যাসের বিশ্লেষণে নারীর তিনটি পর্যায় দেখা যায়। *ঝরা পালক* থেকে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পর্যন্ত যে পর্বটি আমরা পাই সেখানে কবি জীবনের ব্যক্তিগত পর্যায়ে রয়েছে প্রথম যৌবনের কিছু চেনা-জানা নারীরা। নারীর প্রতি অনুরাগ, ভালোলাগা-ভালোবাসা বা ভীরুতা, লজ্জা, প্রত্যাখ্যানের এক বর্ণিল চিত্রপট ধরা পড়ে। এই পর্বের নারীরা বাস্তব জীবন থেকে উঠে এসেও তারা প্রত্যেকেই যথা নিয়মে রহস্যময়ী। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যগ্রন্থের 'প্রেম' শীর্ষক কবিতায় তিনি খুব উদ্বেল হয়ে জানান --

> যতদিন বেঁচে আছি আলোয়ার মতো আলো নিয়ে, -
> তুমি চ'লে আস প্রেম-তুমি চলে আস কাছে প্রিয়ে !

এখানে প্রেমকাতর হয়ে কাঙ্ক্ষিতকে চাইছেন, ব্যক্তিগত অনুরণন এখানে স্পষ্ট। প্রেম পিপাসার এই ভাবনা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে হতে এক বৈর্ব্যক্তিক পর্যায় গড়ে উঠেছে এবং যার বিস্তার লক্ষ করা যায় *বনলতা সেন*, *রূপসী বাংলা*, থেকে *মহাপৃথিবী* পর্যন্ত। *রূপসী বাংলা* কাব্যের নারীরূপ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে হতে *বনলতা সেন*-এ এসে নিজস্ব নাম, পদবির মধ্য দিয়ে একটি আইডেন্টিটি তৈরি করেছে। সুস্নাত জানা তাঁর পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা বইটিতে জানান --

> রূপসী বাংলার ৫,৭,১৩, ৩৯ সংখ্যার সনেটে, বনলতা সেন নামের কবিতায়, শঙ্খমালায়, শ্যামলী- সুরঞ্জনা-সুচেতনায় এক ধরণের নারী কর্মমুখর পুরুষের জীবনের রণরক্ত সফলতার কাছে একরকম শান্তির মতো, প্রেরণার উৎস হয়ে প্রেমে-অপ্রেমে, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ব্যর্থতা ও সাফল্যে এক ধরণের মেটাফিজিক্স গড়ে তুলেছিল যেন। দূরে-কাছে আশে-পাশে অরুণিমা সান্যাল, শেফালিকা বোসরা উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল কখনও বা। এই অংশের ভাবনায় প্রেমকে শান্তি সৌন্দর্য প্রতিভায় উত্তরিত করতে গিয়ে আগের পর্যায়ের প্রেমের আলম্বন ঃ চুল-মুখ-হাত-স্তন প্রভৃতি শরীরী শব্দগুলিকে অনায়াসে রূপান্তরিত করেছে নীলিমা-সৌন্দর্য-প্রতিভা-আলোতে।[৫]

পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু জীবনানন্দ দাশ নারীর প্রেমিকা মূর্তিটিকে শক্তিময়ী করে এঁকেছেন, যার পরিধি বিশ্বানুভূতি তথা মহাবিশ্বলোকে গিয়ে মিলিত হয়েছে। অন্ধকারে সূর্যরূপিনী নারী *বেলা অবেলা কালবেলা* কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় সাক্ষ্য রেখে গেছে। 'সূর্য নক্ষত্র নারী' কবিতায় তিনি বলেন --

> দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
> একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে।

শুধু প্রেয়সী-মানবী-ধরিত্রী-ই নয় জীবনানন্দ লোকগাথার আদলেও তাঁর দয়িতাকে দেখতে চান। শঙ্খমালা এই নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন লোক ঐতিহ্য। রূপসী বাংলা থেকে উঠে আসা এই নারী অতীত এবং বর্তমানকে মিশিয়ে সভ্যতা-নগরী নিয়ে রূপকথাময় যে জগৎ রচনা করেন তা লোকসংস্কৃতি হয়ে পাঠককে অন্য দিগন্তে নিয়ে যায়। লোকায়ত কাহিনি এবং তার সঙ্গে নিহিত রূপকথার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দের কবিতার শঙ্খমালা প্রসঙ্গে আবু তাহের মজুমদার বলেন—

> শঙ্খমালা প্রাচীনকালের রূপকথার একজন নায়িকা ঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রার সময়ে সওদাগর শঙ্খমণিকে তার স্ত্রী শক্তিসুন্দরী একটি শঙ্খমালা উপহার দেন। ভ্রমণের এক পর্যায়ে

> সওদাগর মালাটি হারিয়ে ফেলেন এবং এর ফলে শক্তিসুন্দরীকে নানা দুর্বিপাকে পড়তে হয়। জীবনানন্দ লোকঐতিহ্যিকে তার কাব্য-সমৃদ্ধি এবং উৎকর্ষের জন্য যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন।... শঙ্খমালা লোঐতিহ্য থেকে আহরিত জীবনানন্দের একমাত্র নায়িকা।[৬]

মূলত জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে নিজস্ব স্টাইলে এক আধুনিক গদ্যভাষার আলেখ্য রচনা করেছেন। বিশ শতকের তিরিশের দশকের এই কবি স্বমহিমায় যে কাব্য বলয় নির্মাণ করেছেন তা পরবর্তী দশকের সন্মিলনে উপস্থাপন করে এক আশ্চর্যময় সমকাল। সেই সময়ের অবগাহনে বিষন্নতা-নশ্বরতা একে একে গ্রন্থিত হয়ে চলে। পুরাণ, ইতিহাস চেতনা, লোকায়ত ভাবনা চেতনার গভীরে মিশে গিয়ে এক রহস্যকৌশলের জন্ম দেয়। আর তাই দক্ষিণ শিয়রের শুয়ে থাকা শঙ্খমালা নিজস্ব দাহে পুড়ে যেতে যেতে জীবন্ত শব হয়ে ওঠে। উষ্ণতা শূন্য তার দুটি হাত তখন ব্যকুল, রক্তহীন 'শাদা' মুখে হিজল কাঠের অগ্নিমেদুরতা নিয়ে জেগে থাকা চোখদুটি আবেদনময় হয়ে থাকে এবেং শঙ্খমালা স্মৃতিচিহ্ন রাখার অঙ্গীকারে এক সময় নিজেই হয়ে ওঠে প্রত্নপ্রেমিকা! মানবী সত্তা থেকে অশরীরী হয়ে ওঠার এই যাত্রাপথ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে মহাবিশ্বালোকের ঈশারা, যা যুগ থেকে যুগে সঞ্চারিত হয়।

সূত্র-সংকেতঃ

১. জীবনানন্দ দাশ, জীবনান্দ দাশের কাব্যসমগ্র, ভারবি কলকাতা, ২০০১, পৃ-২০৭

২. জহর সেন মজুমদার, বাংলা কবিতা ঃ মেজাজ ও মনোবীজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ-৭৩।

৩. জীবনানন্দ দাশ, জীবনান্দ দাশের কাব্যসমগ্র, ভারবি, কলকাতা, ২০০১, পৃ-১৯০

৪. জীবনানন্দ দাশ, জীবনান্দ দাশের কাব্য সমগ্র, ভারবি, কলকাতা, ২০০১, পৃ-১৯০

৫. সুস্নাত জানা, পোস্ট মডার্নিজমল ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা, দে'জ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ-১৫৮

৬. আবু তাহের মজুমদার, জীবনানন্দ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, পৃ-১৬২

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. জহর সেন মজুমদার, বাংলা কবিতা ঃ মেজাজ ও মনোবীজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৮

২. সুস্নাত জানা, পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা, দে'জ, কলকাতা, ২০১৮

৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কবিতায় কালান্তর, দে'জ কলকাতা, ২০০০।

৪. নারায়ণ হালদার, জীবনানন্দ ঃ কবিতায় মুখোমুখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩।

পত্রিকাঃ

১. পশ্চিমবঙ্গ, কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

নির্বাচিত বাংলা নাটকে তৃতীয় সত্তার উপস্থাপন ঃ একটি পর্যালোচনা

সুমন সাহা

[বিষয়-চুম্বক ঃ *এই প্রবন্ধে বাংলা নাটকে তৃতীয় সত্তার সঙ্গে পুরুষ সমকামিতার উপস্থাপন কিভাবে হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোকনাট্য হোক কিংবা থিয়েটার নাট্যকলার বিভিন্ন ধারায় তৃতীয় সত্তার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। একটা সময় পর্যন্ত থিয়েটারগুলোতে নারীদের স্থান ছিল না। নারীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য পুরুষদের বিশেষত নারীসুলভ পুরুষদের চাহিদা ছিল অধিক। সেই পুরুষ অভিনেত্রীদের বলা 'বেনেপুতুল'। লোকনাট্য থিয়েটারে তাঁদের ভূমিকা এবং সেখান থেকে শুরু করে একুশ শতকে মঞ্চস্থ কিছু নাটকে তৃতীয় সত্তা ও সমকামিতা প্রসঙ্গ কিভাবে উপস্থিত হয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। অভিনয়, আবেদন ও দর্শকদের চাহিদার গুণে লোকনাট্য তাঁদের পদোন্নতি এবং থিয়েটারে পদের অবনতির পর নাটকের প্রধান বিষয় ও প্রধান চরিত্র রূপে একালের বাংলা নাটকে পুরনায় তাঁদের উপস্থাপন, একই সঙ্গে তাঁদের জীবনের না-বলা শত কাহিনী, যা প্রকট হয়নি, এতদিন, তা কিভাবে নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে, তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।*

সূচক-শব্দ ঃ *তৃতীয় সত্তা সম্প্রদায়, বেনেপুতুল, সমকাম, আধুনিক বাংলা নাটক, চপল ভাদুড়ী* **]**

ভূমিকা ঃ

যৌনতা বিষয়টি যদিও চার দেয়ালের ভিতরের গল্প তবু ভারতবর্ষের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যৌনচেতনার উপস্থাপন লক্ষ করা গেছে বারবার। প্রাতাহিক জীবনে এই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে মানুষ আজও কুণ্ঠিত হয়, প্রকাশ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয় রূপে যৌনতার রূপায়ণ কিংবা সমালোচনার ক্ষেত্রে খুব বেশি শুচিবাগ্রস্ততা দেখা যায় না। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' সহ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে যৌনচারের একাধিক দৃষ্টান্ত লক্ষ করা গেছে। মন্দির গাত্র থেকে পুরাণের পাতায় তার দৃষ্টান্ত বর্তমান। প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ অর্থে ভারতীয় উপমহাদেশে রচিত গ্রন্থাদিকে বোঝানো হচ্ছে। সেখানে নারী-পুরুষের মিলন চিত্রের পাশাপাশি তৃতীয় অস্তিত্বের প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় সত্তার যৌনতা অর্থাৎ সমকামী, উভয়কামী, শিশুকামী, পশুকামী প্রভৃতি সত্তাকে বোঝানো হচ্ছে।

যৌনতার মুল ধারায় পাশাপাশি যখন আরেকটি ধারার সূত্রপাত হয়, তখন প্রচলিত ধারায় একটু দোলা লাগে। আলাদা রকমের এই ধারা হল সমকাম এবং তৃতীয় সত্তার মানুষের যৌনসত্তা। দুটোকে আলাদা করার কারণ -- এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা সমকামী সত্তাকে গোপনে রেখে সমাজের মূল ধারায় মিশে থাকেন। অন্যদিকে তৃতীয় সত্তার মানুষের যৌনসত্তা আলাদা করে বলার কারণ তাঁদের যৌন অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখতে হয় না। এখানে উল্লেখ্য, সমকাম বিষয়টি কিন্তু নতুন নয়। পৌরাণিক কাহিনীতেও এই প্রসঙ্গ বহুবার লক্ষ করা গেছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে সমকামী অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে একাধিকবার। স্বয়ং রবিঠাকুরের বিভিন্ন সময়ে লেখা গল্প, গান, উপন্যাস ও নাটকের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে সমকামী প্রসঙ্গ প্রকট হয়েছে নানাভাবে। শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের বিভিন্ন লেখায় সমকামের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা নাটকে পুরুষ সমকামিতার উপস্থাপন বিষয়টি আকর্ষণীয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মালিনী' নাটকে, 'চিত্রাঙ্গদা', 'মুক্তধারা'য় এই প্রসঙ্গের আভাস পাওয়া গেছে বহু আগে। সেই ধারা বজায় রেখে একালের বাংলা নাটকে সমকামকে বিষয় রূপে ব্যবহার করেছেন যে সকল নাট্যকার, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন -- ব্রাত্য বসু, শেখর সমাদ্দার, মনোজ মিত্র, রাকেশ ঘোষ প্রমুখ। ব্রাত্য বসু রচিত 'কৃষ্ণগহ্বর', শেখর সমাদ্দার রচিত 'রমনীমোহন', 'সুন্দর বিবির পালা', রাকেশ ঘোষের 'উপল ভাদুড়ী' -- এ প্রসঙ্গে

Suman Saha, Researcher, Dept. of Bengali, Rabindra Bharati University, Kolkata

উল্লেখযোগ্য নাটক। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা নাটকে তৃতীয় সত্তার সঙ্গে পুরুষ সমকামিতার উপস্থাপন কিভাবে হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লোকনাট্য হোক কিংবা থিয়েটার -- নাট্যকলার বিভিন্ন ধারায় তৃতীয় সত্তার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। একটা সময় পর্যন্ত থিয়েটারগুলোতে নারীদের স্থান ছিল না। নারীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য পুরুষদের বিশেষত নারীসুলভ পুরুষদের চাহিদা ছিল বেশি। এই পুরুষ অভিনেত্রীদের বলা হত 'বেনেপুতুল'। লোকনাট্য এবং থিয়েটারে তাঁদের ভূমিকা এবং সেখান থেকে শুরু করে একুশ শতকে মঞ্চস্থ কিছু নাটকে তৃতীয় সত্তা ও সমকামিতা প্রসঙ্গে কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অভিনয়, আবেদন ও দর্শকদের চাহিদার গুনে লোকনাট্যে তাঁদের পদোন্নতি এবং থিয়েটারে পদের অবনতির পর নাটকের প্রধান বিষয় ও চরিত্র রূপে পুনরায় তাঁদের উপস্থাপন, একই সঙ্গে তাঁদের জীবনের না-বলা শত কাহিনী, যা প্রকট হয়নি এতদিন, তা কিভাবে নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে, তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

নাট্য ক্ষেত্রে 'বেনেপুতুল' বা পুরুষ অভিনেত্রী

লোকনাট্য হোক কিংবা থিয়েটার অভিনয় শিল্পের বিভিন্ন ধারায় তৃতীয় সত্তার অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। একটা সময় পর্যন্ত লোকনাট্যে, যাত্রা, থিয়েটারে নারীদের স্থান ছিল না। কারণ তৎকালীন সময়ে নারীরা ছিল পর্দানশিন। নারীদের মঞ্চে এসে নাচ, গান, অভিনয় করা সমাজের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তাই নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পুরুষদের নারীর সাজসজ্জা করে মঞ্চে আসতে হত। এর অর্থ এই নয়, যাঁরা নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন তাঁরা সকলেই নারীসূলভ কিংবা তৃতীয় সত্ত্বার মানুষ। নারীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নারীসুলভ পুরুষদের চাহিদা ছিল বেশি, কারণ একজন তথাকথিত 'straight' পুরুষ নারী সেজে অভিনয় করলে তাঁর অভিনীত দৃশ্য নারীর যে ভাবভঙ্গি অথবা অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে, তার চাইতে অনেক নিখুঁতভাবে তা ধরা পড়বে নারীসূলভ পুরুষের অভিনয়ে। তাঁদের অভিহিত করা হত একটি বিশেষ নামে -- 'বেনেপুতুল'। প্রথমদিকে তাঁদের মূল নারী চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেলেও পরবর্তীকালে যখন অভিনয়ে নারীদের প্রবেশ ঘটে তখন নারীসুলভ পুরুষরা ব্রাত্য হয়ে পড়ে। নারীরা যারা থিয়েটার আসত, তারা কেউ সমাজের মুলস্রোতের লোক নয়। তাঁরা ছিল হয় পতিতা শ্রেণীর, নয় নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়ে নিম্নশ্রেণীর নারীরা থিয়েটারে যুক্ত হত। তাদের শিখিয়ে, পড়িয়ে নেওয়ার দায়িত্ব সামলাতে হত বেনেপুতুলদের অর্থাৎ পুরুষ অভিনেত্রীদের। ঠিক তখন থেকে তাঁদের পদের অবনতি ঘটতে শুরু করে। কলকাতায় বাংলা নাটক বা যাত্রার সূচনালগ্ন থেকেই বেনেপুতুলদের অস্তিত্ব বজায় ছিল। উল্লেখ্য হেরাসিম লেবেদেফের ২৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এ যে 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনীত হয়, তাতে মহিলা চরিত্রে মহিলারাই অভিনয় করেছিলেন। তবু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ অভিনেত্রীদের আবেদন কোনো অংশে কমেনি। এর কারণ দর্শকগণ তাঁদের অভিনয়ে অধিক বিনোদন পেত। নাট্যমঞ্চে বেনেপুতুলদের প্রয়োজন ফুরোলেও, যাত্রার আসরে তাঁদের অস্তিত্ব বহুদিন বজায় ছিল। এমন কয়েকজন বিখ্যাত বেনেপুতুলের নাম হল - ছবিরানী, নিতাইরানি, রাখালরানি, বাবলিরানি প্রভৃতি। একদিকে বেনেপুতুলদের অভিনয়, অন্যদিকে সমাজ নিন্দিত নারীদের অভিনয় -- দুটোই সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। কিন্তু থিয়েটারে পরে নারীদের আধিপত্য শুরু হল, এই তৃতীয় সত্তার মানুষজনকে ব্যবহার করা হত পার্শ্ব চরিত্র হিসাবে। মঞ্চে তাঁদের দেখা যেত নায়ক-নায়িকার সখা অথবা সখীরূপে। তাঁদের মূল চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করা সমাপ্ত হয়। আলাদা করে তাঁদেরকে নিয়ে কোনো নাটক, চলচ্চিত্র সেভাবে দেখা যায় না। অতএব যাত্রামঞ্চে, অপেরা কোম্পানিতে মহিলা শিল্পীদের আগমন ঘটলে বেনেপুতুলদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে শুরু করে। একমাত্র 'নট্রকোম্পানি'তে বেনেপুতুলদের অস্তিত্ব বজায় ছিল। এই দলের শেষ বেনেপুতুল ছিলেন চপলরানি। ১৯৭৬-৭৭ সাল নাগাদ তিনি অভিনয় থেকে অবসর নিলে, নট্টকোম্পানিও এই ঐতিহ্য ধরে রাখেনি। যাত্রামঞ্চে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বেনেপুতুল হিসেবে অভিনয় করে গিয়েছেন বিমলরানি (মুখোপাধ্যায়)। তাঁকেই সম্ভবত শেষ বেনেপুতুল বলা যেতে পারে। এভাবে পুরুষ অভিনেত্রীদের পদের অবনতি ঘটে ও পরে তা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

আধুনিককালে বিভিন্ন উপন্যাসের নাট্যরূপ যখন মঞ্চস্থ হয়, তখন তৃতীয় সত্তার মানুষজনের কাছে আরেকটি দরজা খুলে যায়। তবে এটা ভুললে চলবে না যে, তাঁরা কিন্তু মূল চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ আর সেভাবে পাচ্ছে না। কারণ উপন্যাসেও তাঁরা অপ্রধান চরিত্র। শুরুতে কিন্তু এই ব্যাপারটা ছিল না। নিজ সত্তায় না হলেও মূল নারী চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ ছিল তাঁদের। কিন্তু নারীদের আগমনে তাদের 'ডিমোশন' ঘটে। নারী চরিত্রে নারীর অভিনয় এটাই স্বাভাবিক। তাই খুব সহজেই তৃতীয় সত্তার পুরুষদের বাতিল করা যায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নারীদের অভিনয় শিল্পে আগমন ঘটেনি, ততক্ষণ তৃতীয় সত্তার পুরুষদের গুরুত্ব দেওয়া হত -- এক কথায় তাঁদের ব্যবহার কর হাত 'বিকল্প' হিসাবে। তৎকালীন সময়ে অভিনয় ক্ষেত্রে তাঁদের নিয়োগ করা হলেও, এই বিকল্প মানুষদের নিয়ে তথা তাদের জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার গল্প নিয়ে

কখনো নাটক, যাত্রা লেখা হত না। একুশ শতকে ৩৭৭ ধারা লোপ পাওয়ার পর তৃতীয় সত্তার মানুষদের প্রতি হঠাৎ করে মূলস্রোতের মানুষজনের আগ্রহ বাড়তে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুরু হয় বিভিন্ন গবেষণা। বহু নাটক, চলচ্চিত্রে তাঁরা অভিনয়ের সুযোগ পেতে শুরু করে। কিছু নাটক তো সরাসরি তাঁদের জীবন নিয়েই নির্মাণ করা হয়। তাঁদের অপ্রাপ্তি, সুখ-দুঃখের কাহিনি নাটকের মূল বিষয় রূপে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকগুলোর বেশিরভাগ মঞ্চস্থ হয়েছিল, সবগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় একাধিক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হল --'অন্তরীণ' নাট্যকার ও নির্দেশক রাকেশ ঘোষ, ব্রাত্য বসু রচিত 'কৃষ্ণগহ্বর', শেখর সমাদ্দার রচিত 'রমনীমোহন', 'সুন্দর বিবির পালা', রাকেশ ঘোষের 'উপল ভাদুড়ী'। যে সকল নাট্যকারের কল্যাণে বাংলা নাটকের মূল চরিত্রে ও বিষয়ে তৃতীয় সত্তার আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন -- (১) ব্রাত্য বসু, (২) শেখর সমাদ্দার, (৩) মনোজ মিত্র (৪) রাকেশ ঘোষ। এছাড়াও আরো অনেকে নাটক লিখেছেন এবং মঞ্চস্থ করেছেন।

নাটকের মূল বিষয় রূপে তৃতীয় সত্তার উপস্থাপন ঃ-

(১) **অন্তরীণ** ঃ নাটকটির রচয়িতা রাকেশ ঘোষ। ২০০১ সালে দমদম শব্দমুগ্ধ নাট্যকেন্দ্রে 'অন্তরীণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে হাওড়ার শরৎসদনে। নাটটির বিষয়বস্তুতে পুরুষ সমকামিতার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। প্রধান চরিত্র অনীত সমকামী। তার সঙ্গী নাম সাজিদ। অনীত ও সাজিদের সম্পর্ক যথারীতি তাদের পরিবার, সমাজ কেউ মেনে নিতে চায়নি। তবু অনীত পরাজয় স্বীকার করতে নারাজ। বন্ধুবর্গ থেকে আত্মীয় পরিজন, ছাত্রছাত্রী সকলে দূরে সরে যেতে থাকে।

অনীতের অপর একটি সমকামী বন্ধু ছিল মুকুল। মুকুল অনীত-সাজিদের মতো সমমনস্ক পুরুষ। মুকুল ভালোবাসতে অন্য একজন পুরুষকে। তবে অনীতের মতো মনের জোর মুকুলের মধ্যে ছিল না। অনীতকে তার পারিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখে মুকুল বিচলিত হয়ে পড়ে। সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। অনীতের সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও সে আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু মুকুল অনীতের পরিণতি দেখে ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ে। কোনো পথ বা উপায় না পেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

(২) **উপল ভাদুড়ী** ঃ 'উপল ভাদুড়ী' নাটকের বিষয়বস্তু হল বিখ্যাত অভিনেতা শ্রী চপল ভাদুড়ীর জীবনকাহিনি। দমদম শব্দমুগ্ধ নাট্যকেন্দ্র তাঁরই জীবনকথার উপরে নির্ভর করে উপস্থাপনা করেছে এই নাটক। রাকেশ ঘোষ পরিচালিত 'উপল ভাদুড়ী' -- টেল অফ আ ডেড স্টার' মনের মধ্যে দোলা দিয়ে যায়। নাটক বা যাত্রাপালায় চপল ভাদুড়ী নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশ ছোঁয়া। এরপর বাঙালি মহিলারা সামাজিক বাধা পেরিয়ে অভিনয় শিল্পে পা রাখে। এর ফলে চপল ভাদুড়ীর মতো বেনেপুতুলদের চাহিদা কমে, উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। যদিও চপল ভাদুড়ীর কাছে অভিনয়ের অর্থ কেবলমাত্র টাকা উপার্জন নয়। আরও বেশি কিছু। 'উপল ভাদুড়ী' নাটকে তাঁর জীবনের সব অংশকে ঠিকঠাক তুলে ধরা বেশ কঠিন। সাধারণত তৃতীয় সত্তার কোনো মানুষের যৌনসত্তা বিষয়ে নারী ও পুরুষের যত আগ্রহ বেশি থাকে। রাকেশ ঘোষ এই নাটকে চপল ভাদুড়ীর সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের নানাবিধ কৌতুহলকে দূরে রেখে তুলে ধরেছেন চপলরানীর শিল্পসত্ত্বাকে -- তাঁর নারীসত্তাকে অর্থাৎ পুরুষের শরীরে নারীর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন সুন্দরভাবে। কিন্তু সেই নারীসত্তা পুরুষকে ভালোবেসে আঘাত পায়, প্রত্যাখ্যাত হয়। একদিকে শিল্পী হিসেবে সম্মান অর্জন করেন, অন্যদিকে চরম হতাশায় নিমজ্জিত হন — এই হল তাঁর ট্র্যাজেডি। পাঠক তা অনুভব করতে পারেন এই নাটক দেখে।

এই নাটকে প্রধান চরিত্রে স্বয়ং চপল ভাদুড়ী এবং তাঁর পাশাপাশি রঞ্জন বোস অভিনয় করেছেন। নাট্যকার যেন দর্শকের বাংলা থিয়েটারের সেই ফেলে আসা সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। অভিনয় শৈলী বাংলার ইতিহ্যবাহী যাত্রা পালার মতো। অভিজিৎ আচার্যর প্রাণবন্ত ও প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতের প্রয়োগ নাটকটিকে আলাদা মর্যাদা দান করেছে বাবুলু সরকারের আলোক ভাবনা, অতনু সরকারের সিনোগ্রাফি, এইসব কিছুর যথাযথ উপস্থাপন নাটকটিকে পরিপূর্ণতা দান করে। নাটকটিতে মেলোড্রামার ধারা অনুসৃত হলেও তার পরিবেশনা আধুনিক।

এটি যেহেতু জীবনকথা, তাই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্টেজ-উপযোগী করে উপস্থাপন করা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এই নাটক নিঃসন্দেহে সফল। যদিও শেষ দিকে কাহিনির গতি হঠাৎ বেড়ে যায়। মূল চরিত্র উপল ভাদুড়ী হল হারিয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধ অভিনেতা। তারই স্মৃতির রাস্তা ধরে নাটকের ফ্ল্যাশব্যাকে এগিয়ে যাওয়া। তার অভিনয় জীবনের শুরু হয় মায়ের হাত ধরে। উপল বলে, তার অভিনয়ের প্রেরণা তার মা আভা দেবী। মায়ের মতো গলার জন্য তাকে কণ্ঠস্বর বদলাতে বলা হয়। নিজের সত্তাকে, শিল্পীর ভিতরকার অভিনেতাকে পাল্টে ফেলা মোটেই সহজ কথা নয়। সেই আভা দেবীর উপস্থিতি যেন এ নাটকে

উপলেরই অন্তর্মনের রূপক। অন্য রকম হওয়া তো সমাজ সহজে মেনে নেয় না। যারা অন্য রকম তাদের ঠেলে দেওয়া হয় কোণে -- করে দেওয়া হয় প্রান্তিক। তাঁর গলার স্বরে এবং স্বভাবে নারীসূলভ হয়েও যাত্রার শ্রেষ্ঠ নায়িকা 'উপলরানি' হয়ে ওঠার পথ মসৃণ ছিল না মোটেই। তার পর সেই 'রানি থেকে সাফল্যের সোপানে ওঠার স্মৃতিচারণার উপস্থাপনা এক কথায় অপূর্ব।

সবশেষে উল্লেখ করতেই হয় সখীদের কথা। যাত্রাপালায় সখীর দল বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই নাটকের নাচের অংশে তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। দলগত নাচ এ নাটকের এক অনন্য সম্পদ।

(৩) **কৃষ্ণগহ্বর** ঃ কৃষ্ণগহ্বর অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে 'Black hole' - সেখানে তলিয়ে যায় সবকিছু। খানিকটা মৃত্যুর মতো হলেও মৃত্যুর পরেও মৃতব্যক্তির স্মৃতি থেকে যায়। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অবসাদের স্তর জমতে জমতে ঠিক যে সময় মনে হয় চারপাশটা আর বেঁচে থাকার যোগ্য নয়, যখন মনে হয় এই মরা-পচা গ্রহতে নয়, অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে যদি নতুন করে বাঁচার রসদ খুঁজে পাওয়া যেত, তখন আত্মহত্যার তথা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার বাসনা জাগে। ঠিক যেমন করে বরফ ঠান্ডা শীতল জল আর ব্লেড নিয়ে অংশুমান বাঁচা-না বাঁচার মাঝখানে অস্পষ্ট হয়েছিল। অংশুমান ব্যানার্জি, 'কৃষ্ণগহ্বর' (ব্রাত্য বসু রচিত) নাটকের মূল চরিত্র -- একজন ব্যর্থ চিত্রশিল্পী। অংশুমানের জীবনের গতি প্রায় মধ্য গগনে পৌঁছে গিয়েছে। নিজের সংসারে তার 'সং' সেজে থাকাই সারকথা, কারণ উপার্জনে অক্ষম স্বামীর আশায় না থেকে স্ত্রী জয়তী নিজের চাকরি ও সঙ্গী (রঙ্গন) - দুটোই খুঁজে নিয়েছে ।নাটকের অন্দরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, জয়তী অংশুমানের দাম্পত্যের লেশ মাত্র নেই। অংশুমান অবসাদে নিমজ্জিত হতে হতে একদিন নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে সমকামী অস্তিত্বকে। এটাকে মনের বিকার আশঙ্কা করে অংশুমান পৌঁছে যায় মনোচিকিৎসকের কাছে। যদিও শৈশবে সে নিজের মধ্যে পুরুষের প্রতি এমন আকর্ষণ লক্ষ করেনি। ডাক্তারকে সে বলেছে মাসকয়েক ধরে তার মধ্যে এই অনুভূতি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ডাক্তার জয়ন্ত ঘোষ তাকে চিকিৎসার চেষ্টা করেন কিন্তু লাভ হয়নি শেষ পর্যন্ত।

গোধুলির অস্তগামী সূর্য্যের মতো অংশমানের জীবনে একদিন রাহুলের আবির্ভাব ঘটে। জয়তীর ছাত্র রাহুল। সে কেমিস্ট্রি পড়তে যেত জয়তীর কাছে। সেই সূত্রে আলাপ হয় রাহুল ও অংশুমানের। রাহুল সমকামী --- এক্ষেত্রে রাহুল কিন্তু অংশুমানের মতো ততটা চিন্তিত নয়। অংশুমান যেন নিজের যৌবনকে পুররায় খুঁজে পায় রাহুলের দেহের প্রতিটি ভাঁজে। অংশুমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় তার। অবসাদের গহ্বর থেকে যেন উদ্ধারের পথ পায় অংশুমান। যদিও রাহুলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সাময়িক। অংশুমানের চরম হতাশার জীবনে রাহুল যেন এক টুকরো খোলা আকাশের মতো। অংশমান সেখানে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে চায়। কিন্তু তার সব ভুল ভেঙ্গে যায় কিছুদিন পর। অংশুমান কলকাতা ছেড়ে দিল্লি যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যায় নিজের মূল সঙ্গী তন্ময়কে। অংশুমান যে তিমিরে ছিল সেখানে আবার নিমজ্জিত হতে থাকে। এককথায় বলতে গেলে রাহুল তার সঙ্গে বঞ্চনা করে। রাহুল তা স্বীকার করে--

''কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে তো বিষয়টা তা নয় -- আমি আপনাকে
প্রোভোক করেছিলাম, আপনি ন্যাচারালি আমাকে বুঝতে
পারেননি ... আপনার একাকিত্ব আপনাকে আমার সঙ্গে
সম্পকটা তৈরি করতে বাধ্য করেছিল।[১]

এমন সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য রাহুল দিল্লি যাওয়ার আগে অংশমানকে চরম অপমান করে যায়। অথচ পরে অনুপপ্ত হয়ে সে চিঠি লেখে অংশুমানকে, নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়। ধীরে ধীরে অংশুমানের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। এতদিন অংশুমানের সমলৈঙ্গিক কথা তার স্ত্রী তথা পরিবার জানত না। কিন্তু অংশুমানের মেয়ে বৌ সহ বাকিরাও কম বেশী অংশুমান ও রাহুলকে পথে, পার্কের ধারে দেখেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাহুলের চিঠিটা এসে পড়ে জয়তীর হাতে। জয়তী, যে নিজে একজনের স্ত্রী হয়েও পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, সেই জয়তী তার স্বামী অংশুমানের মধ্যে সমকামের অস্তিত্ব টের পেয়ে (রাহুলের চিঠি পড়ে) তাকে ধিক্কার জানাতে পিছপা হয় না --

''তুমি আর মানুষ নেই অংশমান ---তুমি একট জন্তু হয়ে গেছ।'

প্রথম থেকেই অংশুমান নিজের সংসারে ব্রাত্য গোছের। একাকিত্ব তাকে গ্রাস করেছিল বহুদিন আগেই। মাঝখানে এ যেন এক অদ্ভুত বিপর্যয়। এর ফলে তার আত্মহননের পথ আরো প্রশস্ত হল।

নাটকটি পরিশেষে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে আসে —

- শেষ পর্যন্ত কি অংশুমান মারা গেল?
- জয়তী নিজে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তবে অংশুমান ও রাহুলের সম্পর্কের কথা জেনে তার সমস্যা হল কেন? সে সম্পর্ক যদি সমকামের না হত, তাহলে কী জয়তী সেটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতো?
- সমকামী অস্তিত্বের কথা এত বেশী বয়সে এসে অংশুমান কিভাবে টের পেল? সাধারনত বয়ঃসন্ধ্যিকালের মধ্যেই তা প্রকাশ পাওয়ার কথা।

এ ধরণের প্রশ্ন ছাড়াও নাটকটিতে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ করা গেছে। 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাদল সরকার রচিত 'বাকি ইতিহাস' নাটকের খানিকটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ দুটি নাটকের বিষয়বস্তুতে ভিন্নধারার যৌনচেতনা গুরুত্ব পেয়েছে -- 'কৃষ্ণগহ্বরে' সমকাম, 'বাকি ইতিহাসে' শিশুকাম। 'বাকি ইতিহাসে' শরদিন্দুর লেখা গল্পের সীতানাথ চক্রবর্তী, পার্বতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। নিজের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় লুকোতে ফিরে আসে চম্বলগড় থেকে। ছাত্র আশোক সান্যালকে নবোকভের 'ললিটা' পড়ার অপরাধে স্কুল থেকে বহিস্কার করে। অথচ তার নিজের অন্তরে ঐ একই বিকার বজায় ছিল। এই ধরণটা 'কৃষ্ণগহ্বর'র অংশুমানের স্ত্রী জয়তীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অংশুমান সমকামী হওয়ায় সরাসরি মনোচিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে পেরেছে, কিন্তু সীতানাথ বন্ধু বিজয়ের দ্বারস্থ হয়েছে। 'বাকি ইতিহাস' বিজয়ের ভূমিকা অনেকাংশেই মনোচিকিৎসক তুল্য। সীতানাথ শিশুকামিতা সম্বন্ধে নিজেকে জাস্টিফাই করতে বিজয় বলেছে -- 'ললিটা'র তুলনায় 'লেডি চ্যাটর্লিস লাভার' পড়া তুলনামূলকভাবে কম অপরাধের। এদিকে অংশুমান মনোচিকিৎসক জয়ন্ত ঘোষের সঙ্গে রাহুল তথা সমকামতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অস্কার ওয়াইল্ডের ' পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছে। রাহুলকে বলেছে 'ডোরিয়ান'। আট বছরের গৌরিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়ে সীতানাথ নিজেই নিজেকে শাস্তি দিতে চেয়ে আত্মহত্যা করেছে। কারণ সীতানাথ প্রকাশ করতে না পারলেও, নিজের মধ্যে শিশুকামী প্রবৃত্তির টের পেয়েছিল। অংশুমান সমকামী হয়ে নিজেকে অপরাধী মনে করে। ডাক্তার জয়ন্ত ঘোষ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে -

> ''... কে আপনাকে বলেছে হোমোসেক্সুয়ালিটি বিষয়টা
> অ্যাবনর্মাল? পৃথিবীতে বহু বিখ্যাত মানুষ হোমোসেক্সুয়াল।''[৩]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অংশুমান নিজের মানসিক চাপ, অপরাধবোধ ও রাহুলকে না পেয়ে আত্মহননের পথে এগোয়। সীতানাথ ও অংশুমান দুজনেই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

(৪) **ছায়ার প্রাসাদঃ**

মনোজ মিত্রের 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের দেশ; শারদীয় সংখ্যায়। এই নাটকের দ্বৈপায়ন ঠাকুর জাতে ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণের মর্যাদা সে পায় না। দ্বৈপায়ন আসলে শ্মশান ঠাকুর কিংবা বলা ভালো শ্মশান কুড়ানো ঠাকুর। শ্মশানের খড়কুটো কুড়িয়ে দ্বৈপায়ন জীবনধারণ করে। তার পরিবার নেই, কিন্তু আপনজন আছে দুটি -- একটি গরু (নাম ভোলা, যাকে দ্বৈপায়ন নিজের পুত্রসন্তান ভাবে), দ্বিতীয়জন সুভদ্রাঙ্গী। সুভদ্রাঙ্গী 'পিশাচিনী' অপবাদে সমাজ বহিস্কৃত। দ্বৈপায়ণ তাকে নিজের কন্যা বলে। নাটকের মূল চরিত্র রূপে দ্বৈপায়ন উল্লেখযোগ্য নয়, তবে তৃতীয় সত্তার রূপে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাটকের পার্শ্ব চরিত্র হিসাবে তার উপস্থাপনা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বৈপায়ন একই দেহে পুরুষ ও নারী। নাট্যকার তার সম্বন্ধে বলেছেন --

> '' মানুষটি স্বাভাবিক নয়। বিধাতার খেয়ালে এক দেহে
> সে নারী ও পুরুষ। বসনভূষণ চলন বলন কেশবন্ধন
> সে মাহিলার মতো, আবার ভাঙাচোরা মুখমণ্ডলের
> এখানে ওখানে গোঁফদাড়ির ফলনে হঠাৎ পৌরুষ।''[৪]

এটাও তার প্রকৃত ব্রাহ্মণের মর্যাদা না পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ। নাটকে দ্বৈপায়ন কথা খুব বেশি নেই। চন্দনা গাঁ থেকে পালিয়ে আসে দ্বৈপায়ন। তার কন্যা সুভদ্রাঙ্গী জন্য পাটলিপুত্রে গিয়ে সম্রাট বিন্দুসারের কাছে সে নালিশ জানাতে চায়। অনেক চেষ্টায় সফল হয় সে। তাকে চন্দনা গাঁয়ে ফিরে যেতে আদেশ দিলেও, পরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তার ছেলে ভোলা (গোরু) ও সুভদ্রাঙ্গীকে রেখে দেয় সম্রাট। দ্বৈপায়ন তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে জানতে পারে ভোলা মৃত এবং সুভদ্রাঙ্গীকে সম্রাট ভোগ করে তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। দাসীর সন্তানের ঠাঁই হবে না রাজপ্রাসাদে। বিন্দুসার দ্বৈপায়নকে বলে এই সন্তানকে নিয়ে যেতে। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গী বাধা দেয়, তার সন্তানকে নিয়ে সম্রাটের সামনে থেকে যেতে চেয়ে দ্বৈপায়নকে ফিরে যেতে বলে।

দ্বৈপায়নের ব্যক্তিগত জীবনের কথা নাটকে নেই বললেই চলে। দ্বৈপায়ন অত্যাধিক সহানুভূতিশীল ও আবেগপ্রবণ। পর আপন করে নেওয়া তার বৈশিষ্ট্য। অপরের সুখে সে আনন্দ পায়, অপরের কান্নায় তার প্রাণ ফাটে। নিজের জন্য আলাদা করে তার কোনো ভাবনা নেই। গাছের তেষ্টা মেটাতে সে কলসি ঢেলে জল দেয়, গোরুকে নিজের ছেলে বলে, শুকতারাকে বোন বলে ডাকে। প্রকৃতপক্ষে দ্বৈপায়ন ঠাকুর তৃতীয় সত্ত্বার মানুষ। নারী ও পুরুষের মিলিত সত্ত্বা তার মধ্যে বর্তমান। তাই তার মধ্যে মমতার পরিমাণ অনেক বেশি, যা সাধারনত পুরুষের স্বাভাববিরুদ্ধ। নাট্যকার তৃতীয় সত্ত্বার চরিত্র রূপে দ্বৈপায়নকে এই নাটকে উপস্থাপিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু এই চরিত্রকে তেমন গুরুত্ব দান করেননি। মূল বিষয়বস্তুতে সুভদ্রাঙ্গীর পাতানো 'বাবা'হয়ে থাকা ব্যতীত দ্বৈপায়ন চরিত্রের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। স্বভাব বৈশিষ্ঠ্য দ্বৈপায়নকে আকর্ষণীয় মনে হলেও বরাবরের মতো দ্বৈপায়ন ঠাকুরও পার্শ্ব চরিত্র হিসাবে ব্রাত্য থেকে গেছে নাটকে।

(৫) **সুন্দরবিবির পালা** ঃ

অধ্যাপক নাট্যকার শেখর সমাদ্দারের, 'সুন্দরবিবির পালা' নাটকটি প্রকাশিত হয় ৫ই আগস্ট ২০১৮ সালে। আকাডেমি অব ফাইন আর্টসে 'আভাষ'-এর প্রযোজনায় ৫ই আগস্ট ২০১১-তে এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। বিখ্যাত অভিনেতা চপল ভাদুড়ী এই নাটকে সুন্দর হালদার চরিত্রে অভিনয় করেন এবং শেখর সমাদ্দারকে অনিকেত রায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। নাটকে সুন্দর হালদার অভিনয়কে জীবনের সার মনে করে। তাঁর পিতামহ পরমানন্দ হালদার ছিলেন যাত্রাদলের পুরুষ অভিনেত্রী। সুন্দর তাঁকে অনুসরণ করে পোশাক পরে। কিন্তু তার পরিবার তা মেনে নেয়নি। এর জন্য মা ও বাবার কাছে সে মার খায়। এরপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সুন্দর। ভূষণা হিজড়ে তাকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু পরে সে সুন্দরকে বলে হিজড়াদের ডেরা থেকে চলে যেতে। থাকলে নিজের শরীর বিক্রির পথে এগোতে হতে পারে। ভূষণা তাকে নাচ, গান শিখতে বলে --

> ''তাহলে আমি তোর একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। পারবি শিখতে?''[৫]

তারপর থেকে সুন্দরের জীবনের মূল অধ্যায় শুরু হয়। সুন্দর অভিনয় শুরু করে নারীর বেশে। ধীরে ধীরে সে সুন্দর হালদার থেকে সুন্দরবিবি হয়ে ওঠে। বহু ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও জমিদারদের লালসার হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করে। অভিনয় তার কাছে পূর্জাচনার মতো। সেখানে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের দিকে যারা এগিয়ে যায়, তাদের সুন্দরবিবি ঘৃণা করে। সুন্দরবিবি বলে --

> ''আমি তো শিল্পের জন্য নিজেকে নিবেদন করেছি
> টাকা ও পুরুষের বিকৃত কামনার জন্য নয়।''[৬]

তাই অনিকেতের নাটকে সরস্বতীকে কাস্ট করা হলে, সুন্দর তার সঙ্গে অভিনয় করতে চায় না। সরস্বতীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। সরস্বতী তাকে অপমান করে --

> ''ওই হিজড়াটা। বল্যে কিনা আমার সঙ্গে কাজ কইরবে না''[৭]

সুন্দরবিবি ও সরস্বতী -- এই দুজন প্রান্তিক মানুষের জীবনসত্যকে নাট্যকার এই অংশে তুলে ধরেছেন। একজন টিকে থাকতে অভিনয়কে আঁকড়ে ধরে, দ্বিতীয়জন নিজের দেহের বিনিময় দিনগুজরান করে। সুন্দরবিবি পরে বোঝে তারা হয়তো একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সরস্বতীর কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

সুন্দর হালদার বিয়ে করেছিল একজনকে। তার স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করে মারা যায়। এসব অনেক আগের কথা। সুন্দরের ছেলেটি এখন কানপুরে চাকরি করে, বিবাহিত। সুন্দর মনে করে তার ছেলে নবীন তাকে পিতা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায়।

''নবীন, নবীনচন্দ্র হালদার। বাপের নামটা
এফিডেবিট করে পালটে নিয়েছে কিনা জানিনা।''[৮]

যদিও তাতে সুন্দরের তেমন গুরুত্ব নেই। সে নিজেই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না।

নাটকটি এরপর অন্যদিকে মোড় নেয়। অনিকেত সুন্দরকে চিনেছিল -- তার শিল্পী সত্ত্বাকে সঠিকভাবে চিনেছিল। কিন্তু সুনন্দা অনিকেতের সবটা ধ্বংস করে দেয়। তার দলের অভিনেতা সুন্দর হালদারকে কিনে নিতে চায়, তার জন্য রুচিরাকে হাত করে, টাকার লোভ দেখায়। সুন্দরবিবিকে লুকিয়ে রাখার অভিযোগে অনিকেতকে এমনভাবে ফাঁসায় যে সে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং আত্মহত্যা করে। অভিনয়ের জন্যই বেঁচে থাকতে চায়--

''আমি ফিরে এলাম, হ্যাঁগো আমি ফিরে এলাম।
এতদিন গায়ের জোরে সে সত্য আমি অস্বীকার
করেছি, অনিকেতের আঘাতে সে সহসা জেগে
উঠলো আমার ভিতরে ... অনিকেতের জহুরির
চোখ তাই চিনেছিল। এই সুন্দর হালদার ?

কতটুকু দাম তার ?''[৯]

তৃতীয় সত্ত্বাই তার প্রকৃত পরিচয়। এখানেই সুন্দরবিবির আত্মদর্শন হয় ও নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শেখর সমাদ্দার তৃতীয় সত্ত্বার চরিত্র নিয়ে আরো একটি নাটক লিখেছেন - 'রমনীমোহন'। এছাড়া আরো অনেক এই বিষয়ে নাটক লিখেছেন। তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল -- অনীক ঘোষের 'অর্ধেক আকাশ', রাকেশ ঘোষের 'ঋতুপর্ণ ঘোষ', 'মায়ামৃদঙ্গ' (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের নাট্যরূপ), 'স্যাফো চিত্রাঙ্গদা', পিয়ালী চট্টোপাধ্যায়ের 'একটি (অ) সামাজিক প্রেমের গল্প'। স্বল্প পরিসরের কারণে এগুলোর আলোচনা এখানে বাদ থাকলো।

উপসংহার ঃ

এতক্ষণ যে নাটকগুলো বিশ্লেষণ করা হল, তাতে তৃতীয় সত্তার দুটি প্রকার পাওয়া গেছে -- পুরুষ সমকামী চরিত্র ও তৃতীয় সত্তার চরিত্র। Third gender একটা চাঁদোয়া শব্দ। এর মধ্যে পুরুষ সমকামী, নারী সমকামী, উভকামী প্রভৃতি বিভাজন বর্তমান। আলোচিত নাটকগুলোতে এই সবক'টি প্রকৃতির চরিত্রদের দেখা পাওয়া যায়নি। একদিকে 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকে অংশুমান, রাহুল, তন্ময় এবং 'অন্তরীণ' নাটকে অনীত, সাজিদ ও মুকুল যেমন পুরুষ সমকামী সত্তার প্রতিনিধিত্ব করেছে, অন্যদিকে 'সুন্দরবিবির পালা'র সুন্দর হালদার, 'ছায়ার প্রাসাদে'র দ্বৈপায়ন, 'উপল ভাদুড়ী' নাটকের উপল সরাসরি তৃতীয় সত্তার চরিত্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এতদিন বাংলা নাটকে তৃতীয় সত্তার মানুষদের ভিন্ন সত্তার পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতে হত। কিন্তু প্রধান তথা 'লিড রোলে' তৃতীয় সত্তার চরিত্র নাটকে সরাসরি উপস্থাপনের ফলে যে ভালো দিকগুলো ঘটলো নাটকের বিষয়বস্তুতে ভিন্নধারার সূত্রপাত ঘটে, দর্শক নাট্যমঞ্চে ভিন্ন ধরণের অভিনয় দেখার সুযোগ পায় এবং সর্বোপরি নারী ও পুরুষ ব্যতীত তৃতীয় সত্তার ব্যক্তিগণ যে নাটকের মূল চরিত্র হাতে পারেন ও অভিনয়ের গুণে দর্শকের দ্বারা সমাদৃত হতে পারেন তা প্রমাণিত হল।

সূত্র-সংকেত ঃ

১. বসু ব্রাত্য, কৃষ্ণগহ্বর - নাটকে সমগ্র ২, আনন্দ পাবলির্শাস কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - মে, ২০১০, পৃষ্ঠা - ১৯৫

২. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৬

৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৪

৪. মিত্র মনোজ, ছায়ার প্রাসাদ - নাটকসমগ্র চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলির্শাস কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - কার্তিক ১৪১০, পৃষ্ঠা - ১০৯

৫. সমাদ্দার শেখর, সুন্দরবিবির পালা, কলকাতা, লালমাটি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ৫ই আগস্ট ২০১১, পৃষ্ঠা - ৬২

৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৩

৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৪

৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৪

৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৬

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. বসু ব্রাত্য, কৃষ্ণগহ্বর - নাটক সমগ্র, ২, আনন্দ পাবলির্শাস কলকাতা, প্রথম সংস্করণ মে ২০১০।

২. মিত্র মনোজ, ছায়ার প্রাসাদ - নাট্যসমগ্র চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৪১০

৩. সমাদ্দার শেখর, সুন্দরবিবির পালা, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ৫ই আগস্ট ২০১১

৪. ভট্টাচার্য শ্রীআশুতোষ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৮৫২-১৯০০) প্রথম খণ্ড এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৩৬৭ (১৯৬০)

৫. ভট্টাচার্য শ্রীআশুতোষ, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৯০০-১৯৬০) - দ্বিতীয় খণ্ড, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - পৌষ ১৯৬৭ (১৯৬০)

৬. ঘোষ অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৩৬২

৭. ঘোষ গৌরাঙ্গপ্রসাদ, ৩০০ বছরের যাত্রা শিল্পের ইতিহাস, পুষ্প কালকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

পত্র-পত্রিকা ঃ

১. স্বীকৃতি পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, কলকাতা, দমদম স্বীকৃতি সোসাইটি, কলকাতা বইমেলা, ২০০৫।

২. স্বীকৃতি পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, কলকাতা, দমদম স্বীকৃতি সোসাইটি, কলকাতা বইমেলা, ২০০৮।

৩. স্বীকৃতি পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, কলকাতা, দমদম স্বীকৃতি সোসাইটি, কলকাতা বইমেলা, ২০১১।

ইন্টারনেট-সূত্র ঃ

১. https://www.anandabazar.com/amp/editorial/letters-to-the-editor-1.662818

2. https://umbangla.typepad.com/um_bangla/page/14/

3. https://www.anandabazar.com/amp/patrika/theatre-review/cid/1272955

4. http://www.kolkataprimetime.com/newsDetails/dumdum-sobdomugdho_9258

5. https://www.kaahon.com/theatre/upal-bhaduri-a-successful-documentary-theatre-both-in-craft-and-emotions/

6. https://m.sangbadpratidin.in/article/sappho-chitrangadaa-review-a-unique-tale-by-dumdum-shabdomugdho/533949

7. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6

8. %AA#:~:text=%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%20%E0%

9. A6%B9%E0%A6%B2%20%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8

10. 7%E0%A6%B0%20%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0

11. 7%81%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%BE%20%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2

12.E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93%20%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A5%A4

- https://sahomon.com/welcome/singlepost/alkaap
- https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/ratul_shah/29699718
- https://www.google.com/amp/s/www.anandabazar.com/amp/patrika/some-unknown-stories-of actor-chapal-bhaduri-1.653120
- https://www.google.com/amp/s/www.anandabazar.com/amp/entertainment/chapal-bhaduri will-reappear-on-stage-for-drama-ordhek-akash-dgtl/cid/1339777
- https://www.google.com/amp/s/m.sangbadpratidin.in/v/s/m.sangbadpratidin.in/article/new-bengali drama-of-curtain-call-brings-the-problems-of-third-gender-o stage/714233%3famp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%253D%253D#ampf=

Section III

A Brief Survey on Quantum Computing Tools

Tamal Deb[1], Deeptanu Sen[1], and Jyotsna Kumar Mandal[2]

[Abstract : *The term Quantum Computing (QC) has emerged with lots of promises specifically with respect to the hard and complex computational problems in recent years. Quantum computing already shown its supreme capability and achieved several milestones by generating solutions in various domains such as material science, bio-science, finance etc. A systematic survey is conducted over the a few but well-practiced quantum platforms for quantum application and research in this paper. The characteristics, the technique of the simulation at various level of the quantum platform like IBM Qiskit, Google Cirq etc. are discussed with respect to current scenario of advantages and disadvantages. This paper also tried to explain the applicability as well as the present day challenges of different quantum tools.*

Keywords: *Qubit, qiskit, cirq, QDK***]**

1. Introduction

The concept of the Quantum Computing (QC) has emerged form the core concept of the Quantum Mechanics[1]. But, after studying the QC to some extent, it comes into the picture that the foundation of the QC has strengthened by the intersecting knowledge of some other important domains like Mathematics, Physics, Information Theory, Computer Science etc. In the course of last few years, the QC has proven its undisputed capability in terms of problem solving in different fields of computation and QC also has proven that it is exponentially powerful than the Classical Computing. Another remarkable finding has surfaced that QC can smoothly handle and solve a class of problems for which it is unimaginable to think about the solution in a Classical way.

It is a known fact that a computing machine processes information. The form of the information may vary from machine to machine. In the case of QC it processes the Quantum information in the form of Quantum-Bit or Qubit[9] which is actually the physical carrier of the Quantum information[24]. Qubit can the thought of as the Quantum version of the Classical Bit and to describe the Quantum state of a Qubit the symbols $|0\rangle$ and $|1\rangle$ is used[9]. The basic but the major difference of a Classical Bit and Quantum Bit is: the Classical Bit can represent on two states either 0 or 1 whereas the Quantum Bit can be in 0 or 1 or in any super position of 0 and 1. Hence, a 2D-column vector of real or complex number, whose norm is 1, such vector can represent the Quantum state of a Qubit. Hence, for any two complex number α,β the vector α/β can represent the state of a Qubit where $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$. Another important property of Quantum

1. Tamal Dev, Assistant Professor, Dept. of Computer Science, Barasat College, Kolkata
1. Deeptanu Sen, UG student, Dept. of Computer Science, Barasat College, Kolkata
2. Jyotsna kumar Mandal, Professor, Dept of Computer Science & Engineering, University of Kalyani, West Bengal

Computation is *entanglement*[11]. The Quantum *entanglement* is such a state where two systems are so strongly correlated that knowing information about a system immediately generated knowledge about the other system even though the systems may be located far apart in the Universe. Moving down to the bit-level with this same concept of correlation it can be said that the change in state of one among the two *entangled* Qubits leads to the immediate change of state of the other Qubit. Due to this *entanglement*[7] property another two precious features are automatically get incorporated with any Quantum System, the first one is improved processing speed and the second one is *Quantum Teleportation*[12].

The motivation of this paper is to conduct a brief survey regarding the some well used Platforms[4] and Tools for QC which will lead the new researchers and users of the QC to direction of their goal and will help them selecting proper Platform and Tools of QC for their future work. The remaining part of this paper is organized with survey methodology at beginning, followed by description of QC platforms and then the well-practiced quantum tool kits. Finally, the paper ends with a brief discussion about the current state & challenges[2] of the QC and the future scope.

2. Survey Methodology

Firstly, the current topic of the survey is selected carefully and by clear analysis some *search phrases* are selected. After the selection of those *search phrases* logical *AND*($\wedge$),*OR*($\vee$) applied to form some *search strings* by conjunction and disjunction. The compound *search strings* are: "quantum $\wedge$ computing $\wedge$ survey", "quantum $\wedge$ tools $\wedge$ survey", "quantum $\wedge$ computing $\wedge$ tools $\wedge$ survey". After this, a systematic[1] review of literature has been started, which actually is a search process on the scientific databases that includes: i) Semantic Scholar,

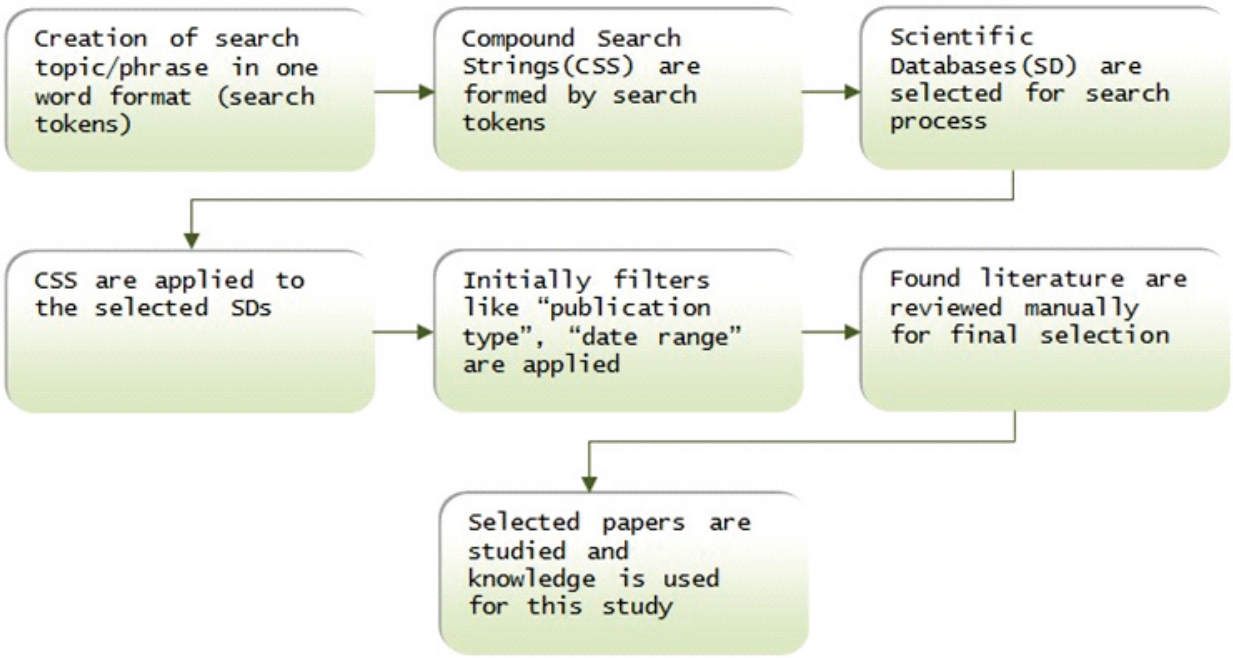

Figure 1: Literature Search Process

Even though the figure 1 is self-explanatory, the filtering process is described further here. In all the databases, filter *publication type* has been selected as "Journal $\vee$ Conference $\vee$ Book Chapter"; filter *date range* has been considered from "January,2020 to December,2023". In case

of Google Scholar an additional filter has been applied in the *title* as *allintitle:* "quantum tools" ∧ (intitle*:* "survey" ∨ *allintitle:* "systematic survey"). Similar compound search string "quantum tools survey" is applied at *title* and *abstract* in lens.org.

Table 1: Literature Search result in Scientific Database

Scientific Database	Found Literature	Manually Selected
Semantic Scholar	30	17
Google Scholar	14	8
Microsoft Academic	20	7
lens.org	27	9

3 Quantum Computing Platform

QC platform is a framework[5] of software which covers it's underlying hardware[4] components like a layer. These hardware components may be a classical circuitry or quantum circuitry[22] or a combination of both at the same time with interfacing each other. The software that builds the QC platforms[4] is open source in nature, but the business logic of some part of it is kept hidden from the general users. The basic and demanding property of such a platform is that it must be *light weight* so that can achieve the desired responsiveness. Since millions of requests hits these platforms in each single moment, the *responsiveness* property is a must for good service provider. Typically there exists two different layers for computation, the Classical part and the Quantum part, which are interfaced by a *Classical-Quantum Interface* and as whole these two counterpart creates the shell for the Quantum Platform as depicted in figure 2.

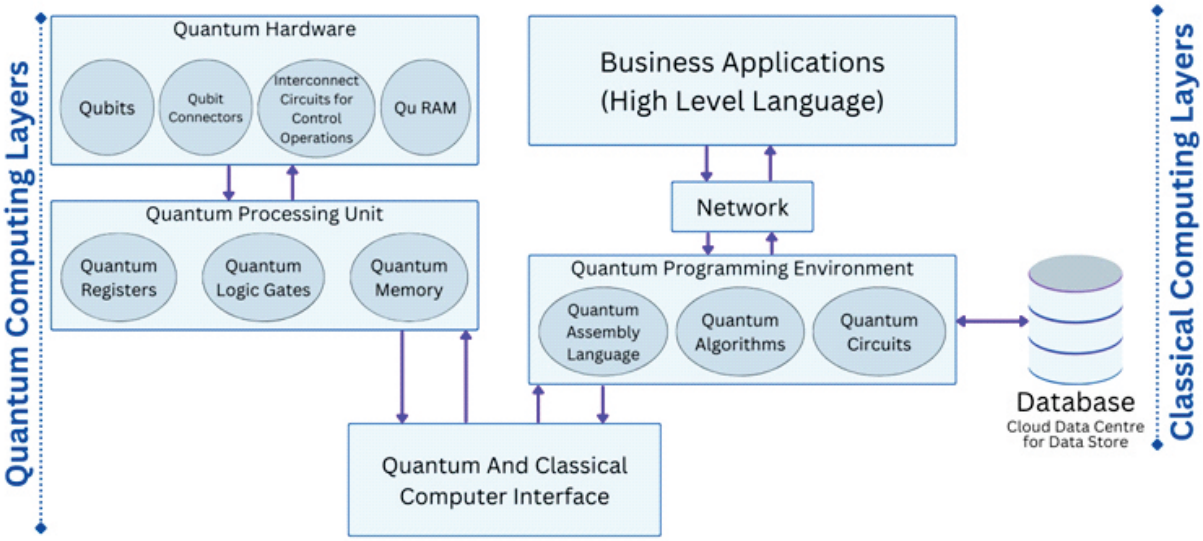

Figure 2: Quantum Platform

In the quantum portion the Qubits are encircled by loops of superconducting materials[17] for their proper functioning and there are Qubit connectors and Quantum Random Access Memory[20]. Interconnection circuit functions in a way so that all the control and computing

operations can be executed in desired way. Quantum Processing Unit(QPU)[16] is built with the collection of Quantum Registers, Quantum Logic Gates and some other operational memory. The Classical counterpart of these platforms basically provides a Quantum Programming Environment(QPE)[8] which includes the Quantum language[3] both in the form of assembly and high level. Another two major components of the QPE are the in-built Quantum logic in the form of Quantum algorithm and the Quantum circuitry.

Table 2: Inherent Nature of QC Platform

Inherent Nature	**Purpose**
Programming at Low-level	The QC platforms are based on low level programming language which include Quantum logic gates and the job is converted to sequence of such gates to form a set of instructions and submitted to the QPU
Heterogeneity	In terms of the hardware and software components[4] of the QC platforms, all of these available platforms now a days varies a lot from one another.
Non-Portability	The code snippet created to generated a solution to some problem in one QC platform is native to that platform only, this means, a generated solution in IBM Qiskit will be unable to execute in Google Cirq environment.
Remote Access	All of the available QC platforms offer the registered user to access and develop the needed solution remotely. User can execute code by selecting a QPU located in different geographical region through cloud.

In this QPE, the classical bits are mapped onto the Qubits, the states of the Qubits are got initialized. The applied Quantum algorithms are converted to sequenced of interconnected Quantum logic and then it is executed at Quantum circuit level. The output is measured and converted to the corresponding classical result which is in tern transferred to some business application that has initiated the input.

4. Quantum Platform and Tools

4.1 Google Cirq

Google Cirq is a framework for generating the solution by writing code snippets remotely for Noisy Intermediate Scale Quantum(NISQ)[10] devices. Since the NISQ are strongly constrained, the Cirq framework is developed in such a way that it poses enough knowledge to know about the architectural property. It is key difference between the Cirq and other QC framework, because the rest of them drawn a clear line between the abstract model and internal details of the device used. Cirq is an open source which includes a rich Python library that enable easy code creation. Figure 3 demonstrates the various tools and components that work as a single connected system to achieve the successful execution of a Quantum algorithm.

Table 3: Components of Google Cirq Framework

Components	Purpose
Research Library Tools	These tools and code library is utilized to generate new algorithms and test cases for the quantum devices
Open Fermion	A huge library of already generated algorithms and is used to create quantum simulation algorithms.

Continuation of Table 3

TensorFlow Quantum	An open-source library of algorithm for machine and deep learning. The existing algorithms can be manipulated, merged, tuned to generated newer ones.
ReCirq	A growing repository of ongoing experiments, well documented tutorials and ready-to-use tools to create new quantum experiments.
Pennylane	A very innovative open-source library for machine learning in quantum domain in collaboration with some other framework such as TensorFlow, PyTorch etc.
Cirq	Cirq is widely used by end users because it is the framework for programming in NISQ devices.
Quantum Circuit Simulators	This simulators component maintains compatibility with several other quantum circuit simulator and the circuits creation and simulation with this utility can done in distributed on in standalone fashion,i.e. locally[5].
Cloud Services[23]	This facility enables the Cirq to connect with several other quantum services.

4.2 IBM Quantum Experience

The IBM Quantum Experience(IBM Q Experience) no longer exists by its old name, rather it is now can be found in two new elementary names *IBM Quantum Lab* and *IBM Quantum Composer*. In this era of Quantum Computation IBM opened its quantum facility globally so that one can use IBM Q Experience sitting anywhere in the world.

4.2.1 IBM Q LAB

The IBM Q Lab provides the facility to create solutions and experiments in a cloud environment with programming support of Qiskit which is an open-source, rich python framework to build and execute program in some selected quantum computers. In the IBM Q Lab structure scripts can be written in *Jupyter Notebook* which will then can be combined with Qiskit code. Without installing any software, the environment provides interactive interpretation support with appealing visualization. The Quantum Service(QS) is supported by IBM over its Cloud[5] and the Qiskit Runtime is an active part of these QS. For the utilization of this service one must create an account on IBM Cloud by process to get the access of an *API Key* and a *Cloud Resource name*. Once the cloud account is created and all the required setup of the service instance is completed the user can immediately utilize the *qiskit-ibm-runtime* as depicted in Figure 4. Three basic steps needed to be followed during the coding of a quantum circuit in the IBM Q Lab, namely, *Build-Execute-Analyze*.

4.2.2 IBM Quantum Composer

This Composer is an easy graphical tool which provides a *drag-drop* facility to build a quantum circuit without writing a single line of code and this newly built circuitry can be executed on real Quantum machines or over quantum simulator. This composer is incorporated with a huge collection of customizable tool panel by default, there are even more menu options for accessing advance tools and functionality as depicted in Figure 5.There are handy and collapsible side panel acts as repository of the files or the ongoing jobs and the documentation of the user.

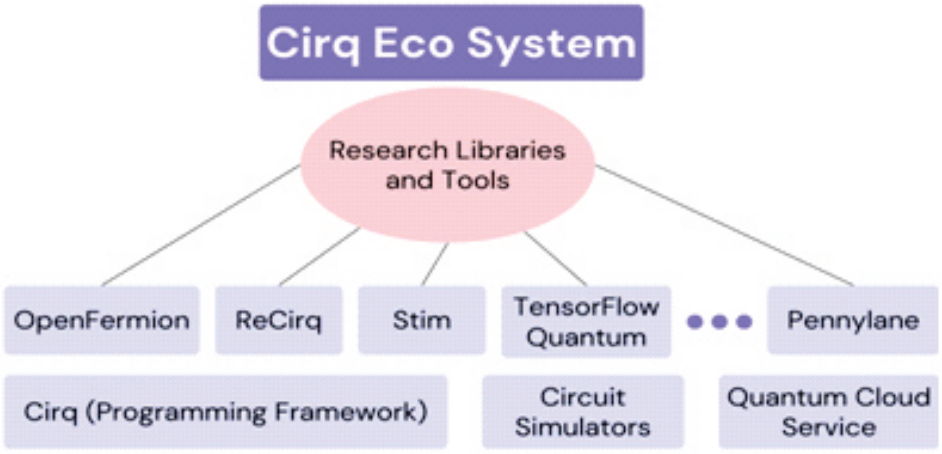

Figure 3 : Cirq Eco System

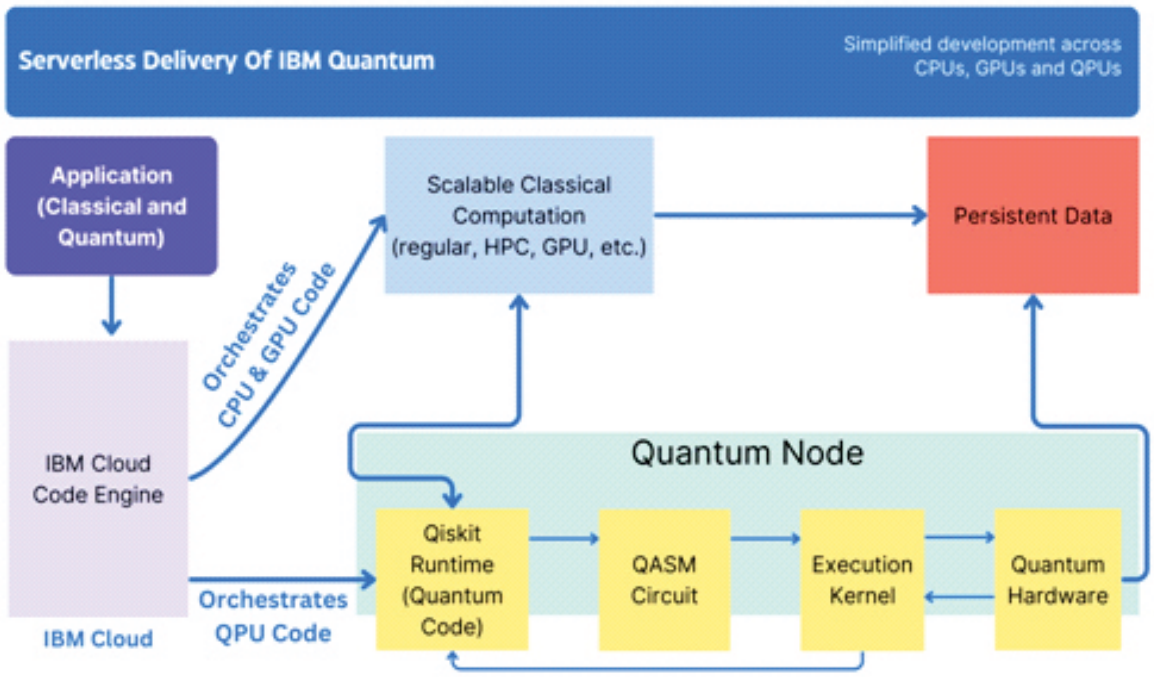

Figure 4 : IBM Quantum Runtime Environment over IBM Cloud

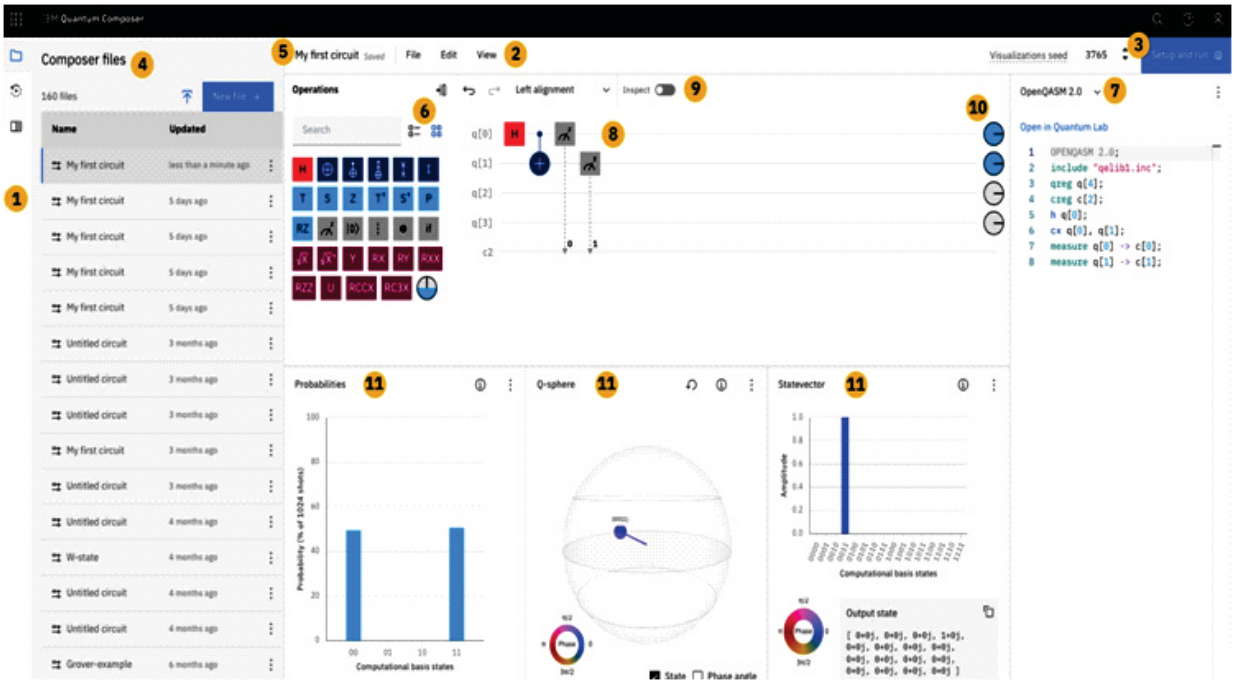

Figure 5: IBM Quantum Composer

- ***Graphical Circuit Editor :*** Users could build quantum circuits using a drag-and-drop interface, making it easier to add gates, manipulate qubits, and create complex quantum algorithms.
- ***Built-in Gate Library :*** The Composer offered a library of commonly used quantum gates, such as Pauli-X, Pauli-Y, Pauli-Z, Hadamard, CNOT, and others. Users could select gates from this library and place them onto the circuit canvas.
- ***Visual Circuit Simulation :*** Users could simulate the behaviour of their quantum circuits directly within the Composer. This feature allowed them to observe the evolution of quantum states, understand how gates affect qubits, and debug their quantum algorithms before running them on real quantum hardware.
- ***Integration with IBM Quantum Experience :*** IBM Quantum Composer was integrated with IBM's Quantum Experience platform, which provided access to real quantum computers for running experiments and executing quantum algorithms.
- ***Educational Resources :*** IBM provided tutorials, documentation, and examples to help users learn quantum computing concepts and how to use the Quantum Composer effectively.

Some of the most important elements the is located in the default panels are briefly described in Table 4

Table 4: IBM Quantum Composer Panel Elements

Panel Element	**Purpose**
Menu bar	Circuit creation from scratch, manipulation and updation of already created circuits, workspace customization
Run area	Execution of the circuit and to alter or reset the run settings
Composer files	The storing and display area of the created circuitry, the circuit is saved here automatically
Operations catalogue	Acts as basic unit while creating a circuit. *Drag-Drop* facility for the gate and other operational elements are available here. Color code is inbuilt for the said elements.
Code editor	Allows to manage the OpenQASM or Qiskit code
Graphical circuit editor	The gates and other operation elements are placed here on the horizontal qubit lines to create quantum circuit
Phase disks	Represents the phase of the state vector of the qubit

4.3 Microsoft Azure Quantum

The Azure quantum computing service which is provided over cloud is known as Azure Quantum. this framework includes a wide range of quantum technologies. The framework emphasizes in collaboration of different technologies in business-oriented way. As declared by Microsoft, Azure Quantum is implemented in such away that one can create quantum solutions for different platforms at the same time. It also offers a tuning feature which ensures that a particular algorithm can be optimized[7] at different degree for different systems. The main motivation of Azure Quantum is to concentrate on the algorithm rather than the technology used for execution. Azure can be thought of as an ecosystem[7] where one can float into the diversity of quantum hardware and solutions provided by Microsoft itself and by the collaborating partners. One can select one of many quantum languages like Qiskit, Cirq and Q# for developing the solution of interest. Microsoft claims that the combination of Azure Quantum and Quantum Development Kit toolset(QDK) will enable the developer to design and optimize the desired quantum logic and can apply the logic inside the existing Azure platform to check the real-world scenario.

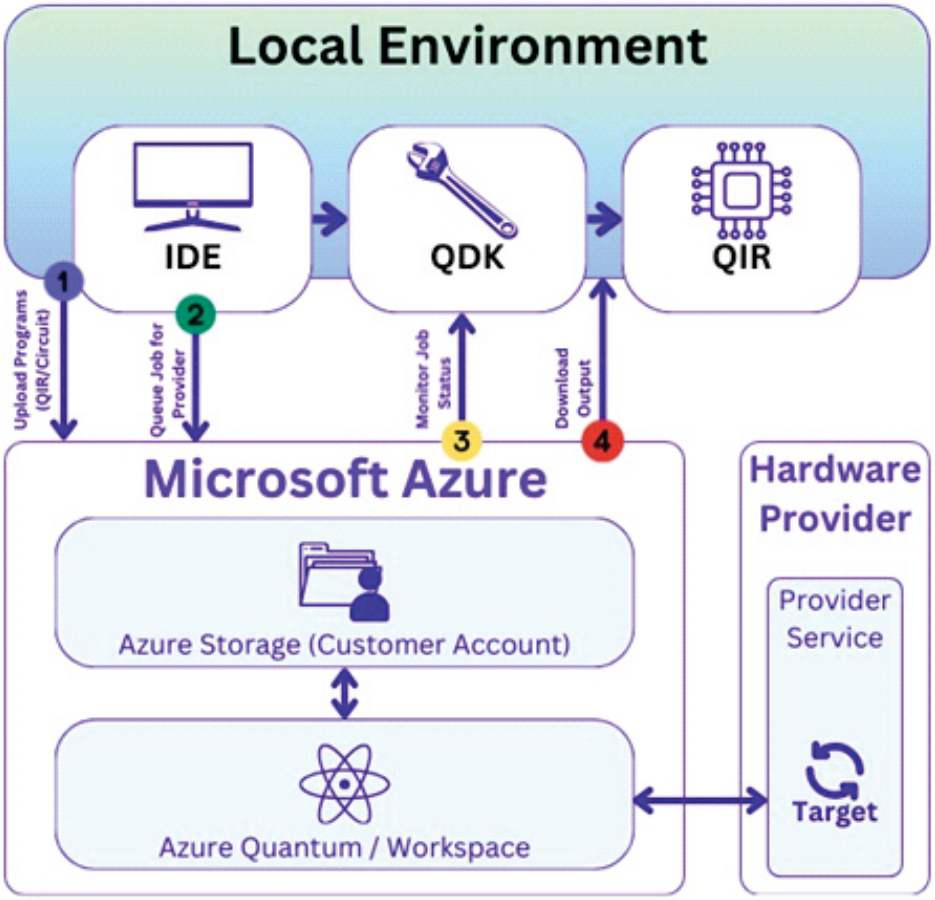

As per the claim of Microsoft, they provide the Hybrid quantum computing environment where a classical computer and a quantum computer works alongside to solve a problem. Microsoft Azure Hybrid Quantum is an initiative by Microsoft to bridge the gap between classical and quantum computing resources, allowing developers to leverage both types of computing power seamlessly within the Azure cloud platform. With the hybrid quantum computing architecture available in Azure Quantum, one can create a mix of classical and quantum instructions together to solve some problems.

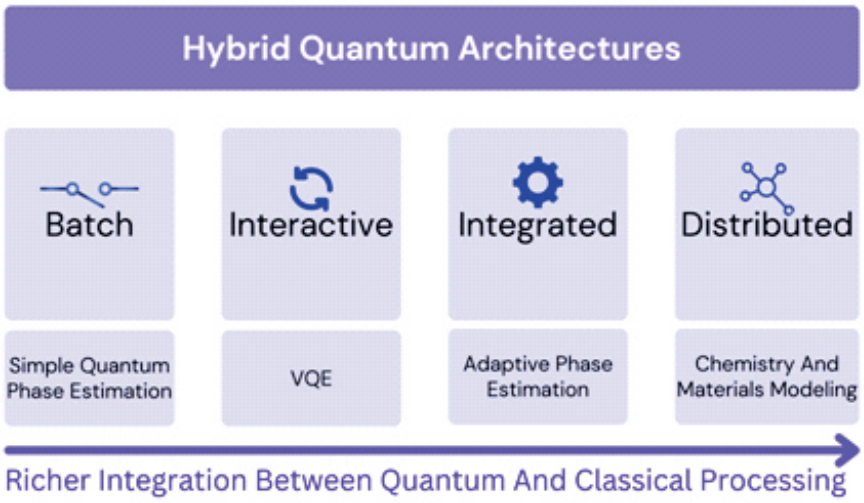

Figure 7: Azure Hybrid Quantum

Table 5: Azure Hybrid Quantum Architecture

Architecture	Description
Batch quantum computing	Local clients define circuits and submit them as jobs to the quantum processing unit (QPU), which returns the result to the client. Batching multiple circuits into one job,however, eliminates the wait between job submissions, allowing one to run multiple jobs faster.
Interactive quantum computing	In this model, the client compute resource is moved to the cloud, resulting in lower latency and repeated execution of the quantum circuit with different parameters. Examples of problems that can use this approach are Variational Quantum Eigensolvers (VQE) and Quantum Approximate Optimization Algorithms (QAOA).
Integrated quantum computing	With integrated quantum computing, the classical and quantum architectures are tightly coupled, allowing classical computations to be performed while physical qubits are coherent
Distributed quantum computing	Here, the classical computation is working alongside logical qubits. The long coherence time provided by logical qubits enables complex and distributed computation across heterogeneous cloud resources.

5 Quantum Tool Kits

5.1 Qiskit

Qiskit is an open-source quantum computing software development framework developed by IBM. It provides a set of tools, libraries, and APIs for building and executing quantum programs[9] on quantum computers and simulators. Qiskit[21] allows researchers, developers, and enthusiasts to experiment with quantum algorithms, conduct quantum research, and explore the potential applications of quantum computing. It consists of several components, namely Qiskit Terra, Qiskit Aer, Qiskit Ignis and Qiskit Aqua. Qiskit also provides interfaces to access IBM's cloud-based quantum devices through the IBM Quantum Experience platform.

- ***Qiskit Terra :*** Qiskit Terra is the foundation for composing quantum programs at the level of circuits and pulses. It provides tools for creating quantum circuits, compiling them for target quantum hardware, and optimizing them for execution.

- ***Qiskit Aer :*** Qiskit Aer is a high-performance simulator for quantum circuits that provides both state-vector and density matrix simulations. Aer allows researchers and developers to simulate quantum algorithms and study their behaviour under various conditions.

- ***Qiskit Ignis :*** Qiskit Ignis is a library for quantum error correction and mitigation. It provides tools for calibrating quantum devices and techniques for mitigating errors.

- ***Qiskit Aqua :*** Qiskit Aqua is a library for quantum applications in domains such as chemistry, optimization, and machine learning.

5.1.1 Half Adder in Qiskit

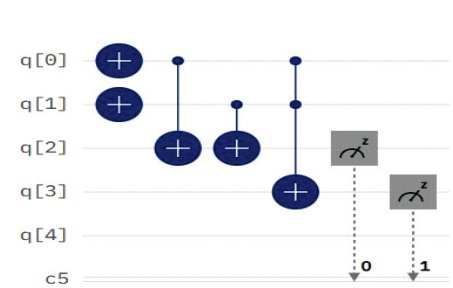

(a) Half Addar Circuit in Qiskit

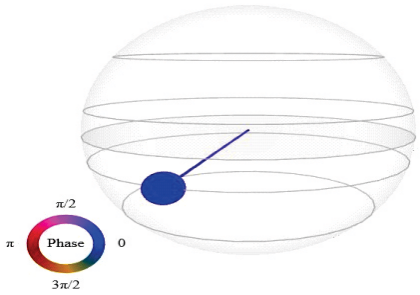

(b) Half Addar Q-Sphere

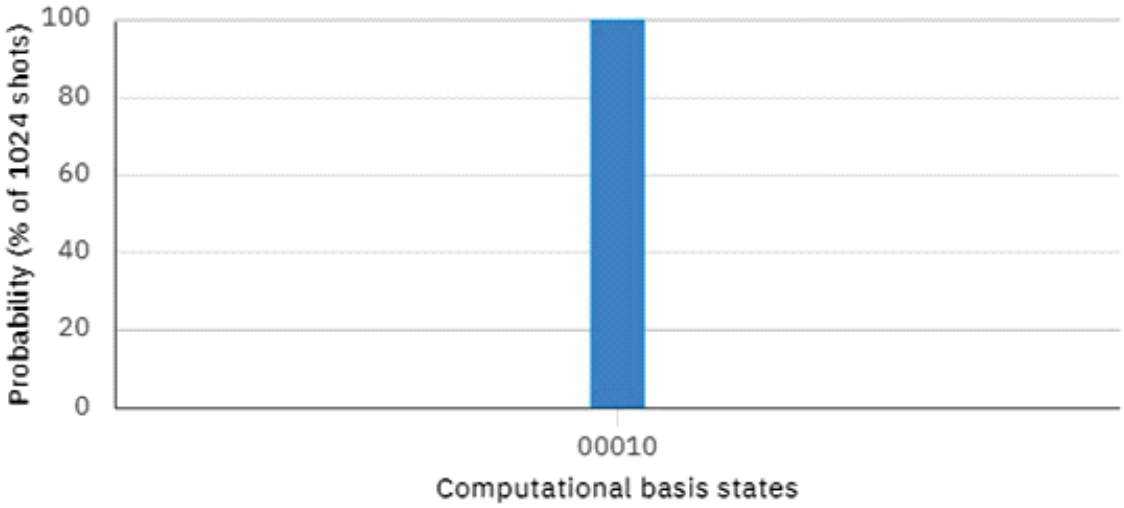

(c) Probability of outputs across Computational Basis

Figure 8: Half Adder using Qiskit in IBM Quantum Lab

In Figure 8a, a Half Adder quantum circuit is depicted. The circuit consists of several quantum gates applied to qubits. Firstly, Hadamard gates are applied to Qubits $q[0]$ and $q[1]$. Then, a controlled-NOT(CNOT) gate is applied between $q[0]$(control) and $q[2]$(target) and also between $q[1]$(control) and $q[2]$(target). Following this, a controlled-controlled-NOT(Toffoli) gate is applied with $q[0]$, $q[1]$ as controls, and $q[3]$ as the target qubit. Finally, measurements are performed on qubits $q[0]$, $q[1]$, $q[2]$, and $q[3]$.In Figure 8c, the probability outcomes for a total of 1024 shots are recorded. The outcomes are as follows:

- 0000: This outcome indicates that all qubits are in the state $|0\rangle$, which means the sum is 0 and there is no carry.
- 0101: This outcome suggests that $q[0]$ and $q[2]$ are in the state $|1\rangle$ while $q[1]$ and $q[3]$ are in the state $|0\rangle$. This signifies a sum of 1 with no carry.
- 0110: Here, $q[0]$ and $q[3]$ are in the state $|0\rangle$, $q[1]$ and $q[2]$ are in the state $|1\rangle$. This corresponds to a sum of 1 with no carry.

- 1011: This outcome indicates that $q[2]$ is in the state $|0\rangle$, while $q[0]$, $q[1]$, and $q[3]$ are in the state $|1\rangle$. This represents the sum is 0 with a carry.

5.2 Quantum Development Kit

The Microsoft Quantum Development Kit (QDK)[25]is a set of tools, libraries, and resources for developing quantum computing applications. It provides an integrated development environment for quantum computing, including programming languages, simulators, and support for connecting to quantum hardware. The Microsoft Quantum Development Kit comprises several components designed to facilitate the development, simulation, and execution of quantum algorithms. Here are the main components of the Quantum Development Kit:

- ***Q# Language :*** Q# is a domain-specific programming language specifically designed for expressing quantum algorithms. It offers high-level abstractions for quantum operations, data types, and quantum control flow.
- ***Quantum Simulator :*** The Quantum Development Kit includes a quantum simulator capable of executing Q# programs on classical hardware.
- ***Quantum Libraries :*** It offers predefined quantum operations, quantum algorithms, and quantum data structures. These libraries cover a range of quantum computing tasks.
- ***Development Environment :*** The IDE is suitable for writing, testing, debugging and includes features like syntax highlighting, code completion and debugging tools.
- ***Classical Language Integration :*** QKD supports integration with classical programming languages like C# and F#. Developers can write hybrid quantum-classical applications.
- ***Quantum Hardware Support :*** QKD provides tools and libraries for interfacing with quantum hardware, enabling developers to run Q# programs on external quantum

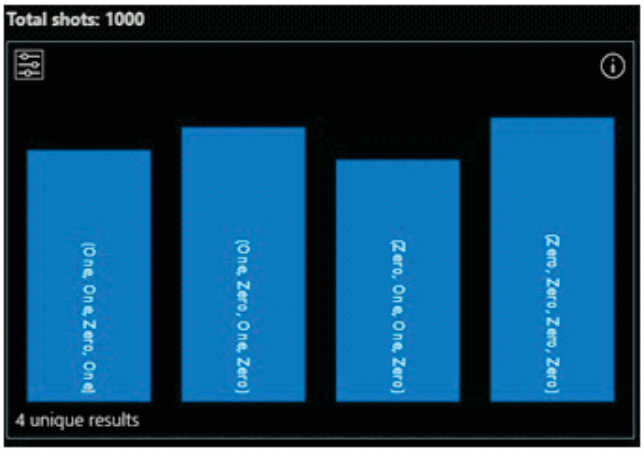

Figure 9 : Half Adder Output in Azure Quantum

5.3 Cirq

Cirq is an open-source quantum computing library developed by Google. Cirq provides a powerful and versatile platform for quantum computing research and development. It offers tools and resources for both simulation-based experimentation and real-world quantum

computing applications. Cirq is open-source software released under the Apache License 2.0, allowing users to freely use, modify, and distribute the library. Here are some key aspects of Cirq:

- ***Programming Language :*** Cirq is primarily designed for Python, providing a Python API for defining and manipulating quantum circuits and algorithms.
- ***Quantum Circuits :*** Cirq allows users to construct quantum circuits using high-level abstractions like qubits, gates, and operations.
- ***Simulators :*** Cirq includes built-in simulators for performing quantum circuit simulations on classical computers.
- ***Quantum Hardware Support :*** Cirq offers support for running quantum circuits on Google's quantum processors through the Google Quantum Computing Service (QCS). It provides tools and interfaces for interfacing with quantum hardware and submitting quantum tasks for execution.
- ***Noise Models :*** Cirq supports the modeling of noise and errors in quantum systems, allowing users to simulate realistic quantum hardware conditions.
- ***Low-Level Control :*** Cirq offers low-level control over quantum circuits, allowing users to specify quantum operations and gates directly.
- ***Virtual machine support in Colab :*** Using Cirq in Google Colab is a convenient way to experiment with quantum computing algorithms in a cloud-based environment. Google Colab provides free access to GPU and TPU resources and allows to run Python code in a Jupyter notebook-like interface.

5.3.1 Half Adder in Cirq

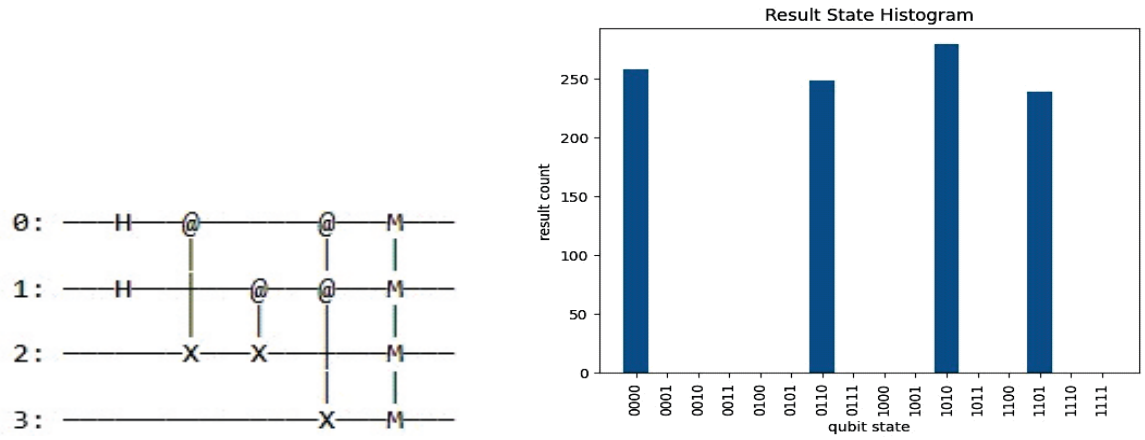

(a) Half Adder Circuit in Cirq

(b) Probality of outputs across Computational Basis

Figure 10 : Half Adder using Cirq in Google Colab

5.4 Basic comparison Qiskit, QDK and Cirq

Cirq and Qiskit primarily use Python, while QDK uses Q# along with integration with .NET languages. Qiskit provides higher-level abstractions compared to Cirq, making it more accessible for beginners. QDK, on the other hand, focuses on Q# which offers high-level abstractions tailored for quantum computing. Both Qiskit and Cirq offer cloud services for running quantum simulations and experiments. Qiskit provides access to IBM's quantum processors, while Cirq offers integration with Google's cloud infrastructure. Table 6 shows the simple comparison.

Table 6: Basic characteristics of IBM Qiskit, Microsoft QDK and Google Cirq

Feature	Qiskit	QDK	Cirq
DeveloperOrganization	IBM	Microsoft	Google
Release Date	March 7, 2017	January 4, 2018	July 18, 2018
Release Version	0.5.4	0.2.1802.2022	V0.4.0
Open source or not	Open source	Open source	Open source
OS	Linux, Windows, Mac	Linux, Windov Mac	Linux, Windows, Mac
S/w Requirements	Anaconda-3 Python 3.5	VS Code	Python 3.7+
Quantum H/w	IBM Quantum, IonQ, Rigetti, AQT	Honeywell, Ion QCI	Google Quantum, IonQ, Rigetti, AQT
Host Language	Python, Java, Javascript	C#, F#	Python, JuliaX experimental stage)
Quantum Language	QASM	Q#	No specific Quantum language
CryogenicInfrastructure: Temperature Control	Typically, around 15 to 20 millikelvin	Close to absolute zero	Close to absolute zero
Cryogenic Infrastructure: Dilution Refrigeration	Implemented and controlled	Implemented a controlled	Implemented and controlled
Cryogenic Infrastructure: Cryostat Design	Implemented	Implemented	Implemented
Cryogenic Infrastructure: Cryogenic Instrumentation	Sophisticated control systems for adjustment and stabilization	Same as QDK	Same as QDK

Continuation of Table 6			
Feature	**Qiskit**	**QDK**	**Cirq**
Dynamic Decoupling	Utilizes advanced pulse-level control techniques, including Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG) sequences	Implemented	Implemented
Programming Language	Python	Q#	Python
Compatibility	Wide range of quantum hardware architectures and simulators	Cross platform sup-port	Cross platform
Documentation	Extensive documentation	Extensive	Extensive
Community	A vibrant community of users	A large community	Vibrant

6 Current State of QC and Challenges

There have been a lot of advancement on the field of Quantum Computation in last few decades, even though that is not enough to fit a simple low scale Quantum Computer in tradition Classical desktop cabinet[11]. Ongoing research only able to perform computation with hundred Qubits[19]. At present time almost fifty nations are engaged with the research in the direction of the improvement of the quantum system, but most of the cases the sufficient infrastructure is not available to the researchers. Non-availability of the good quality interface between the man and machine and the information exchange among the different research group makes the life of Quantum Computing harder. Another issue is the operating temperature of the Quantum machine which is difficult to achieve continuously. The obstacles facing quantum computing are as follows:

- ***Qubit Availability :*** Currently, there is a scarcity of high-quality, error-corrected qubits.
- ***Connectivity Constraints :*** Building devices with enhanced connectivity is essential for enabling long-distance entanglement operations.
- ***Circuit-Level Fault Tolerance :*** Integrating fault-tolerant qubits into universal computing systems remains challenging.
- ***Verification and Debugging :*** Difficulties in verification and debugging due to the disruptive effects of measurement at the quantum level.
- ***Interface and Information Exchange :*** The lack of high-quality interfaces between humans and quantum machines, as well as insufficient information exchange among research groups, poses significant hurdles.
- ***Scalable Quantum Algorithms :*** Developing scalable algorithms that can exploit the full potential of quantum hardware remains a challenge.

7. Future Scope

In recent past a massive boost has occurred in the field of QC because of commercial interest of the industry which inspiring the academia to move more and more into this domain. Business experts has understood the it will be beneficial to invest in the QC technologies for future[15]. Quantum Computing has the ability[18] to efficiently improve the productivity in domain of business analytics, weapon research, medicine industry, chemistry and several other. Hence, these industries have shown interest in Quantum research which in turn lying a sooth path and well-set direction the upcoming Quantum research.

Future advancement may include:

- ***Advancements in Business Analytics :*** QC offers unprecedented capabilities for data processing and analysis, revolutionizing the field of business analytics.
- ***Breakthroughs in Medicine Industry :*** This Healthcare[13] sector stands to benefit significantly from QC in terms of *Accelerated drug discovery processes*[14], *analysis of genomic data*, *quantum-driven predictive analytics* and many more.
- ***Revolutionizing Chemistry :*** QC holds immense promise for the field of chemistry by revolutionizing *material design*, *simulation of complex reactions*, *optimization*[6] *of molecular structures* and several other issues.

These future scopes highlight the transformative potential of Quantum Computing across diverse industries, paving the way for groundbreaking advancements and innovations in the years to come.

References :

1. Sukhpal Singh Gill, Rajkumar Buyya and *et al.*. 2021. *Quantum computing: A taxonomy, systematic review and future directions*. doi:10.1002/spe.3039
2. NATHALIE P DE LEON and *et al.*. 2021. *Materials challenges and opportunities for quantum computing hardware*. doi: 10.1126/science.abb28
3. Marco Lewis , Sadegh Soudjani , Paolo Zuliani. 2021. *Formal Verification of Quantum Programs: Theory, Tools and Challenges*. Open Access arXiv : Logic in Computer Science
4. Stavros Efthymiou and *et al.*. 2020. *Qibo: a framework for quantum simulation with hardware acceleration*. doi : 10.1088/2058-9565/ac39f5
5. F. Leymann and *et al.*. 2020. *Quantum in the Cloud: Application Potentials and Research Opportunities*. doi: 10.5220/0009819800090024
6. Yangyang Li and *et al.*. 2020. *Quantum Optimization and Quantum Learning : A Survey*. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2970105
7. Daniele Cuomo and *et al.*. 2020. *Towards a Distributed Quantum Computing Ecosystem*. doi : 10.1049/IET-QTC.2020.0002
8. Christophe Chareton and *et al.*. 2021. *Formal Methods for Quantum Programs : A Survey*. Computer Science ArXiv. Corpus ID: 237503635

9. Marco Lewis, S. Soudjani and P. Zuliani. 2021. *Formal Verification of Quantum Programs: Theory, Tools and Challenges*. Computer Science ArXiv. Corpus ID: 238259899

10. J. Preskill. 2018. *Quantum Computing in the NISQ era and beyond*. doi : 10.22331/q-201808-06-79.

11. Bertrand Wong. *On Quantum Entanglement*. International Journal of Automatic Control System. 2019; 5(2): 1–7p.

12. S. Pirandola, J. Eisert, C. Weedbrook, A. Furusawa, and S. L. Braunstein. 2015. *Advances in Quantum Teleportation*. doi : 10.1038/nphoton.2015.154

13. U. Ullah and B. Garcia-Zapirain. 2024. *Quantum Machine Learning Revolution in Healthcare: A Systematic Review of Emerging Perspectives and Applications*. doi : 10.1109/ACCESS.2024.3353461.

14. Solenov D, Brieler J, Scherrer JF. 2018.*The Potential of Quantum Computing and Machine Learning to Advance Clinical Research and Change the Practice of Medicine*. 2018 SepOct;115(5):463-467. PMID: 30385997; PMCID: PMC6205278.

15. B. Patel, Sejal Mishra, Rahul Jain and Nirali Kansara. 2023. *The Future of Quantum Computing and its Potential Applications*. 23. 513-519.

16. Britt Keith A., Humble Travis S.. 2017. *High-performance computing with quantum processing units*. doi : 10.1145/3007651.

17. S. Blinov and B. Wu and C. Monroe. 2021. *Comparison of Cloud-Based Ion Trap and Superconducting Quantum Computer Architectures*. arXiv:2102.00371

18. A. D. Córcoles and et al.. 2020. *Challenges and Opportunities of Near-Term Quantum Computing Systems*. In Proceedings of the IEEE, vol. 108, no. 8, pp. 1338-1352. doi: 10.1109/JPROC.2019.2954005.

19. Morten Kjaergaard, Mollie E. Schwartz, Jochen Braumüller, Philip Krantz, Joel I.-J. Wang, Simon Gustavsson, and William D. Oliver. 2020. *Superconducting Qubits: Current State of Play*. doi:10.1146/annurev-conmatphys-031119-050605

20. T. Tabassum and F. Akter. 2023. *QRAM: Quantum Technology for Random Access Memory*. doi:10.1109/ICCIT60459.2023.10441238

21. E. h. Shaik and N. Rangaswamy. 2020. *Implementation of Quantum Gates based Logic Circuits using IBM Qiskit*. doi: 10.1109/ICCCS49678.2020.9277010

22. Rongyuan Cui, Zhuyang Lyu. 2023. *Analysis of quantum gates in quantum circuits*. doi: 10.54254/2753-8818/10/20230301.

23. Samskruthi S Patil, Dr. Vijayalakshmi M N. 2021. *Quantum Computing - An Introduction and Cloud Quantum Computing*.

24. Yoshito Kanamori and Seong-Moo Yoo. 2020. *Quantum Computing: Principles and Applications*. DOI: https://doi.org/10.58729/1941-6679.1410

25. Mariia Mykhailova and Mathias Soeken. 2021. *Testing Quantum Programs using Q# and Microsoft Quantum Development Kit*.

Leveraging Data Analytics and Artificial Intelligence in Influncer Marketing : A Paradigm

Aishwarya Kayal

[Abstract: *This chapter explores the evolution of influencer marking, analyzing trends, challenges, and opportunities in the digital landscape. It discusses the rise of influencer marketing, key trends shaping the industry, persistent challenges such as authenticity and ROI measurement, and opportunities for innovation. Emphasizing the role of data analytics and artificial intelligence, it highlights how these technologies enhance influence selection, content optimization and campaign measurement. The chapter concludes by outlining best practices for success, emphasizing authenticity, transparency, and the importance of robust measurement frameworks in driving impactful influencer collaborations.*

Keywords : *Influencer marketing, Evolution, Trends, Challenges, Opportunities, Data analytics, Artificial intelligence (AI), Best practices***]**

Introduction : Influencer marketing has emerged as a dominant force in the digital marketing landscape, revolutionizing the way brands connect with consumers. By leveraging the influence of social media personalities, brands can amplify their message and engage with their target audience in a more personalized and authentic manner. In recent years, influencer marketing has undergone significant evolution, driven by the rise of social media platforms and the emergence of digital content creators.

Recognizing the impact wielded by these content creators, brands are increasingly turning to influencer partnerships to enhance their brand visibility, drive engagement, and foster deeper connections with their audience. Marketers must understand the key trends shaping the industry, the challenges they may encounter, and the best practices to maximize the impact of influencer collaborations. This article explores the evolution of influencer marketing, identifies the trends shaping its trajectory, delves into the challenges faced by marketers, and provides actionable strategies and best practices for success in this dynamic landscape.

The Evolution of Influencer Marketing :

Influencer marketing has experienced a remarkable evolution, reflecting changes in consumer behavior, technological advancements, and shifts in digital media consumption patterns. Initially, influencer marketing primarily involved celebrity endorsements and sponsored content placements in traditional media channels such as television and print. However, with the rise of social media platforms particularly Instagram, You Tube, and Facebook, influencer marketing underwent a significant transformation.

Unlike traditional celebrities, social media influencers often had more niche audiences and cultivated deeper connections with their following through relatable and authentic content. This shift towards micro-influencers, individuals with smaller but highly engaged audiences, marked a turning point in influencer marketing, prioritizing authenticity and relevance over reach.

As social media platforms continued to evolve, influencer marketing strategies diversified to include a wide range of content formats, including short-form videos, live streams, and

Aishwarya Kayal, SACT-I, Dept. of Computer Science, Uluberia College, Howrah.

immersive experiences such as augmented reality (AR) filters and virtual try-on tools. Brands increasingly sought to collaborate with influencers who could create compelling and sharable content that resonated with their target audience.

In recent years, influencer marketing has continued to evolve with the advent of new technologies such as artificial intelligence (AI), which enables more precise influencer selection, content optimization, and performance measurement. Additionally, influencer marketing has expanded beyond consumer brands to encompass a wide range of industries, including B2B, healthcare, and finance, demonstrating its versatility and effectivences across various sectors.

Overall, the evolution of influencer marketing reflects a fundamental shift in how brands engage with consumers in the digital age, emphasizing authenticity, creativity, and collaboration. As influencer marketing continues to evolve, brands must adapt their strategies to stay relevant and capitalize on emerging trends and opportunities in this dynamic landscape.

Treands Shaping Influencer Marketing

Several trends have shaped the evolution of influencer to marketing. Micro-influencers, individuals with smaller but highly engaged audiences, have gained prominence as brands prioritize authenticity and niche targeting over reach. Moreover, the diversification of social media platforms, including Instagram, You Tube, TikTok, and Snapchat, has provided brands with a multitude of channels to leverage influencer partnerships. Additionally, the rise of new content formats such as live streaming and short-form video content has opened up innovative opportunities for brands to engage with consumers through influencer collaborations.

Challenges in Influencer Marketing :

While influencer marketing offers numerous benefits for brands, it also presents several challenges that marketers must navigate to ensure the success of their campaingns.

1. **Authenticity and Trust** : Maintaining authenticity and trust is one of the primary challenges in influencer marketing. However, the prevalence of sponsored content and influencer fraud, such as fake followers and engagement bots, has eroded trust among consumers. Brands must carefully vet influencers and ensure transparent disclosure of sponsored content to maintain authenticity and credibility.
2. M**easurement and ROI** : Measuring the return on investment (ROI) of influencer marketing campaigns remains a persistent challenge for marketers. Unlike traditional marketing channels, such as paid advertising, attributing sales and conversions directly to influencer collaborations can be complex. Marketers struggle to quantify the impact of influencer partnerships accurately and justify their marketing spend. Developing robust measurement and analytics frameworks is essential for tracking the effectiveness of influencer campaigns and demonstrating their impact on business objectives.
3. **Finding the Right Influencers** : Identifying and selecting the right influencers for a campaign can be challenging. With thousands of influences across various niches and platfomrs, brands must conduct thorough research to find influencers whose audience demographics, values and content align with their brand objectives. Moreover, building authentic relationships with influencers takes time and effort, requiring brands to invest in nurturing connections based on mutual trust and respect.
4. **Content Quality and Relevance** : Maintaining consistency quality and relevance is crucial for the success of influencer marketing campaigns. Brands must collaborate closely with influencers to ensure that sponsored content aligns with their brand guidelines and resonates with their target audience.
5. R**egulatory Compliance** : Regulatory compliance poses another challenge for brands engaging in influencer marketing. Brands must ensure that influencer partnerships comply with relevant regulations to avoid legal repercussions and maintain trust with consumers.

Addressing these challenges requires a strategic approach, transparent communication, and a commitment to authenticity and integrity. By overcoming these obstacles, brands can harness the full potential of influencer marketing to connect with consumers authentically and drive meaningful business outcomes.

Strategies for Success :

To maximize the impact of influencer marketing campaigns, brands should implement strategic approaches that prioritize authenticity, transparency, and measurement. Here are key strategies for success :

1. **Authentic Relationship Building** : Building authentic relationship with influencers is essential for successful collaborations. Brands should seek influencers whose values align with their own and whose content resonates with their target audience. Nurturing genuine connections based on mutual trust and respect fosters authenticity and credibility, enhancing the effectiveness of influencer partnerships.
2. **Transparent Disclosure** : Transparent disclosure of sponsored content and partnerships is crucial for maintaining trust with consumers. Brands and influences should clearly label sponsored posts and disclose any material connections, ensuring compliance with regulatory guidelines and fostering transparency and integrity.
3. **Strategic Influencer Selection** : Strategic influencer selection is critical for campaign success. Brands should conduct thorough research to identify influences whose audience demographics interests, and content align with their brand objectives. Collaborating with influencers who have a genuine connection with their audience ensures authenticity and maximizes campaign impact.
4. **Content Collaboration** : Collaborating closely with influencers on content creation is essential for delivering engaging and relevant content. Brands should provide influencers with creative freedom and guidance, allowing them to create authentic and compelling content that resonates with their audience while aligning with the brand message and objectives.
5. **Robust Measurement and Analytics** : Implementing robust measurement and analytics frameworks enables brands to track the effectiveness of influencer campaigns and optimize strategies for continuous improvement. Brands should define clear objectives, establish key performance indicators (KPIs), and leverage data analytics tools to monitor campaign performance, measure ROI, and gain actionable insights for future campaigns.
6. **Long-term Partnership** : Investing in long-term partnerships with influencers fosters loyalty and advocacy, driving sustained brand growth. Brands should prioritize building enduring relationships with influencers based on mutual value exchange, ongoing communication, and collaboration on multiple campaigns over time.

Leveraging Data Analytics and AI :

In today's data-driven marketing landscape, data analytics and artificial Intelligence (AI) play a play a pivotal role in optimizing influencer marketing campaigns and maximizing their impact. Here are key ways brands can leverage data analytics and AI in influencer marketing:

1. **Influencer Identification** : Data Analytics algorithms can analyze vast datasets to identify influencers whose audience demographics, interests, and engagement metrics align closely with the brand's target market. AI-powered influencer discovery platforms use advanced machine learning techniques to sift through millions of social media profiles and identify the most relevant influencers for a campaign, saving time and resources for marketers.
2. **Audience Insights** : Data analytics tools provide valuable insights into influencer audiences including demographics, psychographics, and behavioral patterns. By understanding their

audience composition and preferences, brands can tailor their messaging and content to resonate more effectively with the target audience. AI-powered audience segmentation and profiling techniques enable marketers to identify micro-segments within an influencer's audience and personalize content for maximum relevance.

3. **Content Optimization** : AI algorithms can analyze the performance of influencer content in real-time, identifying trends, patterns, and engagement metrics to optimize content strategy. By leveraging predictive analytics, brands can forecast content performance and identify opportunities for content optimization, such as timing, format, and messaging. AI-powered content recommendation engines suggest content topics and formats based on audience preferences and historical performance data, ensuring that influencer collaborations deliver maximum impact.
4. **Campaign Performance Measurement** : Data analytics tools enable brands to track the effectiveness of influencer marketing campaigns and measure their impact on key performance indicators (KPIs) such a engagement, reach and conversion rates. AI-powered attribution models attribute sales and conversions to influencer touchpoints, providing insights into the ROI of influencer partnerships. Advanced analytic dashboards visualize campaign performance metrics in real-time, allowing marketers to monitor progress and make data-driven decisions to optimize campaign strategy.
5. **Predictive Analytics** : AI-powered predictive analytics algorithms forecast future trends and consumer behaviour, enabling marketers to anticipate market shifts and adapt influencer strategics proactively. By analyzing historical campaign data and external factors such as social media trends and cultural events, predictive analytics models can identify emerging opportunities and threats, helping brands stay ahead of the curve and capitalize on trends before they peak.

Best Practices for Success :

In addition to strategic approaches, there are several best practices that brands can adapt to maximize the impact of influncer marketing. Firstly, it's crucial to conduct thorough research and due diligence when selecting influencers, ensuring alignment with brand values and target audience demographics. Moreover, fostering authentic relationships with influences through open communication and mutual respect is essential for building trust and credibility. Additionally, providing influencers with creative freedom and autonomy in content creation fosters authenticity and resonates with their audience.

Case Studies and Examples :

1. **Nike's Collaboration with Colin Kaepernick** : Nike's partnerships with Colin Kaepernick, the former NFL, quarterback known for his activism, sparked controversy and conversation. By aligning with Kaepernick's message of social justice and equality. Nike effectively tapped into a passionate and engaged audience. Despite backlash from some quarters, the campaign garnered widespread attention, driving significant brand visibility and reinforcing Nike's commitment to secial issues.
2. S**ephora's Beauty Influencer Partnerships** :

   Sephora, a leading beauty retailer, has successfully leveraged influencer partnerships to connect with its target audience of beauty enthusiasts. By collaborating with popular beauty influencers on platforms like Instagram and You Tube, Sephora has generated buzz around new product launches, provided authentic product reviews, and showcased makeup tutorials. These partnerships have not only increased brand awareness but also driven engagement and sales among Sephora's core demographic.
3. **Fashion Nova's Influencer Affiliate Program** :

   Fashion Nova, a fast-fashion brand, has disrupted the fashion industry with its influencer

affiliate program. By partnering with a diverse range of influencers, including micro-influencers and celebrities, Fashion Nova has built a network of brand ambassadors who promote its products to their followers. Through a combination of sponsored posts, discount codes, and affiliate links. Fashion Nova incentivizes influencers to drive traffic and sales, resulting in a highly effective and scalable marketing strategy.

4. **Red Bull's Extreme Sports Sponsorships** :

   Red Bull, the energy drink company, has long been synonymous with extreme sports and adrenaline-fueled activities. By sponsoring athletes and events in niche sports such as skydiving, snowboarding, and mountain biking, Red Bull has cultivated a brand image of excitement, adventure, and innovation. These partnership not only reinforce Red Bull's association with high-performance activities but also resonate with its target audience of young, adventurous consumers.

Conclusion : In conclusion, influencer marketing remains a powerful strategy for brands to connect with consumers authentically and drive business growth in the digital age. The evolution of influencer marketing, from its inception to its current state, reflects the dynamic nature of consumer behavior and technological advancements. Despite the challenges posed by authenticity, measurement, and algorithmic changes, brands have the opportunity to leverage influencer partnership strategically to achieve their marketing objectives.

As influencer marketing continues to evolve, brands remain agile and adaptable, continuously refining their strategies to align with shifting consumer preferences and emerging platforms. By staying informed, embracing innovation, and prioritizing authenticity, brands can harness the full potential of influencer marketing to forge meaningful connections with consumers and drive sustained business growth in the digital era.

References :

1. Feng, Yang & Chen, Haun & Xie, Quan. (2023). Al Influencers in Advertising : The Role of AI Influencer-Related Attributes in Shaping Consumer Attitudes, Consumer Trust, and Perceived Influencer-Product Fit. Journal of Interactive Advertising, 24.10.1080/15252019. 2023.2284355.
2. https://fastercapital.com/topics/the-impact-of-ai-and-data-anaaalytics-on-influencer-marketing.html.
3. https://influencermarketinghub.com/ai-infuencer-marketing/.
4. Arsenyan. J. Amrrowska, A, 2021, Almost human? A comparative case study on the social media presence of virtual influencers. Int.J.Hum. Comput. Stud. 155, 102694 https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2021.102694.
5. Longoni, C.,Cian, L., 2022. Artificial intelligence in utlitarian vs. Hedonic contexts: the "word-of-machine" effect. J. Market. 86 (1), 91-108. https://doi.org/ 10.1177 / 00222429220957347

Monosodium Glutamate (msg) and Reproductive Dysfunction: Mini Review

Shibprasad Mondal

[Abstract : *Monosodium glutamate (MSG) is commonly marketed as a food additives or flavor enhancer with an Umami taste. Glutamate generally acts as a neurotransmitter but numerous studies on rat reported that continuous consumption of this food additive leads to severe life threatening toxic effect and the reproductive organ are also very much prone to MSG induced toxicity due to oxidative stress or ROS generation. MSG at the dose of 120 mg/kg body weight on rat is very harmful for reproductive organ. Antioxidants supplement like vitamin C and E, carotene, selenium, green tea etc. plays a crucial role to cure MSG induced reproductive toxicity.*

Key words : *Monosodium glutamate, Food additives, Reproductive dysfunction, Reactive oxygen species (ROS), Oxidative stress, Antioxidants.***]**

Introduction:

Food additives are mainly used in food industry with very low amount for flavor, colour, taste, appearance and also texture for food[1]. MSG is commonly marketed as a flavor enhancer. MSG also known as L-glutamate or sodium glutamate or Ajinomoto (IUPAC name-sodium 2-aminopentanedioate and molecular formula is $C_5H_8NO_4$ Na). It is made up by 78% glutamic acid, 22% sodium and water[2].The German scientist Karl Heinrich Ritthausen discovered monosodium glutamate.Our tongue is very much sensitive to salt, sweet, bitter and umami (used extensively in Asian cooking)[3].

The taste of MSG is referred to Umami (a Japanese language) is a fifth unique taste (not sweet, salty, sour or bitter)[4].

It is highly water soluble ingredients. Food industry shows a great interest to MSG for flavor enhancement system[5]. Glutamate is the major component of MSG found in many protein rich food products such as meat, fish, milk and some vegetables[6].

Glutamate also produced in the body and plays an essential role in human metabolism. MSG is a naturally occurring nonessential amino acid responsible for the synthesis of many proteins and peptides and it is also acts as an important excitatory neurotransmitter in brain[7]. It is widely used not only in the food industry but also at home and restaurants. This taste enhancer is present in almost all daily taken flavored fast foods like chips and snacks, soups or sauces (canned, packed), prepared meals, frozen foods and meals etc[8].

Numerous studies shown that continued consumption of this food additive leads to severe life threatening toxic effect on different organs of human bodies e.g hepatotoxicity, reproductive toxicity, neurotoxicity, renaltoxicityetc . MSG induced reproductive dysfunction is significantly observed and it is reported that MSG induced many reproductive dysfunction occurred via different mechanism e.g. oxidative damage, histomorphological dysfunction, reduce gamete production, hormonal dysfunction etc. Thus MSG plays a critical role in the pathogenesis of

Shibprasad Mondal,, Assistant Professor, Department of Physiology, Uluberia College, Howrah

mammalian infertility[9-11,15].

Consumption of MSG within the range of 0.3 and 1 gram/ day has been reported from USA and Europe to be safe[12,15].

The estimated daily intake (EDI) of per capita MSG is calculated to protect against the most sensitive harmful effect and it is 550 mg/d in the United States in 1979.

A survey published in 1991 found in an average intake of 580 mg/d for the general population in the United Kingdom[13].

Pre-clinical studies revealed that repeated MSG induction may leads to asthma, cancer induced obesity, diabetes and oxidative stress along with severe weakness, muscle pain, headache, dizziness etc[14].

Toxicities such as hepatotoxicity, reproductive toxicity, genotoxicity, and renal toxicity as well as neurotoxic have been reported to accompany MSG intake. MSG ingestion also linked to Parkinson's disease, Alzheimer's disease, anxiety, stroke, depression and epilepsy[9-11,15].

However, studies on mice suggested that it is varied according to weight. Consumer protection agencies advise healthy persons to avoid consuming MSG frequently and encourage to consume antioxidants foods and drinks containing Vitamin-C, Vitamin-E, garlic, ginger, cheese, green tea etc. for minimizing the toxic effect of MSG[15].

Pharmacokinetics:

MSG, after entry in our body get dissociates into glutamate and sodium ions. Glutamate is one of the most important nonessential amino acid and abundant in the central nervous system that plays a vital role in mediating the cognitive function by acting on corpus striatum, dentate gyrus of hippocampus and cerebral cortex[16]. It is found that whole ingested glutamate is metabolized in the intestine and most of its carbon skeleton is converted to CO2 or consumed for the intestinal production of amino acids such as glutathione, alanine, arginine, lactate and so others. Besides most of its nitrogen is participated in the synthesis of proline, glutamine, amino acids of the urea cycle, and branched-chain amino acids and very little glutamate is absorbed into the portal vein[17]. The plasma glutamate level reached to its peak level within 80 min, when it administered orally at dosage of 30 mg/kg without any side effects[18]. Excessive daily intake of MSG causes an elevated plasma level of glutamate though it depends on some factors including dose, concentration and age. For example, an increase in the concentration of MSG in neonatal rats (from 2 to 10%) leads to five-fold increase in plasma[19]. It was found that doses of up to 1 g/kg of MSG do not significantly cross the blood–brain barrier[20]. It is reported that, the glutamate levels in the brain are much more higher than those in plasma of mice, rats, guinea pigs and rabbits[19]. From extensive studies it is found that plasma glutamate concentrations are 50–100 μM; while, they are 10,000–12,000 μM in whole brain[21].

Review:

MSG Induced Reproductive Dysfunction

Reproductive dysfunction means the malfunction of the reproductive tissues and disruption of hormonal balance leading to prolonged biological difficulty in reproducing their offspring. The adult male reproductive system consists of testes (the main reproductive organ of male that develop germ cell also called male gamete or sperm) with epididymis which is connected with penis via vas deferens and mainly responsible to transport the sperm for the fertilization of an ovum, leading to the development of an offspring. The women reproductive system includes the ovaries (main reproductive organ of female that develop germ cell or female gamete or ovum), fallopian tube, the uterus, the cervix and the vagina.

Germ cell develop in the testes and moves through the epididymis where they mature and gain motility. During copulation, sperm is released as semen into uterus (female reproductive tract) where capacitation (final stage of sperm maturation) takes place and the sperm is then ready for fertilization with ovum. So, they leave this place and move forward through fallopian tube and reach to ampulla of fallopian tube where ovulated ovum is presen[22].

MSG administration at different dose:

Numerous studies reported that continued consumption of this food additive leads to severe life threatening toxic effect on human bodies by enhancing oxidative stress. In case of reproductive dysfunction it was reported that 1. MSG at the dose of 120 mg/kg body weight on rat (Shin et al. 2010) and daily average intake (ADI) of MSG by human between 1200 and 3000 mg/kg (Brosnan et al. 2014) is harmful for male reproductive system[23].

2. MSG treated in adult wister rat at the dose of 0.08 mg/kg of MSG is cellular hypertrophy and degenerative changes in oocytes and granules of ovary[24].

Results and Discussion:

In this study, administration of MSG at the dose of 120 mg/kg body weight on rat (Shin et al. 2010) and daily average intake (ADI) of MSG by human between 1200 and 3000 mg/kg (Brosnan et al. 2014) is harmful for male reproductive system. This result show the loss of weight of testis, prostate, epididymis etc and decrease sperm count due to decrease of FSH, LH and testosterone hormones[23,25].

The histochemical studied in MSG treated adult wister rat at the dose of 0.08 mg/kg of MSG showed that cellular hypertrophy and degenerative changes in oocytes and granules of ovary. and these MSG induced animals are very much prone to infertility[24].

Discussion:

Glutamate receptors are present in different organs and tissues including endocrine glands, hypothalamus, testes, ovaries, thymus, liver and kidney. So, MSG-induced reproductive toxicity occurs via glutamate receptors[26,27,28].

Several investigation reported that the induction of reproductive injury by MSG in laboratory animals occurs in different modes e.g. oxidative stress, increase lipid peroxidation and ROS generation, histological alteration and hormonal imbalance.

1. **Oxidative Stress**

   The reproductive tissue are very much sensitive to ROS (unstable oxygen containing molecules that easily reacts with other molecules in a cell, called ROS or reactive oxygen species e.g. peroxides, superoxide, hydroxyl radical, singlet oxygen)due to presence of high adipose tissue. The abundance of unsaturated fatty acid and low level of antioxidants make the testes and sperm cells susceptible to oxidative stress. It has been revealed that after administration of MSG, the production of free radical occurs in high level that increase the lipid peroxidation and decrease the antioxidant activity (reduced glutathione, GSH) in testicular tissue leading to sperm membrane dysfunction, sperm DNA damage and impaired sperm movement and viability.

   In ovary, MSG induced the pathogenesis of anovulatory infertility, multiple degenerated follicles due to oxidative stress. [Figure 1] It is also observed a significant degenerative changes in the endometrial and myometrium layers of uterus in MSG exposed rat. Therefore, therapeutic agents such as antioxidants may be useful in reversing MSG-induced reproductive toxicity[1,23,26].

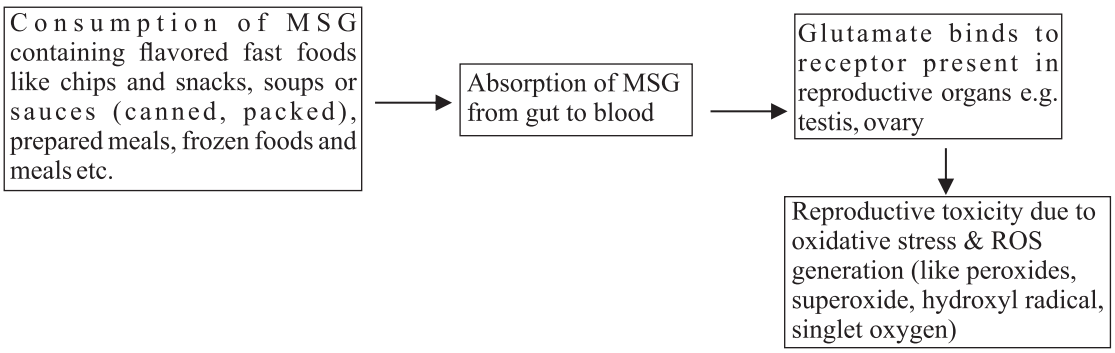

Figure 1: Receptor binding of MSG in testis and ovary and MSG induced reproductive toxicity.

2. Histomorphological alteration

From many studies on MSG-treated animals it is reported that alteration of histopathology such as spermatogenic arrest, low sperm production are common phenomenon because it is correlated with low level of testosterone production. Histochemical studies on mice it is reported that thedegenerative and atrophic changes also observed more profoundly in the oocyte and zona granulosa in ovaries in the groups treated mice with higher dose 0.08mg/kg of MSG[1,23-26].

3. Neurotoxicity and Hormonal imbalance

Glutamate, major component of MSG is a excitatory neurotransmitter of CNS. High consumption of glutamate results disruption of the hypothalamic-pituitary-axis pathway (HPA). HPA disruption may reduce the level of sex hormone, including testosterone, oestogen, follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. Spermatogenesis (process of sperm production) is totally depends on sex hormones and androgen dependent organs of the reproductive system. Membrane granulosa cells are also affected by MSG induced ROS and reduce estrogen level. Beside MSG induce mice also induce oxytocin level result strong uterine contraction. Any androgen hormone disorder will therefore have a negative effect on reproductive tissues as well as on spermatogenesis and oogenesis process[1,23-27].

Antioxidants and reproductive Health

Antioxidants are substances that prevent any cells from oxidative damage or against free radicals. Antioxidants includes vitamin C and E, vitamin –D, carotene, selenium, green tea etc. Antioxidants supplementation plays a crucial role to cure any type of reproductive dysfunction. It is found that any imbalance between the ROS and antioxidants results oxidative stress in gonadal tissue in both male and female and suppress gametogenesis. MSG increase this imbalance by decreasing the enzymatic and non-enzymatic antioxidants activity. Therefore, for good reproductive health daily antioxidants supplementation through diet is very essential[1,29-32].

Conclusion:

Finally it is concluded that MSG have reproductive toxicity in both male and female through various mechanism e.g. oxidative damage, histomorphological alteration, hormonal disbalance, reduce quality of gamete production in both male and female. It is recommended that the high dose

of MSG may leads to male and female infertility. MSG disrupt the antioxidants system by inducing the generation of free radicals. Thus consumption of antioxidants may support from oxidative damage of MSG induced reproductive tissue. Proper precaution must be adopted and MSG containing intake must be restricted and enough antioxidants must be included in our regular diet. Furthermore, the use of toxic colorant should be banned and solid steps must be taken against manufacturing company.

Acknowledgement:

I am thankful to my colleagues and all the resource persons and colleagues of FIP and RC course under UGC-HRDC, BURDWAN UNIVERSITY [AY-22-23] for the useful discussion regarding the review article, research methodology.

References :

1. Hajhasani, M., Soheili, V., Zirak, M. R., Sahebkar, A. H., &Shakeri, A. (2020). Natural products as safeguards against monosodium glutamate-induced toxicity. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*, *23*(4), 416-430.
2. Manal Abdul-Hamid, Sanaa RidaGalaly, *Rasha Rashad Ahmed and Hadeer Mohamed Hamdalla: Monosodium Glutamate as a Food Additive: Toxic Implications and the Protective Role of Quercetin, January 2018.
3. *InduKhurana, Textbook of Medical Physiology, 6th ed; ELSEVIER, A division of Reed Elsevier India Private Limited, 17-A/1, Main Ring Road, Lajpat Nagar-Iv, New Delhi-110024, INDIA; 2006; pp-[1212-1213].*
4. Kurihara, K. (2015). Umami the fifth basic taste: history of studies on receptor mechanisms and role as a food flavor. *BioMed Research International*, *2015*.
5. Wijayasekara, K., &Wansapala, J. (2017). Uses, effects and properties of monosodium glutamate (MSG) on food & nutrition. *International Journal of Food Science and Nutrition*, *2*(3), 132-143.
6. Ajibade, A. J., Fakunle, P. B., &Adetunji, M. O. (2015). Some effects of monosodium glutamate administration on the histo-architecture of the spleen and pancreas of adult Wistar rats. *Journal of Pharmaceutical and Biological Sciences*, *3*(2), 39.
7. Balkhi, H. M., Gul, T., Banday, M. Z., &Haq, E. (2014). Glutamate excitotoxicity: an insight into the mechanism. *International Journal of Advanced Research*, *2*(7), 361-373.
8. Butnariu, M., &Sarac, I. (2019). What is sodium glutamate and what effects it has on health. *Journal of Applied Biotechnology and Bioengineering*, *6*(5), 223-6.
9. Husarova, V., &Ostatnikova, D. (2013). Monosodium glutamate toxic effects and their implications for human intake: a review. *Jmed Research*, *2013*(2013), 1-12.
10. Niaz, K., Zaplatic, E., & Spoor, J. (2018). Extensive use of monosodium glutamate: A threat to public health?. *EXCLI journal*, *17*, 273.
11. Sharma, A. (2015). Monosodium glutamate-induced oxidative kidney damage and possible mechanisms: a mini-review. *Journal of biomedical science*, *22*(1), 1-6.
12. Henry-Unaeze, H. N. (2017). Update on food safety of monosodium l-glutamate (MSG). *Pathophysiology*, *24*(4), 243-249.

13. He, K., Du, S., Xun, P., Sharma, S., Wang, H., Zhai, F., &Popkin, B. (2011). Consumption of monosodium glutamate in relation to incidence of overweight in Chinese adults: China Health and Nutrition Survey (CHNS). *The American journal of clinical nutrition*, *93*(6), 1328-1336.

14. Zanfirescu, A., Ungurianu, A., Tsatsakis, A. M., Nițulescu, G. M., Kouretas, D., Veskoukis, A., &Margină, D. (2019). A review of the alleged health hazards of monosodium glutamate. *Comprehensive reviews in food science and food safety*, *18*(4), 1111-1134.*

15. Hajhasani, M., Soheili, V., Zirak, M. R., Sahebkar, A. H., &Shakeri, A. (2020). Natural products as safeguards against monosodium glutamate-induced toxicity. *Iranian Journal of Basic Medical Sciences*, *23*(4), 416-430.

16. Onaolapo, O. J., Onaolapo, A. Y., Akanmu, M. A., &Gbola, O. (2016). Evidence of alterations in brain structure and antioxidant status following 'low-dose'monosodium glutamate ingestion. *Pathophysiology*, *23*(3), 147-156.

17. Nakamura, H., Kawamata, Y., Kuwahara, T., Torii, K., & Sakai, R. (2013). Nitrogen in dietary glutamate is utilized exclusively for the synthesis of amino acids in the rat intestine. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*, *304*(1), E100-E108.

18. Rutten, E. P., Engelen, M. P., Wouters, E. F., Deutz, N. E., &Schols, A. M. (2006). Effect of glutamate ingestion on whole-body glutamate turnover in healthy elderly and patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Nutrition*, *22*(5), 496-503.

19. Boisrobert, C., Stjepanovic, A., Oh, S., &Lelieveld, H. (Eds.). (2009). *Ensuring global food safety: Exploring global harmonization*. Academic Press.

20. Caccia, S., Garattini, S., Ghezzi, P., &Zanini, M. G. (1982). Plasma and brain levels of glutamate and pyroglutamate after oral monosodium glutamate to rats. *Toxicology letters*, *10*(2-3), 169-175. Caccia, S., Garattini, S., Ghezzi, P., &Zanini, M. G. (1982). Plasma and brain levels of glutamate and pyroglutamate after oral monosodium glutamate to rats. *Toxicology letters*, *10*(2-3), 169-175.

21. Hawkins, R. A. (2009). The blood-brain barrier and glutamate. *The American journal of clinical nutrition*, *90*(3), 867S-874S.

22. Guyton, A.C. Textbook of Medical Physiology, Seventh Edition.; An HBJ International Edition. W.B. Saunders Company: Philadelphia, PA 19106; pp.[954-982]

23. Jubaidi, F. F., Mathialagan, R. D., Noor, M. M., Taib, I. S., &Budin, S. B. (2019). Monosodium glutamate daily oral supplementation: Study of its effects on male reproductive system on rat model. *Systems biology in reproductive medicine*, *65*(3), 194-204.

24. Eweka, A. O., &Om'Iniabohs, F. A. E. (2011). Histological studies of the effects of monosodium glutamate on the ovaries of adult wistar rats. *Annals of medical and health sciences research*, *1*(1), 37-44.

25. Fernandes, G. S., Arena, A. C., Campos, K. E., Volpato, G. T., Anselmo-Franci, J. A., Damasceno, D. C., &Kempinas, W. G. (2012). Glutamate-induced obesity leads to decreased sperm reserves and acceleration of transit time in the epididymis of adult male rats. *Reproductive Biology and Endocrinology*, *10*(1), 1-6.

26. Kayode, O. T., Rotimi, D. E., Kayode, A. A., Olaolu, T. D., &Adeyemi, O. S. (2020). Monosodium glutamate (MSG)-induced male reproductive dysfunction: a mini review. *Toxics*, *8*(1), 7.

27. Ismail, N. H. (2012). Assessment of DNA damage in testes from young Wistar male rat treated with monosodium glutamate. *Life Sci J*, *9*(1), 930-39.

28. Sharma, A. (2015). Monosodium glutamate-induced oxidative kidney damage and possible mechanisms: a mini-review. *Journal of biomedical science*, *22*(1), 1-6.

29. Al-Harbi, M. S., El-Shenawy, N. S., & Al-Weail, N. O. (2014). Effect of monosodium glutamate on oxidative damage in the male mice: modulatory role of vitamin C. *Adv. Food Sci*, *36*(4), 167-76.

30. Hamza, R. Z., & Al-Harbi, M. S. (2014). Monosodium glutamate induced testicular toxicity and the possible ameliorative role of vitamin E or selenium in male rats. *Toxicology reports*, *1*, 1037-1045.

31. Reham Z. Hamzaa,b, , Abd El-Aziz A. Diabb: Testicular protective and antioxidant effects of selenium nanoparticles on Monosodium glutamate-induced testicular structure alterations in male mice; toxicology reports; volume 7 2020, pages 254-260

32. Ali, A. A., El-Seify, G. H., El Haroun, H. M., &Soliman, M. A. E. M. M. (2014). Effect of monosodium glutamate on the ovaries of adult female albino rats and the possible protective role of green tea. *Menoufia Medical Journal*, *27*(4), 793.

Use of RFID Technology in College and University Libraries

Duranta Mistri

[Abstract : *As the size and number of documents of the library grow gradually, the problem regarding the maintenance and security of the documents also grows side by side. The experts in library and information science, researchers have always engaged to solve the problems of the librarians or library professionals. For proper arranging of documents they have made different classification schemes, for searching of documents they have made cataloguing codes and later Online Public Access Catalogue and the way to face and interact with the multimedia and social media for the upgradation of library services. Radio Frequency Identification (RFID) is such a technology which is now being used in college, university, research and other libraries mainly for maintaining the security of the documents. This paper presents the definition, components of RFID, RFID in Library Management System, the points should be in mind to install RFID, check points to choose a RFID manufacturer, advantages and disadvantages of RFID and the role of librarians for using and handling RFID in libraries*.

Keywords : *Radio Frequency Identification, Electro Mechanical (EM), Security Systems, Electronic Articles Surveillance***]**

Introduction :

Radio Frequency Identification (RFID) is the technology which identifies individual items automatically by using radio waves. The main objective of RFID system is to carry data through tags and retrieve the data hy machine readable forms at a particular time and place to satisfy the needs of the users. RFID technology is now widely used in industry and academic arena. Modern academic library is a store house of variety of documents likes books, e-books, periodicals, e-database, CDs, DVDs, online journals, etc. It is a challenge before the librarians to handle these variety of collections. As compared with Electro-Mechanical (EM) and Radio Frequency (RF) systems, RFID-based system is a combination of security and efficient tracking of library documents, whereas both EM and RF is used only for security.

Definition of RFID

RFID stands for "Radio-Frequency Identification" that refers to modern technology whereby digital data is encoded in RFID tags or smart labels are captured by a reader via radio waves.

Components of ARFID

RFID consists of three components which include :

The RFID tag or smart lavel

RFID reader

Antenna

RFID tags transmit data to the RFID reader, converting the radio waves to a more unstable form of data. Thus, the tags information collected is used to transfer to the host computer system, where the data is stored in a database and analysed later. A tag is constructed of a silicon microchip and is

Duranta Mistri, Librarian, Uluberia College, Howrah

etched with an antenna. Besides, RFID label printer, handheld reader, self-check unit, external book return, staff and conversion station are the components.

RFID systems are used across different industrial sectors like construction, engineering, chemical industry, manufacturing, retail etc.

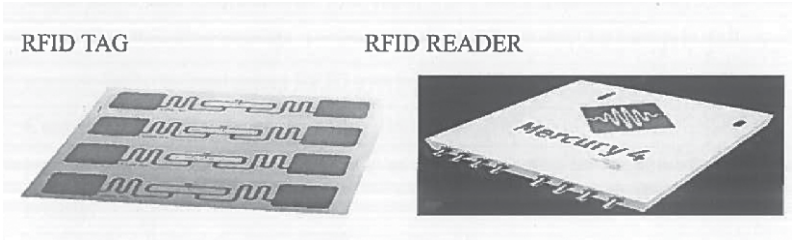

RFID in Library Management System

1. Book Drops : The book drops can be situated in any place inside the library premises. It facilitates the users to go back the documents they borrowed at any time within the library hours.
2. Anti-theft Detection : RFID library management system acts as an anti-theft detector. RFID gates comprises an alarm system with sound and light that alerts the library staff that someone carries book or documents without issuing.
3. Shelf Management : The system has a mechanism of shelf management. It can easily identify any misplaced documents in the library. It reduces the time taken in the process of stock verification and also reduces the cost of inventory.
4. Patron self-check-out station : The station is built with computer with touch screen and a built- in reader in it.
5. RFID Transponder or Tagging : Tagging is actually an important link in RFID system. It can store the bibliographic information of any item.

Things to See or Remember While Transitioning to RFID for your Library:

An efficient and modern library should have the RFID system in it. During the steps to install RIFD system the following points should be in mind :

Inventory Assessment : Inventory assessment is an essential work to identity specific requirements of any library. This will help the authority to choose the exact RFID system.

Staff Training : Staff training is necessary before installing RFID system in the library. It will ensure to get the overall effectiveness of library services.

Integration with Existing Systems : The existing system of the library management system should be properly integrated with the newly installed RFID technology. Seamless integration will prevent operational disruptions and enhance overall functionality.

Cheek Points to choose a RFID Manufacturer

Successful implementation of RFID system depends upon the selection of the accurate RFID manufacturer. The following points is to be considered for this :

Experience and Reputation : The experience and reputation of the RFID manufacturer is very important. Previous records, reviews, testimonials should be properly followed before giving the responsibility to implement RFID system.

Customization Opions : It is important that there should be more than one options to get the customized solutions as per the need of the library. The RFID manufacturer should have the said quality.

Support and Maintenance : To run the RFID system effectively, the support and maintenance services of the manufacturer is very urgent. A prompt response of the manufacturer regarding the support and maintenance is crucial.

Advantages of RFID Technology

Use of RFID technology in library is essential in modern library management system. Due to the following advantages we use RFID system in our library.

1. **Time saving** : Manual check-in/out of documents takes more time than RFID system. RFID also allows the librarians to handle multiple transactions effectively and enhance the pace of overall library services.
2. **Accurate data management** : RFID facilitates data analysis, patron preferences, status of documents. It helps the librarians in decision making for collection development and provide resources as per community needs.
3. **Improved security** : RFID system has the built-in mechanism to read the data. It also maintains the security of library documents.
4. **Better shelf (Stock) management** : RFID system enables in better stock management by continuous tracking and monitoring library materials and easy identification of misplaced items.
5. **Labour savings** : It is common that use of RFID technology decreases the time needed for circulation duties than the usual and ultimately saves labour.
6. **Cost Saving in the Long-Run** : Though the initial cost of installing IFID is very high, it may be cost effective in the long run.
7. **Improved Circulation Process** : The automated system of RFID system makes the circulation tasks easier. Librarians can quickly scan multiple documents at a time and get updates of each in the library.
8. **Master Card Functionality** : The speciality is that one RFID card can be used for different kinds of locks. It helps the users to use the proper card for accessing different locks.
9. **Convenience** : It only takes a fraction of a second to put an RFID key in the proximity of the reader to open the lock. The procedure is highly convenient and fact.
10. **Size** : RFID cards are convenient and easy to store. The card is handy and looks like a regular bank card.
11. **Reliability** : RFID is highly reliable in theft detection. Since RFID tags and sensors communicate with the Integrated Library System (ILS). It is possible to know the items check out.
12. **Durability** : RFID system is durable and work in the sun and rain.

Disadvantages of RFID

RFID system has tremendous utilities which makes it popular. But cannot escape from the threat of disadvantages as listed below :

1. **High Cost** : Installation of RFID is very expensive, Small library cannot afford it. Only the library with much find can install it.
2. **Tag collistion** : RFID tags work through radio waves. These radio waves can be blocked. Then the entire system stopped from working efficiently. Unfortunately, this is easily accomplished by wrapping the tag in aluminium foil. Since most tags are fixed to the inside of the back cover, those who desire, could remove the tag. Tags can be inserted into the spines of the books, however not all tags are so flexible, and this does not address the issue of tags on CDs or DVDs.

3. **Reduction of staff duties** : Use of RFID technology reduces the duty of the staff as well as the number of staff.
4. **Power Shortage Issue** : During power shortage RFID systems may malfunction causing some lockers to either shut you out or worse leave the lockers open where people may try to steal what is inside.
5. **Lost Key card** : The problem is like traditional lock and keys. If we can forget or misplace our key card, we have to try to figure out how to open our locker and tracing back out step to find the key card.
6. **Not to Totally Hassle-Free** : Users have to change their computer clock manually twice a year. This is required if the server computer is not connected to the internet or if there is a time-based access restriction.
7. **Hacker Alert** : The RFID system can be hacked by the person having a good knowledge and understanding of modern technology putting a question mark in so called security.
8. **Implementation can be different and time consuming** : It takes time for new implementation of RFID technology.
9. **Standards** : There is an emerging standard for library RFID solution to employ a frequency of 13.56MHz. No formal standards are not available presently.
10. **Security Feature** : The same RFID tag is used in two ways - to manage inventory and to protect documents from theft. Current technology provides options to choose between a purely RFID solution or RFID with an electro-mechanical feature for theft.
11. **Anti-Collision** : All RFID vendors in the Library market offer a product with anti-collision facility. However, the speed and the number of tags that can be read, will vary. This relates to Inventory management with a hand-held reader and check-in process.
12. **Tag Memory Capacity** : It completely depends upon the price and data transmission speed.The point is to be considered what information we want to program in each tag and then discuss with vendors.
13. **EAS (Electronic Article Surveillance)** : As mentioned above, RFID can be used to prevent theft in the library. This approach varies from vendor to vendor –-the security mechanism may be integrated in the clip itself, or security gates may be linked to a separate server, which interrogates the database to conclude whether an alarm needs to be triggered.
14. **Removal of exposed tags** : The RFID tags cannot be concealed in either spine or gutter of the books and are exposed for removal. If a library wishes, it can insert the RFID tags in the spines of all except thin books, however, not at all, RFID tags are flexible enough. A library can also imprint the RFID tags with its logo and make them appear to be bookplates, or it can put a printed cover label over each tag.

Role of Librarian

RFID technology is very important at present in library services as well as a challenge for the librarians to handle it. The improved technology of RFID allows the users in the self-check-out of library documents, it also allows the more use of efficent professional staff, and may reduce mental stress of library workers. Though, the technology has the threat of hot listing and tracking library patrons, college or university librarians have to take extra steps to trace the way of solving the problems. They have to know, if there is any law or government rules to protect the privacy of their patrons and yet many of those same libraries are placing traceable chips on their patron's books.

Conclusion :

RFID can be used in library in various ways like book borrowing, monitoring, books searching processes and the library staff can keep themselves free to do more user-oriented tasks. But the RFID readers and tags vary with different vendors and it may impact on the performance. The efficient utilization of the technology also depends upon the information to be written in tag-College and university librarians have to study the whole RFID related facilities, advantages, disadvantage etc and apply the best possible ways in their libraries. Then the use of RFID technology to yield larger memory capacities, wider reading ranges and processing will be more fruitful.

References :

1. Pandey, Prabhat & Mahajan, K.D. Application of RFID Technology in Libraries and Role of Librarian.
2. Dhanalakshmi, M & Mamatha, Uppala, RFID Based Library Management System.
3. Sateesh Kumar H C, (2020), RFID Library management System, International Journal of Engineering Science and Technology p. 111-15.
4. https:/taylordata.com/rfid-advantages-and-disadvantages/
5. https:/www.peaktech.com/blog/rfid-vs-barcode-comparison-advantages-disadvantages/
6. www.google.com
7. Rani, Seema. Implementing RFID in Library - Methodlogies, Advantages and Disadvantages. International Journal of Lib raryy and Information Studies, Vol-7(4) Oct-Dec, 2017 ISSN : 2231-4911 pg 167-171.

Impact of In-service Teacher Trainings on English as Second Language ClassroomTeaching

Ghazala Nehal

[Abstract : *The paper qualitatively content analyses the impact of Bengali Medium teachers' in-service training experiences on their English as Second Language (ESL) classroom teachings. Recorded-interview data was coded to find out in-service training objectives as well as the constraints, preventing new pedagogical skill transfer. Content analysis showed training contents are not tailored as per grassroot level requirements of ESL pedagogy. Problem areas go unaddressed further due to non-collaboration, teacher's unaccountability and absence of follow-up sessions. Thus, though on personal levels, in-service trainings are able to alter teachers' 'belief system', on professional levels, it has minimum impact on class teachings.*

Keywords: *In-service Teacher Training, English as Second Language, Pedagogical skills, Qualitative Content Analysis***]**

Introduction :

In-service teacher training programs endeavour to change a teacher's 'belief-system' in order to improve class practices. The concept of classroom teaching has evolved with time and so has the role of teachers.Being a 21st century teacher, it is hence important to realise how our roles have shifted from being the one who stands on the pedestal to 'teach' the 'ignorant' to the one who 'facilitates' learning. In-service teacher education provides teachers with those moments for self-updating in the altered fundamentals of classroom teaching. As per National Curriculum Framework for Teacher Education (2009), in-service teacher training programs have the following functions: (1) updates teachers on latest pedagogies and subject-contents (2) professionally advances serving teachers, (3) orients teachers to new roles and technologies. "However, the reality is far from this." (Kidwai, *et. al.* 2013).

Review of In-service Training Experiences

Policy for teacher training at both primary and secondary levels in India was institutionalized during the colonial period. The first formal teacher training school in India was established at Serampore in Bengal in the name of Normal School by Carey, Marshman and Ward 1793 which catered to primary education. In 1882, Hunter Commission first recommended teacher training curriculum covering both theory and practice and also proposed one-year training for Secondary school teachers. Significant development occurred in 1884 when first one-year degree courses in Teacher Training were offered as Licentiate in Teaching (L.T.) and Bachelor in Teaching (B. T.). In 1906, the first secondary teacher's training institute was established in Bombay, followed by David Hare Training College in 1908 and Dhaka Teachers' Training College in 1909. The term training has a narrower perspective as pointed out by Kilpatrick much earlier when he said, "Training is given to animals and circus performers, while education is to human beings." Teacher Education thus is the more appropriate way to approach this field. After independence, Kothari

Ghazala Nehal, Assistant Professor, B.Ed. Section, Uluberia College, Howrah

Commission (1964-66) undertook to revolutionize Indian education and their aspiration is reflected in the first sentence of its report "The destiny of India is being now shaped in her classrooms." It recommended that teacher education programs should be of two years duration. National Education Policy, 1986, also emphasized on strengthening teacher education program and integrating technology. In the last decades of the 20th century, National Council of Teacher Education was entrusted as a regulatory body to recognize teacher education institutions of the country, alongside the Universities whose power was curbed. As we have moved into the 21st century, we see a rapid mushrooming of private teacher training institutions across India. There are about eleven thousand institutes in India which offer B. Ed colleges. In most states, more than 90 % are private institutions. Odisha, a good example, is the only state where there are no private institutions. On the other side, in West Bengal, only 50 out of 681 are public institutions. As for schools, there are 15 crores schools in India which need properly qualified teachers equipped with teaching skills, sound pedagogical theory and professional skills and so there should be proportionate number of teacher education institutions. Existing literature is unanimous in observing the potentials of in-service teacher training programs as well as the incongruence, existing between training programs and classroom practices. Studies have revealed how a teachers' pre-training concepts about teaching profession and subject pedagogy have undergone post-training "belief development" (Rao, 2019), "change in motivation" (Ashrafuzzaman, 2018) and advancements in pedagogical "knowledge and skill" (Kidwai, *et. al.* 2013). However, changes in teachers' pre-training belief system have not improved classroom practices. According to Sim (2011), two constraints were identified: (i) disproportionate class size; and (ii) student diversity in cognitive levels. According to Kidwai *et. al.* (2013) "budget constraint", "lack of teacher's motivation" and "lack of local participation in the decision-making regarding teacher training" have hindered the implementation process. Ashrafuzzaman (2018) observes "lack of support from authorities", "lack of supervision and monitoring", rush to complete the syllabus, "huge burden of duty and not getting gap between classes" as reasons for the incongruence. Fullan (2007) observes how lack of follow-up programs demotivate knowledge and skill transfer. The present study agrees with the above observations and makes further insights into the incongruence, mostly in the context of ESL (English as Second Language) pedagogy.

Background of the study

State-aided in-service teacher trainings are mostly planned by Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and operated through respective Sate Council of Educational Research and Training (SCERT). Once the in-service training contents have been designed, it is dispatched by SSA to respective SCERTs. The SCERTs then selects and trains resource personnel. The SCERT, next, entrusts the District Institute for Education and Training (DIET) to conduct the workshops through the resource personnel. These in-service workshops, on the occasions of new syllabus, can be on subject pedagogy;or, based on some new policies, have a general approach to the teaching profession. These trainings take place district wise in the respective DIETs and can last for a week or for just two days. However, despite its promising nature, the "quality of in-service teacher training in India has repeatedly failed to match the expectations that have risen with the introduction of new textbooks and policies." (Kidwai, *et. al.* 2013). The present study, thus, aims to qualitatively explore the constraints to new pedagogical skill transfer but only from the perspective of ESL (English as Second Language) pedagogy as practiced by Bengali Medium teachers of West Bengal.

Significance of the study

Existing literature is unanimous in observing the potentials of in-service teacher programs as well

as the incongruence that exists between the programs and classroom practices. Studies have revealed how teachers' pre-training concepts about teaching profession and subject pedagogy have undergone post-training "belief development" (Rao, 2019), "change in motivation" (Ashrafuzzaman, 2018) and advancements in pedagogical "knowledge and skill" (Kidwai, *et. al.* 2013). However, changes in teachers' pre-training belief system have not improved classroom practices(Fullan, 2007; Sim, 2011; Kidwai, 2013; Ashrafuzzaman, 2018). The present study becomes significant in its endeavours to understand the causes for the incongruity. The study can contribute to the development of SSA's in-service training program designs. Although the study focusses on classroom application of in-service training experiences only of Bengali Medium teachers, teaching English as Second Language, the study's findings can be relevant to similar studies on the impact of in-service programs on other school disciplines, delivered through other Medium of Instruction.

Research Question

Why, in spite of having numerous in-service workshops on ESL pedagogy, the quality of ESL classroom teaching continues to be unimpressive?

Research Objectives

The study endeavours to find out

1. In-service teacher training program objectives for English as Second Language (ESL) pedagogy in West Bengal
2. Classroom application of teachers' in-service training experiences

Methodology

Being it a qualitative study, 25 Bengali medium teachers, teaching English as Second Language were sampled by means of *purposive sampling technique* and were interviewed through a standardized interview schedule. Participants' words, audio-recorded with due permission, were transliterated (as they spoke in Bengali) and translated to English for qualitative content analysis through data coding. The coding process included two cycles of coding – in the First Cycle, initial codes were extracted from the data corpus by means of *In vivo &Descriptive coding techniques*. The initial codes were, next, grouped into categories & sub-categories by means of *Pattern coding technique* in the Second Cycle Coding (the categories & sub-categories have been treated as headings & subheadings in the preparation of the final research report). Next, the categories and subcategorieshave been synthesized into a theme – the theme, based on the codes extracted from the data, is actually a one-line response to the research question. The Theme has been finally elaborated upon through key assertions made by the researcher under each of the categories & sub-categories in the final research report.

Key Assertions

The present study finds that that in spite of having in-service workshops on ESL (English as Second Language) pedagogy round the year, the quality of Bengali medium ESL classroom teaching continues to be unimpressive.Hence, the *theme* extracted through content analysis was that:*There is negligible impact of in-service training experience on ESL pedagogy.*

The *theme* has been elaborated under two categories as per the two research objectives.[Discourses under each of the categories have been validated with participants' own words (as translated)]

Category 1: **In-service teacher training program objectives for ESL pedagogy**

The present study finds that in-service teacher training program objectives for English as Second Language (ESL) pedagogy in West Bengal are:

1. **To develop student-centric attitude towards lesson delivery**

   Given the 'fear' that students often exhibit towards English language, in-service workshops aim teacher-trainees to have a positive attitude towards students. A participant shares, "*There was a language-oriented training, I remember, where they said not to say, "You have answered wrong!", instead the teacher is to straightaway say what should have been said, instead.".*

2. **To train in judicious use of Bengali in ESL classes**

   Another area that in-service trainings have focussed is judicious use of Bengali in ESL classes,a participant shares, "*In these trainings we are asked to reduce Bengali usage and gradually move towards use of more English words during English classes".*

3. **To train inthe latest CommunicativeTeaching Methods**

   These workshops often promote empowerment of language teachers through training in the latest methodologies for lesson delivery like the "*ICON (Interpretation Construction) model"* or on a "*new evaluation system – the PEACOCK model."* - asinformed by the participants.

***Category 2*: Negligible classroom application of teachers' in-service training experiences**

The present study finds that, although the in-service training objectives are noble and student-centric, classroom application of newly acquired skills is negligible because:

1. **Non-collaboration between programmer-designers and teachers**

   Program designers who plan the training contents, do not take inputs from the teachers, teaching English at the grassroot level. It is echoed in one of the participant's complain, "*Nothing progressive about the workshops. Very much mechanical. They are not interested in listening to the teachers."*

2. **"Not rooted in reality"**

   Interviewed participants were unanimous in observing that although the program contents are rich, updated & child-centric, yet"*they are not rooted in reality*" because, as one of the participants observed, "…*in these trainings new ideas are shared but ultimately the resource people do not enter into the problem area…"*

3. **Poor learning environment**

   Poor learning environment with minimum English language input makes implementation of advanced English language teaching methodologies, viz. the ICON and PEACOCK Models of teachingvery difficult because these modelsrequire high levels of teacher-student communication in the target language.

4. **Inadequate English language proficiency**

   Inadequate English language proficiency among students and teachers is another reason for inapplicability of the newly acquired skills. For instance, one of the objectives of these in-service workshops has been to train teachers in less use of vernacular in Second

Languageclasses. But f English language proficiency of teachers themselves is poor, the training objectives cannot be met.

5. Inadequate human resource

Inadequate human resource overtaxes time and energy of available teachers. One of the participants observes, "*No, it has not been practicably possible…There is shortage of teachers, and environment of school premises is not at par".* If one teacher is being over burdened with classes, he/she will neither have the energy nor motivation for innovative lesson plans.

6. No monitoring system

Lack of a monitoring system makes teachers unaccountable for their classroom activities, as one of the participants shares, "*...often teachers are not interested in applying their training experiences, had there been a body to supervise then the pressure to perform could have pushed the teachers to apply their training experiences.".*

7. Disproportionate teacher-student ratio and irregular students

New knowledge application is difficult in massive class population with irregular students, one of the participants shares,"*I have tried to apply the PEACOCK model for Formative Evaluation but if you have 80 students, it is difficult…(besides) if they don't attend class daily how will I evaluate whether they have empathy or whether they cooperate with each other.".*

Conclusion

There is, thus, an incongruity between in-service program objectives and their classroom applications. If teachers are not applying their acquired pedagogical skills, then, no matter how updated the in-service programs are, they will be ineffective. Local participation of teachersin the decision-making and course-designingis needed so that real problems can be addressed. Schools, sending teachers to these in-service courses, must also see that resources are available for new skill implementation. The supervision and monitoring of new knowledge application must be taken up by the institutional head as a part of his/her leadership skills. Non-collaboration between program designers and program implementers as well as between the newly trained and institutional heads have reduced these in-service teacher education programme to be a mere formality of a required certification; or, in the words of a participant, these "*in-service trainings are often like rituals…a welcome break…",* without having any real-life usefulness.

Reference :

1. Ashrafuzzaman, M. (2018). *Impact of in-service training on English teachers' classroom practice at primary level*. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(3), 77-103.
2. Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4th ed.). New York and London: Teachers College Press, Columbia University.
3. Kidwai, H., Burnette, D., Rao, S., Nath, S., Bajaj, M., & Bajpai, N. (2013). *In-service teacher training for public primary schools in rural India findings from district Morigaon (Assam) and district Medak (Andhra Pradesh).*
4. Rao, S. P. Dr. (2019). *The impact of teacher training in English language teaching on the learners' learning.* Journal of English Language and Literature 6(4), pp. 68-79. https://www.researchgate.net/publication/338197249_The_impact_of_teacher_training_in_english_language_teaching_on_the_learners'_learning. Accessed on 30th December, 2022
5. Sim, Y. J. (2011). *The Impact of In-service Teacher Training: A Case Study of Teachers' Classroom Practice and Perception Change*. Published Thesis, University of Warwick.

Women's Question :
William Carey and The Serampore Baptist Mission

Dr. Jayashree Sarkar

[***Abstract*** : The focus of this paper is to look intently on William Carey and his Serampore brethrens' missionary efforts and hearty persistent endeavors to ameliorate the condition of women in India, suffering from the then inhuman social practices. Their role had attributed in creating an impetus for a series of social reforms.

Key words : Antahpur, Bhadralok,Pundits, Sati, Zenana]

Since the end of Governor-General Warren Hasting's tenure, there was a gradual move on the part of the colonial government, towards a cautious intervention in Indian social institutions. What contributed to this shift were several ideological influences in Britain such as Evangelicalism, Utilitarianism and free trade thinking. But the East India Company's government was still tentative about interfering for fear of adverse Indian reaction. It could not do so unless a section of the Indian society was prepared to support reform. Such a group that would support wide ranging social reforms in India was soon to emerge through the introduction of English education. To Charles Grant who served as the Chairman of the British East India Company and a Member of Parliament as well as a part of Evangelical Anglican movement, the real hegemony of the British could be established in India through a display of the superior moral and ethical values of the West as manifested in its Christian heritage. Christian instruction was the best guarantee against rebellion, as it would rescue the natives from their polytheistic Hinduism and make them parts of the assimilative project of colonization. But even so, the missionaries still remained banned from entering India till the early years of the 19th century. Despite the ban, the missionaries continued to use various ingenuous means to arrive in India and work for the dissemination of western education, which they believed, would lead to proselytization. The Serampore Danish settlement became towards the end of the 18th century,the workplace of three Baptist missionaries- William Carey, Willam Ward and Joshua Marshman along with Hannah Marshman.

Born on 17th August 1761, William Carey had a humble origin in Paulerspury in England. His father was a travelling weaver who later became a school teacher and parish. He became the 'Father of Modern Missions'. He infused new life force, vigor and gave direction to the Protestant movement. He earnestly believed that Christianity must be firmly rooted in the culture and traditions of the land in which it was placed. He preached Gospel along with the morals and human values of Christianity. There lay his success. Overriding the various hurdles as were common in a different socio-cultural and religious conditions, his steady and persistent efforts in the long run, bore fruits. The influence and interactions of the Serampore missionaries had a positive effect on the progressives, accepted in the then 19th century social milieu of Bengal such as Raja Rammohun Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, members of Brahmo Samaj, Young Bengal as well as the conservative Raja Radhakanta Deb of Shovabazar. Thus, David Kopf thinks that the middle class

Dr. Jayashree Sarkar, Associate Professor, Department of History, Uluberia College, Howrah

educated elites 'bhadralok's undoubtedly found truth in the Christian missionaries' criticism of Hindu socio-religious customs and traditions.

To Carey, unless the culture, the people and along with it, the entire world transform into a new thinking, the entire mission of modern mission would be in vain. J. B. Middlebrook describes that Carey was a person who sought to change the world in which he lived, for the better. The society, religion and culture were evaluated and encountered by their own understanding in the prism of morality, humanism, utilitarianism and positivism. It would result in creating an ambience of better understanding and new outlook. K. S. Latourette observed that Carey seems to have been the first Anglo-Saxon Protestant either in America or in Great Britain to propose that Christians should take concrete steps to bring their Gospel to all human race. With sincere cooperation of the Baptist Ministers of Northamptonshire like Andrew Fuller, John Ryland, John Sutcliff and such others, Carey's dream of founding the Baptist Missionary Society was fulfilled in 1792 after the publication of his celebrated work 'An Enquiry into the Obligations of Christians'. Dr. John Thomas, a ship's surgeon, who had been in Bengal for many years, convinced Carey and others for the need of missionaries in Bengal. On 11th November 1793, Carey with his family reached Bengal. Basil Miller writes that Carey used to take delights in visiting remote corners of Bengal, devoid of basic amenities, to preach the teachings of the Bible among people who had never heard of Jesus Christ, before. He realized that long practiced social usages were so deeply rooted in the social norms that they could not be erased easily by legal means. So to effect a transformation and acceptance, he took recourse to spreading the message of the Bible.

In 1799, the Mission Society sent Joshua Marshman (along with his wife and children), William Ward, William Grant and John Bransdon to join William Carey in the mission work.Carey joined them on 10th September 1800 at Serampore. He announced the foundation of the Serampore Mission. The 'Serampore trio'- William Carey, William Ward and Joshua Marshman from then on became the prime focus of the Serampore Mission activities. Of course, Hannah Marshman's meaningful contribution should be remembered, along with William Carey, William Ward and Joshua Marshman, in all the humanitarian endeavors undertaken by the Serampore Mission. Carey used to think, as he wrote to Fuller that it was absolutely necessary for the wives of the missionaries to be enthusiastic and co-operate their husbands in their work. Carey observed that Hannah, being the wife of Joshua Marshman, had the essential characteristics of a missionary's wife in carrying out evangelical work.

The long practiced social customs and abuses in Hindu society such as female infanticide, child marriage, Sati rite (immolation of widows in the funeral pyres of their dead husbands), rigors of widowhood, kulin polygamy, denial of education to women and other forms of abuses concerning women, took the centrality of attention of the missionaries. The relentless struggles of the Baptist Missionaries for the abolition of the practice of Sati rite, they considered, would subsequently give a woman her right to life. Carey viewed empowerment when a woman would have the opportunity to education.

During the years between 1799 and 1800, Carey tried his best to convince women not to become a 'sati', but he did not meet success as the custom was deeply ingrained in their perception. In 1803, the SeramporeMission appointed some Bengali men to make a survey of the 'sati' cases within thirty miles radius of Calcutta. Even though the eastern and western coasts of the Ganges were not taken into consideration, Ward found in the Report there were 438 sati cases. Next year, ten agents

were appointed to furnish monthly reports of the performance of 'sati' rite. The number appeared to be 300. In 1804, Carey sought the help of some 'pundits' of the Fort William College to enquire about the Hindu scriptural sanctions behind the 'sati' rite. What came out of the search was that the 'sati' rite was only a choice of free will and not an obligatory ritual. He received immense help from Mrityunjay Vidyalankar, Head Pundit of Bengali Department of Fort William College, who wrote against sati even before Raja Rammohun Roy.Mrityunjay's tract became the unacknowledged starting point for Rammohun's anti-sati campaign.Thus, fortified with the irrevocable evidence, Carey prepared an appeal for the abolition of this inhuman practice and sent to Governor-General Wellesley. Besides, the Serampore missionaries took initiative to abolish this practice. In 1803, they sacked a Brahmin employee of the Mission for lighting the pyre connected with 'sati' ritual; the victim was his sister-in-law. Even they tried to garner public support against this practice in England. On March 1812, they published a report on 'sati' cases, reflecting their concern of the prevalence of this rite. Rev. Claudius Buchanan handed a pamphlet on 'sati' prepared by Serampore missionaries and other contemporary social reformers to William Wilberforce, a British philanthropist and a leader of the movement for the abolition of slave trade. The facts were duly utilized during the debates on Charter Act in the British Parliament during 1812-1813.From 1818, their publication Samachar Darpan and Friend of India used to launch vehement attack on 'sati'; especially articles on anti-sati rite in Friend of India created a stir in government circle. During his visit to England in 1820, William Ward held meetings with distinguished public figures and requested them to persuade the British government to enact laws for abolition of this barbaric rite. Healso cited from Rammohun Roy's pamphlet on 'sati'. Thus the activities of the missionaries and the challenges they posed to the prevalent social customs, indirectly helped the cause of reform. S. Natarajan thinks that the fear of the Christian missionaries saw the beginning of much social wisdom among the Indians. It required the challenge of the Christian missionary activities to rouse Bengal from the slumber to eradicate social evils, especially 'sati' which was widely prevalent in Bengal. They had kept the issue of 'sati' in the conscience of the people both in India and Britain and helped indirectly to organize a Hindu response which as an internal force had played an important part in terminating this rite. Along with the missionary endeavor of first attacking this institution, it should be admitted that it was a strong abolitionist campaign under and persistent effort of Raja Rammohun Roy that gave the movement its real momentum. Finally success came when the Act , Regulation XVII, banning 'sati' rite, as criminal and punishable by law in criminal courts, was passed by the Governor-General William Henry Cavendish Bentinck on 4th December 1829.This regulation could not be overturned by a Hindu petition from the anti-abolitionist Dharma Sabha of Raja Radhakanta Dev of Shovabazar, to the Privy Council in 1830. Carey on 6th December, on a one single day, translated the whole Act into Bengali. Carey's concern was that his delay to translate and publish even by an hour, would lead, in the meantime, sacrifice of a widow. Earlier, the Governor-General in his 'Minute on Suttee' dated 8th November 1829, put forward Carey's concern for this practice- “Having made enquiries how far suttees are permitted in the European Foreign Settlements, I find from Dr. Carey that at Chinsurah no such sacrifices had ever been permitted by the Dutch government. That within the limits of Chandernagore itself, they were also prevented but allowed to be performed in the British territories. The Danish government of Serampore had not forbidden the rite in conformity to the example of the British government.” Thus, William Carey and his Seramporebrethrens initiated a movement inspired by the ideals of humanism and utilitarianism. They realized the necessity of total dedication for achieving such ideals. The Christian community of Calcutta expressed their gratitude, to the Government, for passing of the Act, banning Sati –“We, the undersigned Christian inhabitants of Calcutta, beg

leave to offer to your Lordship our warmest thanks and congratulations on the passing of a regulation for suppressing the inhuman practice of burning widows on the funeral piles of their deceased husbands, immolation which outraged the tenderest feelings and strongest ties of nature,"

The women of the late 18th and early 19th centuries Bengal led miserable existence with no opportunities to education. Various social taboos were attached with education of girls. Women's status became the main focus of the reforming activities of the missionaries as well as the educated Indians. The missionaries were the pioneers of schools for girls in Bengal,an important landmark in the history of education in Bengal. Though schools for non-European, indigenous girls were opened by other missionary societies prior to the Serampore Missionaries, Hannah Marshman had long before was determined to open schools in Serampore to impart education to indigenous girls in the vicinity. She had been visiting indigenous families, from the time of her arrival at Serampore, to convince them of the necessity of female education. But apprehending strong social opposition, she could not materialize her plans to set up girl's schools, earlier. While in England she along with William Ward made every effort to enlist adequate support for their future plan of opening girl's school in Serampore. Ward's address was criticized in the Asiatic Journal of February 1821. But Joshua Marshman in his article on female education, published in the quarterly series of 'Friend of India' defended Ward on the necessity of female education, based on the information collected, personally, by him. Ward's effort was able to create a stir, particularly among the English women and thus support poured in for such a noble effort. Meanwhile Hannah's determination to open girl's school became firm as she too was able to garner support in this cause. The strong desire is explicit in her letter dated 21st February 1821 to her husband.

After their return to India, Ward, Hannah and John Mack took the lead in organizing female schools in Serampore in 1821. The schools would serve the poor families.The focus should be on sound and good knowledge in elementary education, history, science, geography, mathematics in addition to three R's. There should be a proper blending of foreign and local elements in education as well as special emphasis on teaching English and Bengali grammar. Scriptural studies were also included. Due to inclusion of scriptures in the curriculum, the endeavors did not find ready acceptance of the indigenous society. The popularity was somehow checked. It should be also mentioned that the initiative of the Christian missionaries evoked a reaction in the Hindu society. Some students of the Hindu College did not support the content of teaching adopted by the missionaries especially the selection of Christian religious books. Though an ardent believer of female education, Prasanna Kumar Tagore was a critic of the missionary efforts and published his views in 'Reformer'.Still the local people of Serampore were not hostile to this noble cause. As reported in 'Samachar Darpan' of 10th April 1824, many came forward to patronize. At the residence of Babu Gopal Chandra Mallick, examination was held on 5th April 1824. About 230 examinees came from 13 schools in Serampore and adjoining areas. Among them 50 girls read out the words, 35 girls recited while the rest were examined for correct spellings. The duration of the examination was for two hours. Many ladies and gentlemen of the European community were present thus creating enthusiasm among the students. The Serampore missionaries received wide applause from the European community for their endeavor. Prizes in the form of cloth, pictures, money, sweets were awarded to the examinees. An exhibition on handicrafts was held on products such as stockings, handkerchiefs etc. made by the students. A year later in 1925, more than 300 students of different schools of Serampore appeared in the examination at Serampore College Hall. The number of students increased gradually which reflects gradual acceptance of the

Mission's work, relating to female education. Missionary Intelligencer in its February 1828 volume published a detailed report of girls' schools in Serampore. The grants for running the schools under SeramporeMission poured in from various places of Great Britain. As such the schools were named after those from where the aids came such as Liverpool school, Chetham Union, Cardiff school. Within Serampore, there were 13 schools with 250 girl students, 6 schools in Birbhum 44 students, 5 schools in Dacca with 100 students, 3 schools in Chittagong with 77 students. Serampore Mission school was set up each at Benaras, Allahabad, Jessore and Akiyab. Overriding various constraints in the form of passing away of important missionaries, natural calamities, financial hardships and separation from the Home Committee, the work continued. The death of William Carey on 9th June 1834 was a great blow.

Jogesh Chandra Bagal says that the Serampore Baptist Mission of William Carey, Joshua Marshman and William Ward had contributed greatly for the cause of women's education in Bengal during the early decades of the 19th century. In his book 'RamtanuLahiri O TatkalinBangasamaj', SivnathShastri gives a vivid account of missionary activities. Carey received assistance and cooperation from Raja Rammohun Roy and Dwarkanath Tagore in his endeavor of founding girls' schools.

William Carey and his Serampore brethrens initiated the process; left a legacy. In later years, many such philanthropic works were undertaken by other missionaries as well as Indian reformers. Women missionaries were engaged by educated Indians and thus were actively involved in imparting education to women who were secluded in the domestic four walls of the 'antahpur', through the scheme of 'zenana education' system. In the area of women's education, the names of women missionaries such as Miss Mary Carpenter, Annette Ackroyd and others may be mentioned. The English missionary women could finally permeate the 'zenanas' and educate the female members of the indigenous society, when prejudice against the female education prevented from sending them to schools. But it may also be taken into account that in the zenanas, they hoped for both to educate and convert. As because it is outside the scope of this essay, any discussion has not been included. The personal narratives of Bengali women, the recipients of education, are interesting as to help us in understanding the social psyche and their indebtedness to the efforts of the missionary women in ameliorating their miserable existence. About five decades following the passing away of William Carey, Bengali Christian women set up their own association in 1881 with Kamini Sil as its secretary and published their journal 'Khrishtiya Mahila'.

William Carey and his Serampore brethrens were pioneers in the social works relating to women's cause during the early 19th century Bengal. Their understanding of female subordination, the untold sufferings due to prevalent social customs led them to take an emancipatory role through criticism, creating public awareness and active missionary work in such areas so as to ameliorate the condition of women. After 1793 Carey dwelt in Bengal, never to return. His heart bled for the helpless women, the victims of Sati rite and the way they were deprived of education. He, along with his brethrens, was never at peace till the sati rite was abolished. Through their earnest endeavors, girls' schools were established. The priority was always the moral values of their professed religion and as such there was slow acceptance in the indigenous society, though not vehement opposition. That did not deter their unfaltering determination. They remain as harbingers of looking at women as human beings.

Reference:

Bagal, Jogesh Chandra, 'History of the Bethune School and College' in Kalidas Nag (ed.), Bethune School & College Centenary Volume:1849-1949, Calcutta 1950.

Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey To Partition And After, New Delhi 2015.

Basu, Swapan, Sati, Calcutta 1982.

Basu, Swapan (ed.), Samvad-Samayik Patre Unish Shataker Bangali Samaj, Vol. II, Kolkata 2003.

Buchanan, Claudius, Christian Researches in Asia, London 1882.

Chatterjee, Sunil Kumar, Hannah Marshman: The First Missionary Woman in India, Hooghly 1987.

Dutta, Sutapa, British Women Missionaries in Bengal:1793-1861, London 2017.

Engels, Dagmar, Beyond Purdah: Women in Bengal, New Delhi 1996.

Forbes, Geraldine, 'In Search of the Pure Heathen: Missionary Women in Nineteenth Century India' in Alice Thorner and Maithreyi Krishnaraj (eds.), Ideals, Images And RealLives: Women in Literature and History, Mumbai 2000.

Giri, Satyabati, 'Satidaha Protha Nibarone Mrityunjoyer Bhumika' in Asit Kumar Bandyopadhyay (ed.), Pundit Mrityunjay Vidyalankar Probondhaboli, Calcutta,1995.

Hawley, J.S. (ed.), Introduction to Sati, the Blessing and the Curse, New York 1994.

Heimsath, C.H., Indian Nationalism and Hindu Social Reform, Bombay 1964.

Johns, William, A Collection of Facts and Opinions Relative to the Burning of Widows with the Dead Bodies of their Husbands and to Other Destructive Customs Prevalent in BritishIndia, Birmingham 1816.

Kopf, David, British Orientalism and the Bengal Renaissance, Berkeley 1969.

Laird, Michael Andrew, Missionaries and Education in Bengal:1793-1837, New Delhi 1972.

Majumdar, J. K. (ed.), Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India, Vol I (A Selection from Records), Calcutta 1941.

Marshman, Joshua, The Life andTimes of Carey, Marshman and Ward, Vol I, London 1859.

Middlebrook, J. B., William Carey, London 1961.

Miller, Basil, 10 Boys and Girls Who Became Famous Missionaries, Michigan 1991.

Narasimhan,Sakuntala, Sati: Widow Burning in India, New York 1992.

Natarajan, S.,A Century of Social Reform in India, Bombay 1959.

Periodical Records of the Baptist Mission Society, Vol II.

Philips, C.H. (ed.), The Correspondence of Lord William Cavendish Bentinck, Oxford 1977.

Potts, E.D.,British Baptist Missionaries in India: 1793-1837, Cambridge 1967.

Roy, Benoybhusan, Antahpurer Strishiksha, Calcutta 1998.

Sarwar, Firoj H., 'Christian Missionaries and Education in BengalDuring East IndiaCompany's Rule' in IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol 4, Nov-Dec 2012.

Sen Gupta, K.P., The Christian Missionaries in Bengal:1793-1833, Calcutta 1971.

Shastri, Sivnath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Bangasamaj, Calcutta 2007.

Ward, William, A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos, Vol II, Serampore 1815.

Derozio and The Challenges of Nineteenth Century Bengal

Sk Minhajuddin

[Abstract : *The advent of East India Company and with western education system changed the traditional ways of living and thinking of some people of Bengal. The impact of modern western education and culture gave birth of a new awakening. Thus, Henri Louis Vivian Derozio was one of the prominent figure who had took an opportunity to awaken the educated people and try to reform the social prejudices. But eventually he was face a lot of problems from various classes of society and his own colleagues and was removed from his workplace i.e. Hindu College. Therefore, I want to trace the actual problem which was faced by the great teacher Derozio and his disciples.*

Keywords : *Derozio, Rammohan Roy Radhakant Deva, Hindu College, Young Bengal*]

After the defeat in the battle of Plassey (1757) and Buxar (1764), the Bengal province gradually occupied by the English East India Company. They were only interested in the wealth, commercial activities and economy and their policy was so clear that they did not interfere in the religious, social and cultural life of their controlled areas. But after 1813 the Charter Act, they took active steps to transform the society and culture of Bengal. In the mean time, Britain witnessed the industrial revolution and innovations of new technology and scientific approaches. Science and technology also opened new ways of human progress. The eighteenth and nineteenth centuries gave birth to new ideas in Britain and Europe which influenced the British outlook towards India. The new thought was so delightful, that is Humanism and its main theme that all societies must change with time, nothing is or can be static. Moreover, man had the capacity to remodel the social and cultural life.

In this context, the British initiated to introduce the modern education. And of course the spread of modern education was not only the work of the government but also the Christian missionaries and a large number of Indians played an important role for this. A humble beginning was made by Warren Hastings, who set up Calcutta Madrassa in 1781 and in 1791, Jonathan Duncan established Sanskrit College at Varanasi for the study of Muslim and Hindu law and philosophy. Along with this, they also wanted to spread western modern education among the students because they believed that western education was far superior than oriental approaches. Even Raja Rammohan Roy fervently advocated the study of western knowledge, which was seen by him as the key to the treasures of scientific and liberal thought of modern west. He also realized that traditional education had bred superstitions fear and authoritarianism. From now the thoughtful Indians began to look for the strengths and weakness of their society and to seeking

Sk Minhajuddin, SACT 1, Dept. of History, Uluberia Colloge, Howrah,

the way of removing the weakness. While the large number of people still put their faith in traditional Indians ideas and institutions, and some enlightened persons gradually came to hold the modern thought and regenerate their society. Its consequences was phenomenally known as Renaissance of Bengal.

Renaissance of Bengal is a very highlighted area of the history of Bengal as well as India. The three major persons were involved in this event were Rammohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar and Derozio. My paper is to focus Derozio who was predominantly on active reformer, teacher, poet, philosopher in early nineteenth century of Bengal, Henry Louis Vivian Derozio (1809-1831). He was contemporary of Raja Rammohan Roy(1772-1833). In birth, Derozio was an Anglo-Indian and his father was Portuguese. Inspite of that, he never thought that India was not his motherland, rather he was always tried to express his feelings and love for this country with his poems, articles etc.. In his childhood, he was a student of a teacher named David Drummond at Dharmatala Academy.

From here he was gained knowledge about western philosophy, logic, even the debate competition was held at this institution and Derozio learnt it perfectly. He also acquired knowledge on Kant, Hegel, Fichte, John locke, Rousseau, Voltaire, Montesque and various European scholars.All these assimilated and formed the intellectual mentality of Derozio and influenced his activities.

At the age of 17, he was appointed as a youngest teacher of Hindu College (1826), a prominent educational institute of nineteenth century Bengal. Personally Derozio was a very radical and he was extremely opposed to any kind of illogical approaches. He was also influenced by the French revolution and very soon he became very popular among students. In this context, one of Derozio's biographers' wrote. "Neither before, nor since his day, has any teacher, within the walls of a native educational establishment in India, ever exercised such an influence over the pupils", Shivnath Shastri wrote his book "Ramtanu Lahiri o Tatkalin Bangasamaj", Derozio became the fourth class literature and history teacher, but like a magnet attracts iron, he also attracted the boys of other classes..." Even after the alloted time of teaching, he used to discuss various topics with the students and tried to open new windows of knowledge to them. Derozio tried to rid his students of all sins and make them virtuous in all aspect. Inspired by Hume's scepticism, he denied the existence of God, Under the influence of utilitarian philosophy, he attacked with strong language the age-old Hindu customs.

Derozio formed a debating society called "Academic Association" with the help of his students. There were enlightening discussions on various topic like literature, history, philosophy etc. Despite being a Eurasian, he claimed himself as an Indian. He also encouraged his students to inculcate deep patriotism, but like some other Indian intellectuals of 19" century, he accepted Western ideas. Names in Derozio's list of student are Krihnamohan Banerjee, Mahesh Chandra Deb, Rasikarishna Mallick, Ramgopal Ghosh, Radhanath Shikder, Tarachand Chakraborty, Dakshinaranjan Mukhopadhyay, Pyarichand Mitra, Shivchandra Dev and Ramtanu Lahiri. In history, they were collectively known as Young Bengal or Derozians or we may call 'Navya Banga'.

Now we turn back to the socio-cultural atmosphere of Bengal in 19th century. Modern education led by the British thought as absolute truth without any doubt. Under the inspiration of Derozio, the students of Hindu College published a magazine called 'Parthenon' in 1830. Moreover, Derozio published the 'Hesperus' and 'Calcutta Literary Gazette', where students wrote articles

against various evil practices in Hindu society. criticizing colonial rule in Bengal. Naturally this criticism made angry who were tried to imposed colonial rule over Bengal. Derozio was very famous among the student of Hindu College, and his ideology spread gradually and followed by some prominent students. Later they were very famous in their own field. Notable, their only aim was make a group of people who serve the empire. But one thing that English rulers did not clearly realize that new English educated class was firmly rooted in the old feudal structure, The caste system one of the most important elements of this society and had an immense impact on these peoples.

Despite having one foot stuck in the caste system and feudal structure, they became open to learning English and acquiring western knowledge. It has been said that the cultural elite of Bengal was divided into several caste-based groups. In these groups and their leaders were called Dalapatis. Five parties existed between 1820s and 1850s and the name of the leaders was Ashutosh Dev, Udayachand Dutta, Radhamadhav Banerjee, Kalachand Bose and Radhakant Dev. To be an aristocratic gentry, it was essential that they will be rich and influencial. Despite the important cultural changes brought about by the British government in nineteenth-century Bengal, the existence of the above groups perpetuated the old traditional culture. The government was aware of the existence of those parties. In fact, the politics of the era was based on parties. The 'Dharamsabha' was an organization consisting several parties. Rammohan Roy had the support of at least two important party leaders at different times for his several achievements.

Various factors worked behind the formation of rival parties. Apart from personal interest, social prestige, caste etc., these factors also included ideological reason. These ideological division was called liberal and conservative, but in drawing the dividing line between these was not so easy for the rulers. The main complexity is, those who wanted to retain the culture were called 'conservatives' and their opponents were called 'liberals'. But in reality, the intellectuals of both groups were traditional at heart, as they could not, in many cases, go beyond the strict discipline of the Hindu caste system. Neither the party, nor the individual ever abandoned the spiritual or metaphysical views dictated by Vedanta philosophy and often resorted to the Puranas to establish their views. It is within this common cultural framework that differences in their responses were observed. For example, Radhakant Dev, who was associated with the management of the Hindu College, forced to Derozio for resignation for his irreligious practices. On the other hand, Abir, was angered by the irreligious behavior of the Derozians and collaborated with the Scottish Missionary Alexander Duff to established missionary schools, as he believed that only these missionary schools could prevent the irreligious practices of Young Bengals of the Hindu College.

On the above mentions, this was the socio-cultural dichotomy, which has paved the way of new types of problems and challenges brought for Derozio. Rammohan Roy, the pioneer of Indian modernization, he was against of Derozians ideology.On the other side, Radhakant Dev, who was primarily opponent group of Rammohan, the sharp rationalism and atherism of Derozio, make a closer to each other. And finally, Radhakant Dev pressured the college authorities to remove Derozio as a teacher for misleading students. Rammohon Roy and his followers forgetting their interest in rational Western education, strongly condemned the atheism propagated by Derozio and laid emphasis on secular education to rid the student society of the influence of athesim. In April 1831, the college authorities decided that Derozio was the root of all heretical activities and

they forced Derozio to resign. Further, they decided that no teacher of the college could discuss any matter related to the Hinduism with the students.

On 25 April, 1831 Derozio submitted his resignation to H.H. Wilson. In his resignation, Derozio wrote, in teaching philosophy to students he had followed the usual method of examining the arguments for and against each conclusion, while discussing the existence of God, he had presented Hume's arguments against the existence of God through the dialogue between Cleanthes and Philo, and He wanted is students to be open-minded in the manner in which Dugald Stewart and Thomas Reed refuted the arguments for God's existence, and as a teacher he was very pleased that the intellectual endeavors of his beloved students had blossomed like the petals of a flower. His students are everything learned to place the truth above.

After being expelled from the college, he fell seriously ill and passed away in December, 1831 by cholera, only at the age of 22. Although, Derozio didn't perceive the evils of colonial rules and had an unquestioning faith in Western education, it cannot be denined that he was struck by his rationalistic outlook on traditional Hindu society. In a very short time, Derizio died, but his students, called young Bengal, remained to influence the culture of bengaline the following decades. He firmly believed that his students would control the pace of future development of India. Derozio's poems contain words of hope about his students. He pronounced :

Your hand is on the helm - guide on young men

The bark that's frightened with your country's doom

Your glories are budding; they shall bloom.

Here I am going to explain that how was the situation that was faced by Derozio. In nineteenth century Bengal, there were several types of common people only who led very normal life. They were related only with the production system and their only identity was as a productive class. They were actually not interested in social changes that affected their traditional life, religiosity and social norms. But some of them was took modern education and acquired scientific knowledge for sake of government job, not for modernization. That is why Derozio's appeal of scepticism was not accepted widely, including Rammohan and Radhakant Dev, despite they were adherent of modern education and western logic. But Derozio had some difference with them. He strongly believed that truth must be established, but others were not able to understand this radical approach of Derozio and his followers, So, Derozio faced lots of social challenges from his contemporary intellecturals and also various social groups and classes. His ideology was looked upon as to his contemporaries in the 19th century social set-up. His ideology is relevant today's moral crisis and for religious fanatism.

Reference:

1. Palit, Chttabrata : New Vewpoints of Neneteenth Century Bengal, Kolkata, 2006
2. Bagol, Yogesh Chandra : Derozio, Kolkata, 1976
3. Chandra Bipan : History of Modern India, Orient Blackswan Pvt. Ltd. Kolkata Delhi, 2009 ...2013

4. Sarkar, Sumit : complexities of young Bengal, Modern India, Macmillan India Limited, Delhi, 1983.

5. Dutta, Amar : Derozio and Derozians, Progressive Publishers, Kolkata, 2002

6. Guha, Ray Sidhartha and Chattopadhyaya, Suranjan : History of Modern India 1707-1964, Progressive Publishers, Kolkata, 1996

Geographical Identification of Ancient Bengal

Sujoy Bag

[Abstract : *The British empire named the eastern part of India as Bengal. This area was surrounded by the Himalayas in the north to the Bay of Bengal in the south. The global position of the then Bengal is approximately 27° 9' and 20° 50' north latitude and 86° 35' north and 92° 30" east longitude. The area of Bengal was 77,521 square miles excluding the State of Hill Tippera. Cooch Bihar and Sikkim, and the surface area covered by large rivers estuaries. At those days Bengals population was more then sixty million. The Hindu people generally lived in the eastern part of Bengal whereas the Muslims are lived in the Eastern side.*

The original materials for the study of Ancient Geography are supplied principally from the following sources :

1. *Indigenous texts on geography*
2. *Incidental references extracted from Indian works of a non-geographical character.*
3. *Inscriptions and coins.*
4. *Foreign accounts.*

The task of compiling a history of Ancient Bengal is by no means as easy one. I have strictly confined myself to the data applicable to the geographical limits of Bengal and have tried to make the treatment as detached as scientific as possible.

Keywords : *Geographical Identification, Janapadas, Ancient Bengali, Ancient Geography***]**

To trace the chief political or geographical division and administrative units of Bengal the most essential evidence is epigraphic records. We can know many things clearly about the Gupta, early post-Gupta, Pala and Sena ages from different epigraphical pieces of evidence. In those eras, we can find the name of many places. Some places may vary by different names. Another uncertainty occurs from their boundary. In those days, there was no fixed boundary for a particular place. We can mention a few places, such as Gauda, Vanga, and Radha. All that we can do at the present state of our knowledge is to enumerate the more important divisions with short explanatory notes of the various connotations of the names gleaned from epigraphicphic and literary sources.

The historiacal places of Bengal is one of anarchy, confussion and disintegration. The death of Sasanka at about 637 A.D. proved a death blow to Bengal for some time. He had successfully united the northern and western parts of Bengal. But after his death the two regions were separated. This is also performed from the accounts of Huen-Tsang. He paid a visit to Bengal at about 638 A.D. He describes Bengal proper as split up into four kingdom Pundravardhana, Karnasuvarna, Samatata and Tamralipta.

Certain parts of Bengal were conqured by Bhaskarvarman of Kamarupa. But the nobles of Bengal idle. During the period Pala decline several independent and semindependent powers flourished

Sujoy Bag, SACT-1, Dept of Sanskrit, Uluberia College, Howrah

in Bengal and Bihar. Most important among them were the Candras and Varmans. According to lama Taranath the Candra dynasty ruled and eastern part of Bengal from the six to eight century A.D. This is not supported by any epigraphic evidence. From East Bengal we can ascertain that they ruled East Bengal from the tenth to the eleventh century A.D.

From the Bharella inscription of Ladaha-Candra Ramapala copper plate. Dedarpur copper plate, Dhulia copper plate and Edilpur copper plate of Sricandra, has constructed the reign of Candra dynasty in Bengal.

The exact area of Gauda, which rises up out of lack of clarity before the sun of the Guptas set everlastingly, is an issue in regards to which there has not been a single opinion. This is effectively expressed in Gaudapura, written by Panini. Products of Gauda are mentioned in the Kautiliya Arthasastra. The nation is likewise recognizable to Vatsyayana to Vatsyayana, the creator of the Kamasutra. We cound know from the Haraha inscriptions of 554 A.D. that Isanavarman Maukhari constrained the Gauda individuals to take shelter in the seaside.

In the seventh century A.D. a Gauda lord had without a doubt his capital at Karnasuvarna closed to Rungamutty (Rangamati), somewhere in the range of twelve miles toward the south Murshidabad.

The Brihat-samhita of Varaharmihira (6th century A.D,) centainly confines Gaudaka to a piece of Bengal which is recognized not just from Paundra (North Bengal), Tamraliptika (some portion of the Midnapore), Vanga and Samatata ((Central and Eastern Bengal), yet additionally from Vardhamana (Burdwan). The Bhavishya Purana characteriazes Gauda as a domain misleading the north of Burdwan and south of the Padma. This compares to the realm of Gauda-Karnasuvarna portrayed by authors of the seventh century A.D. The Anargha-raghava of Murari (last half of the eighth century A.D.) specifies Champa as the capital (rajadhani) of the Gaudas in the era of that writer. This city is most likely same with Champanagari in the sarkar of Madaran referenced in the Ain-I-Akbari. It remaind on the left bank of the Damodar, north-west of the city of Burdwan.

The record of the Pala and the Sena dynasties and of contemporaneous families who held sway from the latter half of the eighth centuryA.D. to the Muslim conquest, enable us to glean some additional information about Gauda and its relation with Vanga during the period of their rule. The potentate who exercised supreme sovereignty in Bengal in the time of Nagabhata Pratihara (first part of the ninth century A.D.) is referred to as Vangapati (lord of Vanga) in the Gwalior inscription of Bhoja I, grandson of Nagabhata II. But from the time of Devapala, and possibly from that of his father DharmaPala himself, the contemporary and rival of Nagabhata II Pratihara, and Dhruva and Govinda III Rashtrakuta, the title Gaudesvara becomes the official style of the reigining emperors. Gauda is, however, still referred to as a vishaya or district as we learn from Kanheri inscription of Amoghavarsha I (814-877 A.D.).

Vanga is recorded as an administrative unit in the Arthashastra written by Kautilya. It is described as a notable naval power by Kalidasa. There are also records of subdivisions within Vanga, including an area called “Upa Vanga” which corresponds to Jessore and forested areas corresponding to the Sundarbans.

The rules of the Vanga kingdom remain mostly unknown. After the 2nd century B.C., the territory became part of successive Indian empires and Bengali kingdoms, including Mauryans, Guptas, Shashanka’s reign, Khadgas, Palas, Candras, Senas and Devas. The term Vangala was often used to refer to the territory. For example, an inscription of the South Indian Chola dynasty referred to the region as Vangaladesha during as war with the Canda dynasty. After the Muslim conquest of Bengal, the region was referred to as Bangalah, which may have evolved from Vangala. The

names are the precursors of the modern terms Benga and Bangla.

The core region of Vanga lay between the Padma-Meghna river system in the east and the Bhagirathi-Hooglyriver system in the west. In the east, it encompassed the modern Bangladeshi khulna Division and Barisal Division, as well as the southwestern part of Dhaka Division. In the west, it included Presidency Division of West Bengal and may have extended to Burdwan Division and Medinipur division. Its neighbors including samatata in the east: Pundravardhana in the north; and Magdha, Anga, Suhma and Radha in the west.

The Vanga kingdom encompassed the many islands of the Ganges delta and the Sundarbans mangrove forest.

Vanga of Pala and Sena records appears to have been a smaller region than the old domain known to the Jaina Prajnapana and Raghuvamsa of Kalidasa. It couldn't have reached out similarly as Tamluk, as the district beyond the Bhagirathi, which was once included inside its territory, presently as a part of the Verdhamana-bhukti. Indeed, even a piece of Jessore as along with some regions adjoint to it, recognized as Upavanga. This last referenced region is now alluded to in the Brihat-samhitan of Varahamihira.The Digvijaya-prakasa's a mediaeval work assignd to 1600 A.D. , places in Upavanga Jessore and some other tracts abounding in forest (Upavange Yasoradyah desah kanana-samyutah). Vanga proper was now restricted to the eastern part of the Gangetic delta. If the Abhidhana-chintamani of Hemachandra and the Jayamngala of Yasodhara are to be belived, It was identified with or included some territory on the east of the Brahmaputra.

Hemachandra really compares the individuals of Vanga with the people of Harikeli. In the later Pala period Vanga was devided into two sections, northern and southern (anuttara). Similarly, it is to be noticed that the sister area of Radha was also from the ninth or tenth century A.D. partitioned into two parts, named as Uttara-Radha and Dakshina-Radha. Anuttara or southern Vanga is particulary alluded to in the Kamauli Grant of Vaidyadeva, a minister of Kumarapala. The two divisions of Vanga inferred in Vaidyadeva's Grant may have compared generally to the two parts of a similar domain referenced in later Sena inscription to be specific the VikRamapura-bhaga and Navya.

Navya as a sub-division of Vanga is referenced in the Madhyapada Plate of Visvarupasena. A contemporary writer identified Nanya-mandala of the Rampal Plate as an error for Navya-mandala. He further distinguished Nehakashthi in that mandala with Naikathi in the Bakarganj district. The record of Visvarupasena remembers for the Navya district the Ramasiddhiptaka which has been distinguished by the writer with a village in the Gaurnadi zone of Bakarganj. In the east Navya stretched out to the ocean for example the head of the Bay and the estuary of the Meghna.

Soon after the death of emperor Ashoka, the Mauryan Empire declined and the eastern part of Bengal became the state of Samatata. The rulers of the erstwhile state remain unknown. During the Gupta Empire, the Indian emperor Samudragupta recorded Samatata as a "frontier kingdom" which paid and annual tribute. This was recorded by Samudragupta's inscription on the Allahabad pillar, which states the following in lines 22-23.

The territory, named Samatata finds mention in the Allahabad Pillar inscription of Samudragupta and later records. Its exact limits in the Gupta age are not known. The Brihatsamhita, a work of the sixth century A.D. distinguishes it from Vanga. The narrative in the record of Hiuen Tsand in the next century describes it as a low and a moist county on the seaside that lay to the south of Kamarupa in Assam). It was more than about 500 British miles in circuit and its capital was about 3 miles in circuit. If the identification of Rajabhata, king of samatata, mentioned by Far Eastern

travellers, with Rajarnja-bhatta of the Ashrafpur Plates be correct, then it is possible that in the seventh century A.D., Samatata had a royal residence at Karmanta. This place has been identified with Badkamtan in the district of Tippera, situated twelve miles west of Comilla. The connection of Samatata with the Tippera district in later ages is clearly established by the Baghaurn image inscirption of the time of MahIpala, and the Mehar copper-plate of Damodaradeva, dated 1234 A.D.

It must be said that for the history of my county in this connection we have to trace gradual expension of the geographical connection of vanga or vangala that is identifited with vangala by the European writers of the sixth century or seventh century A.D.

The name vangala was not unknown in earlier times and that the palas originally ruled in the tract called by the name. It is interisting to note that Dharmpala the famous king of pala dynasty is apparenty called "Lord of vanga" in the sagartal inscription of voja.though pala kings preferred to style themselves as "Lords of Gauda" the name of vanga or vangala is also included with the history of palas.

The precise location of Gauda, which emerges from obscurity before the sun of the Gupta set for ever, is a matter regarding which there has been considerable divergence of opinion. In conclusion it is also noted that from the 4th century A.D. onwards the epigraphy records that are assignable to distinct chronological periods [such as Gupta, post Gupta, pala and sena ages] enable us to trace more clearly the chief political or geographical divisions and administrative units of Bengal.

Though the boundaries of some of the units cannot be fixed with any degree of certainty and the difficulty is increased by the fact that the extent of even well known divisions like Guada, vanga, and Radha varied in different ages, we can do at the present state of our knowledge it to calculate the more important divisions with short explanatory notes of the various connotations of the names collected from epigraphics and literary sources.

Reference :

Primary Source :

1. Fleet, J.F.., Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol.iii, Indological Book House, Varanasi, 1960.
2. Maitreya. A.K., Gauda-lekha- mala (containing Inscriptionsof Pala Kings), Varendra Anusandhan Samiti, Rajshahi, 1919.
3. Sircar, D.C., Select Inscription bearing on Indian History and Civilization, Vol.i (2nd Ed.), Calcutta University, Calcutta, 1965.
4. Sircar, D.C., Select Inscription bearing on Indian History and Civilization, Vol.ii, Motilal Banarsidass, Delhi, 1982.

Secondary Sources :

1. Majumdar N.G., ed. Inscriptions of Bengal. Vol. 3 Varendra Reasearch Society, 1929.
2. Majumdar R.C., The History of Bengal. Vol.i., Dhaka University, Dhaka 1943.
3. Majumdar S.N. Cunningham's Ancient Geography of India, Chuckerverthy & Co. Calcutta, 1924.
4. Roy, N.R. Bangalir Itihas: Adiparba, (A Historyn of the Bengali People : Early Period), Dey's Publishers, Calcutta. 1356. B.S.

5. Sen. B.C., Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, Calcutta University, Calcutta, 1942.
6. Sircar, D.C. , Studies in the geography of ancient and medieval India, Vol. II. Motilal Banarshidass.Delhi 1971.
7. ircar, D.C., Indian epigraphy, Motilal Banarsidass, Delhi, 1996.

Reflections of Nationalist Discourses in India and the Other Worlds of Satyajit Ray

Debolina Byabortta

[**Abstract** : The worlds of Styajit Ray's reconstructs are found to be free from the contemporary ideological contours. Viewed against the context of British colonialism in India and the anti-colonial movements owing to nationhood , Ray's reconstructs tend to reflect upon humanistic richness and liberalism. Right from his unfilmed scripts to his masterpieces like 'Kanchanjangha', 'Charulata', 'First Class Kamra', 'Pratidwandi', 'Shatranj Ke Khilari', 'Agantuk' and 'Robertsoner Ruby' advocate cultural cosmopolitanism and dynamics of Indian Nationhood. This is precisely in this context this paper focuses upon Ray's attempt to reach the domain of cultural cosmopolitanism and thus becomes a route of all-forgiving liberalism.

Keywords : Nationalist Discourses, ideology, anti-colonialism, cosmopolitanism, liberalism]

Satyajit Ray's films, besides being regarded as the complement to the nation-building project of India's first prime minister Jawaharlal Nehru , remains an expression of liberalism focusing on the apolitical individualism. This liberal humanist attitude holds faith in the society as a unit where individuals could think and act freely irrespective of the dominant religious, political and cultural traditions. His protagonists are found to advocate " the seeds of social good stem from individual and even eccentric initiative" (Mehta 4). Keeping invein Ray himself declares, " I too am an activist –as an artist. That's my way." And this is precisely liberal activism that gets reverberated in his works. This hybridised look out of Ray is due to his upbringing in the liberal nationalist family milieu and later on this helped in the fruition of the director to address the subjects of colonialism and nationalism.

His first masterpiece was based on Rabindranath Tagore's 'Ghare Baire' drafted in 1946. This work deals with the topical subject for the 1940s a time when Indian politics had divided sharply along communal lines. This project reflects specifically upon the communal character of the swadeshi movement. Tagore's novels represents Nikhilesh , a liberal landowner , opposed the boycott of foreign goods being called for by his friend Sandip because it was destroyed by the forces of Panatical fanatical nationalism. Later on he also wrote scripts of Manik Bandyopadhyay's *Bilamson* (Williamson) and Subodh Ghosh's 'Fossil' two anti-colonial stories by communist writers. He balanced this critique of nationalism, with 'Bilamson' and 'Fossil' both of which portrayed the collusion of British colonialism and Indian feudalism. 'Bilamson' (1943) recounts how the weak-willed Bengali landowner Mahidhar lets his estate be taken over by an English named Stephen F Williamson. Williamson shows no compunction in destroying lives and communities in order to build roads and factories and the first person to resist him the local boy Dhurjati, who organizes Mahidhar's tenants against Williamson. Refusing to leave, Williamson goes on a rampage against the villagers and Dhujati is killed. Mahidhar tries to evict Williamson but the story ends with Williamson plying him with drink and lecturing him on the sacred duty to stick it out for their shared ideals. An allegory representing the establishment and perpetuation of British colonialism in Indian feudal classes colluded with the British. Ray notes

Debolina Byabortta, SACT I, Department of English, Uluberia College, Howrah

in this regard, " It was about an English manager of a zamindar's estate and described how a spirited youth takes a stand against the manager's exploitation of poor peasants" .

Subodh Ghosh's short story *Fossil* (1940) set in the tiny princely state of Anjangarh is also a parable about the colonial –feudal nexus. The king of Anjangarh and his court are benighted and cruel but the new law agent , a Bengali polo-playing idealist called Mukherjee , has grand visions for transforming the state. He develops the mining industry and the king's treasury overflows with money. Prosperity brings new challenges.

The nationalist credo of Nehru primarily had its great impact on Ray irrespective of the Nehruvian projects as state socialism or industrialization and he contemplated making a short film that would help the prime minister raise national morale during the 1962 war with China which was in reality never made. His affiliation with the Nehruvian ethos was expressed powerfully in *Kanchanjangha* (1962). It reflects upon the life of a Bengali upper-class family on holiday in Darjeeling, counterposingthe old-world values of the elderly magnate Indranath , who cherishes his British title of Rai Bahadur and adores the 'erstwhile rules', with those of Ashok, a young man from a vastly different social background. Indranath questions what 'the fruits of independence' will be, although he is glad he has lived to taste them, unlike one of his friends who had participated in the nationalist movement and died in jail. Ashok is so irritated by Indranath's declamation about British greatness that when he finally agrees to give him a job, he turns it down, declaring that he would find one through his 'own effort'. Ben Nyce observed *Kanchanjangha* is 'a political statement about post-independence India' . The clash of nationalist faith and colonial todayinsm is presented as a debate between two generations and two social classes, albiet not entirely as a face to face exchange. Instead of listening the 'fruits of independence', Ashok speaks up for freedom itself, whilst acknowledging the responsibility that came with freedom struggle. Indranath, however , does not get an opportunity to reply the debate is closed by Ashok's response. This structure was typical of Ray.

The film *Charulata* set in 1879-80, two years after Queen Victoria was proclaimed as the Empress of India at a grand durbar in Delhi, the film contains a remarkable recreation and critique of nineteenth-century 'moderate' nationalism. The plot is here based on Tagore's novella 'Nashtoneer'. Here Ray's Bhupati , a wealthy Bengali intellectual is depicted as obsessed with his political newspaper and neglects his young wife Charu who falls in love with Bhupati's cousin Amal. Here unlike Tagore's , Bhupati is fully fleshed-out liberal. He hates the label 'idle rich' and seeks to use his wealth to bring about political reform and national improvement. He is always ready to criticise the government but he is as loyal to British rule as the great British teacher, politician and journalist Surendranath Banerjea. Whose speeches Bhupati adores and on whose paper *The Bengalee* Ray modelled Bhupati's newspaper *The Sentinel* .

Thus is evident that the anti-colonial stance of Ray never interferes with his cultural cosmopolitanism . He himself declared to have learnt a lot from the European and American filmmakers rather than the Indian ones. Keeping in vein with the family tradition of Upendraishor or Sukumar Ray he had supported the swadeshi movement but rejected the idea of compulsion for the artists to practice a swadeshi art that eschewed European naturalism. The cultural cosmopolitanism has often been misinterpreted as simple anglophilia. Ashis Nandy, for example, has declard that the Rays were 'proud of their British connection and played the civilizing role demanded of them by the modern institutions introduced by the Raj into the country. Satyajit Ray would not have dissented from this view of studying European art in order to make necessary improvements of his own country and this 'critical openness' as Amartya Sen has pointed out, was also characteristic of Rabindranath Tagore. Ray's work always acknowledges habitual differences of the individual. The unpleasant British characters in his

stories were usually balanced by an example or two of their decent and humane compatriots. His films were peopled by rounded characters who were given the freedom to speak freely to the viewer or reader . But as in *Kanchanjangha* or 'First Class Kamra' , this liberty did not undermine the overall ideological stance of the work. The anti-colonial side for Ray is usually the anti-feudal and, later in his career, the anti-bourgeois side.

Reference :

Web Sources :

https://in.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=Interviews+of+Satyajit+Ray&type=E210IN0G0#id=2&vid=6a5e5cd203521ffab3e1c6443af541e9&action=click

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/L/bo3623192.html

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19472498.2011.577569

https://archive.org/details/nationalistthoug0000chat

https://satyajitray.org/critics-on-ray/

https://frontline.thehindu.com/cover-story/critical-insider-satyajit-rays-cinematic-trilogies/article36985862.ece

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/06/the-guardian-view-on-satyajit-ray-a-genius-of-cinema

https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/interviews/satyajit-ray-moral-attitude

Behind the Colonial Mansion : Architectural Confinement and the Feminine Resistance in "The Yellow Wallpaper"

Ananya Sasaru

[Abstract : *The trope of madness and the figure of the madwoman have always come to intrigue, repulse and perplex the Western literary civilization. For centuries, women have occupied a distinct position in the annals of insanity. Inserted between patriarchy on one hand and psychiatry on the other, they have been denied access to an autonomous existence and were very often subjected to debilitating diagnosis of madness, starting from the concept of hysteria that came much into vogue in the eighteenth and nineteenth centuries with Freud's famous investigations to the modern-day neurosis and mood disorders. In my paper, I attempt to connect confinement with psychiatric structures, psy-centered form of treatments and the various tropes of female mental illness including postpartum psychosis in Charlotte Perkins Gilman's 1892 short story "The Yellow Wallpaper". This paper also attempts to analyse the final trope of resistence against such confining patriarchal-medico practices that seek to illuminate the resilience and agency of women navigating within systems designed to marginalize and control them.*

Key words : *Architecture, Confinement, Psychiatry, Power, Feminine Resistance***]**

"However, what I meant to say is that I shall soon have to jump out of a window. The ugliness of the house is almost unbelievable – having white, and mottled greed and red. Then there is all the eating and drinking and being shut up in the dark."

-Virginia Woolf[1]

Images of confinement, escape, fantasies in which the deranged doubles functioned as wild surrogates for docile and the repressed selves or the endless struggles within the locked attics and fiery interiors have, time and again, appeared in a number of literary texts, From the mad heroines of Classical Victorian literature to the portrayal of mental illness in modern Western texts, the notion of entrapment, in the attics, in the patriarchal texts and in their own bodies has functioned in the manner of a twofold enclosure that paralyzed women into anxiety, perplexity and horror as can be found in violently insane Bertha Rochester in *Jane Eyre*, the depressed and suicidal Emma in Gustava Flaubert's *Madama Bovary*, the innocent turned demonic Mina and Lucy in Bram Stoker's *Dracula* and the tormented second Mrs. De Winter in Daphne du Maurier's *Rebecca*.

Phyllis Chesler in her 1970 groundbreaking work *Women and Madness* states that for centuries, men have defined women, not as they are but how they should be and because society has always been defined in a male institution, it is made survival that gains more importance. Chesler argues how numerous women were actually institutionalized by their own family members —husbands, fathers and brothers. She throws light on the case study of Elizabeth Packard[2] who found herself confined to a mental asylum at the behest of her husband, who sought to enforce her compliance with traditional feminine roles and his oppressive dominance. However, she transformed into a staunch advocate for women 's rights and the welfare of asylum inmates, offering comfort and support while tirelessly fighting for her own liberation from confinement. Similarly, Adriana

Ananya Sasaru, SACT-I, Dept. of English, Uluberia College, Howrah

Brinckle[3] endured a harrowing 28-year institutionalization, initiated by her father over a minor infraction —selling furniture with outstanding payments. Witnessing the brutal methods of restraint and punishment inflicted upon sane women, including chains, handcuffs, straitjackets, and bearings, Brinckle eloquently depicted the asylum as a crucible where sanity was systematically eroded, rather than restored. The transgressing of the boundaries and the roles set up by the patriarchal society posits women under the label of mad, insane, monstrous or possessed.

Taken up as one of her first assignments for the "World", Elizabeth Cochrane Seaman, popularly known as Nellie Bly for her pioneering journalism, had indulged in the 1887 expose on the conditions of the asylum inmates at Blackwell's Island in New York City. With a latent desire to know asylum life more thoroughly and to be certain about what she considered to be the exaggerated and romanticized accounts of asylum abuse and cruelty, she indulged in an undercover investigation into the ongoing affairs within the walls of the mental institution as "a poor, unfortunate crazy girl" under the pseudonym, Nellie Brown. After her ultimate escape from the experience, she had in the asylum, she had in the asylum, she had them published in the form of a book titled *Ten Days in the Madhouse* which was meant to bring to the surface the reality which the careless doctors and ruthless white-headed nurses tried to hide. Nelly Bly sheds light on the unhygienic atmosphere inside the asylum that was enough to turn a healthy soul into a sick one. She also mentions the claustrophobic ambience inside the cells and the inhuman treatments that deteriorated the conditions of the women trapped inside : "The insane asylum on Blackwell's Island is a human rat trap. It is easy to get in, but once there, it is impossible to get out" (Bly 45). The very architecture was no less than a prison house where every door was locked and all the windows barred. The food served were beyond human consumption and throughout the night, the inmates were unable to get proper sleep due to the noises made by the nurses who would read aloud to each other and time and again, walk heavily down the halls to catch a glimpse of the patients.

Michel Foucault conceives of madness as a Western concept that has been socially constructed and hence, regulated, reproduced, maintained and elaborated by the social structures. Perpetuating the myths and ideology of mental illness throughout various ages, the methods and practices of isolation, confinement and control of the insane have changed but the fact of isolation and control has remained constant. In his infamous work, *Madness and Civilization*, where he intends to write, not the history of madness but the "archaeology of silence" (Preface xii), Foucault reiterates how in both the Middle and Renaissance age, the madmen were allowed to roam about freely and function in the mainstream of culture. However, with the arrival of the "Great Confinement" (Foucault, *Madness and Civilization* 35) or the Age of Reason, the madness which was carrying and breathing by itself, was now caught and paralyzed by the nets of rationality and the restrained and restraining language of Reason. The age insisted upon the criminality of the insane beings, equating them on a similar status and thus, determined to lock them away in a prison.

The advent of the Modern Age ushered in the era of psychology and the medicalization of illness, presenting itself as a more measured approach to patient care. However, beneath this veneer lay a starkly moralistic and authoritarian system. As the eighteenth century drew to a close and the Modern Age progressed, the term "medical gaze," popularized by Foucault emerged to describe the abrupt restructuring of knowledge and the dehumanizing detachment of a patient's body from their identity. Scientific and intellectual paradigms, which exalted scientists and doctors as quasi-divine figures capable of eradicating sickness and solving all human ailments through their focus on the physical form, were, in reality, entangled with power dynamics and vested interests.

Charlotte Perkins Gilman's short story "The Yellow Wallpaper" makes sense in the light of such Foucauldian notion of how the patriarchal-medical gaze forms calculating forms of observations

and intense disciplinary rules and regulations that emerged with the birth of psychiatry in the early 19th century. With the dual task of both managing the mad and of gaining and systematizing knowledge, the asylum space cultivated an overactive and misguided mental health system which, by the 20th century witnessed the proliferation of treatments, diagnoses, and discourses. From confining patients against their will to faulty methods of diagnoses, electroshock therapy and the judicial apparatuses, psychiatry had begun to judge, assess and calculate performance with its gaze.

Charlotte Perkins Gilman in her autobiographical short story "The Yellow Wallpaper" first published in 1892, narrates the confinement of the narrator protagonist by her doctor husband to an attic nursery with barred windows. Forbidden to attempt the pen or engage in social conversation, she gradually became obsessed with the yellow wallpaper which she first finds repulsive and later discovers an imprisoned woman waiting to be rescued, a woman "stooping down and creeping about (Blaisdell 195) behind the undulating bars of the wallpaper whom she finally liberates by peeling the paper off the wall. Her creative mind struggles to escape from the trappings of the female body that imposes the necessity to perform the duties of a wife and mother on her. Treated in a child-like manner by her doctor husband and prescribed 'rest cure' by another professional medicine practitioner, she finds herself like one of those women behind the bars of the wallpaper who "go waddling up and down in isolated columns of fatuity" (Blaisdell 194) by the simultaneous regimentation of male conjugal and medical authority, the dual instruments of masculine logic and judgement. In "Why I wrote Yellow Wallpaper", Charlotte Perkins eleborates upon how she suffered from "continuous nervous breakdown tending to melancholia" (Dock 86) for years until she decided to take medical assistance from the famous physician Weir Mitchell who, by dismissing her case as "nothing much the matter" (Dock 86) prescribed her 'rest cure' and advised her to "live a domestic life" (Dock 86) and strictly forbidden her to touch pen or brush as long as she lived. Such judgements certainly portray gender bias of psychiatric practice that confines women to the domestic sphere, promoting marriage and motherhood as the essential roles for women while preventing them from carrying out intellectual exercise. The fact that Perkins could revive her sanity through the help of a friend who encouraged her in writing further evidences the idea that creative pursuit does not lead towards madness, rather it is a way out of it.

Gilman's short story clearly reflects the mental breakdown episodes or postpartum disorder of her own life after the birth or her girl child, Katherine. Her husband, Walter enters in his diary that later, Charlotte's mother came and took over the care and responsibility of Katherine. Charlotte "broke down entirely, and has been since a nervous invalid requiring the utmost care and tender treatment, lest it should settle itself into an incurable mind disease" (Horowitz 96). Interestingly, Walter continued to nurture the popular medical orthodoxy that a woman is physically and emotionally vulnerable due to her female reproductive system. "I have no doubt in my mind that the whole trouble is uterine irritation and until that is cured, she'll be no better" (Horowitz 98). Having been prescribed to the famous "rest cure" by Weir Mitchell, and experiencing a deterioration in her condition rather than betterment, she changed her daily routine, discarding Mitchell's forbidding her intellectual activities and wrote the short story which was, as she herself mentions, was "not intended to drive peiple crazy, but to save people from being driven crazy" (Dock 86).

The isolation of the protagonist of the short story can be traced in the very architecture of the colonial mansion where the unnamed protagonist has been confined as a part of the 'rest cure' treatment, popularized by Weir Mitchell. In an attempt to free herself from a nervous disorder, she has been forced into a treatment of solitude, detained in a lonesome, drab place. The house is beautiful, quite alone, standing well back from the road. The nursery is almost like a prison-room with barred windows and a bolted-down bed, preventing her emergence into an independent,

responsible woman who could participate in the outer spheres of society. With no one to share her actual feelings, she becomes almost a puppet who dwells in the middle of patriarchy –- the ancestral house, the mother of a son, the sick wife to her husband and a sister to her brother who are physicians and too rational to believe that anything is wrong with her, and finally, Weir Mitchell somewhere in the background. She is trapped not only in the ancestral colonial mansion but also in her own female body, having to act out the roles cut out for her by the society. Hardly equipped to carry out the prescribed roles of being a good wife and caring mother, her mind and body begins to get crushed just as the figures of those multiple women, imprisoned behind the confusing surface pattern of the wallpaper. The sense of 'ghostliness' associated with the eeriness of the room and the precision with which she follows the pointless pattern where "each breadth stands alone" (Blaisdell 194) and "go waddling up and down in isolated columns of fatuity" (Blaisdell 194) enhances her loneliness more than anything, further substantiated by her search for other women behind the wallpaper, thereby requiring the solidarity of the other to bring meaning into her existence. From being unable to shake the window bars for herself, the protagonist of "The Yellow Wallpaper" thus, pulled off the barrier that imprisoned other women.

The strange and haunted 'colonial' mansion (the very term colonial has the resonances of dominion and suppression) that stands alone, cut off from the society is already isolated with the spectres of the past tortures and agaping its mouth to take in another. The nursery where the narrator is confined is no less than a prison with its entire architectural pattern –- barred windows, bolted down bedstead, rings and things, the gate at the head of the stairs and so on. The fact that the narrator's room was once upon a time a nursery for little children, a playroom, signifies her position in the society. She is equated with the status of a child who would always require the guidance of a male adult (her husband, in this case) and must submit to his control and therefore, the nursery becomes the appropriate place to house her. The bars of the unchosen room of her existence bind her from all sides without allowing her to emerge from the chrysalis of child-like state into a responsible, free adult world and having interiorized the domination as a form of love from her husband, she accepts her confinement reluctantly. Just as the nursery infantilizes her, the nailed down immovable bed also prevents her from movement, from going astray or off-centre, thereby crippling her sexuality as well. Always subjected under the threat of the patriarchal gaze and in addition, the psychiatric gaze of Weir Mitchell somewhere in the background , the narrator finds it difficult to write, to express and even to think. The fact the she cannot predict at just what moment she might come under the surveillance of their husband and family is enough to prevent her from breaking the rules and prescriptions. In his discussion on Panopticon in *Discipline and Punish*. Foucault writes about the universal circulation of the gaze from a central position and those objectified by the central gaze always remaining at the periphery of the structure. The narrator in the story too experiences a de-centring as the objectified individual who finds herself inscribed and confined in new structure or space, defined by the power of the gazing subject at the centre of that space. Thus, the power relations have no single centre but are rather diffused through the whole social body in complex networks and diverse relations. The subjects are constructed in institutions or institution-like space in such a way that they too seem to become a resource of power through the process of normalizing individuation, who, in turn provide for the production of knowledge in a place for experimentation and training.

Towards the end of the story, the woman tears apart the entire wallpaper with the intention of liberating those imaginary women trapped behind the wallpaper. This is her act of resistance against the male and psy-centred form of treatment that she was put under. As she crawls in all four, her husband faints out of fear and she crosses over his body, denoting the overcoming of the hurdles that the husband in particular and the society at large represents. The fact that the unflappable husband faints when he discovers her crawling inside the room denotes the power of her new freedom achieved following her own logic (as she continued to follow the pattern of the wallpaper) towards a form of madness which is nothing other than a transcendental sanity, a

breakthrough. In this story, the woman carries the responsibility of freeing all other woman from the imprisoned state who have appeared at the chaotic boundary of the wallpaper and this becomes an immensely ethical stance on her part, who realises her new freedom through the freedom of those other women and protecting the "strange, provoking formless sort of figures" (Blaisdell 193), stooping and creeping behind the "undulating bars" of the wallpaper, and thus, she protects herself from the coinciding male conjugal and medical authority.

By tearing the wallpaper apart that stands for the male discourse, controlling and dominating her since day one, she carves the empty, blank space behind it that can be read as her discovery of the feminine language, the feminine space in all its obscurity and silence, that no longer adheres to the logical, rational pattern of the masculine wallpaper. Interestingly, this feminine language also bears the potentiality to become the means for women's artistic creativity that often enables mad women to deal with madness, a celebration of the freedom of mind from oppressive social constrains, which in R.D. Laing's words becomes not a 'breakdown' but rather a 'breakthrough'. Charlotte Perkins Gilman perhaps hints at such a freedom along with her protagonist woman through a (re)discovery of the feminine space amidst the highly gendered colonial mansion and heavily-loaded jargons of the medical fields. The newly discovered space becomes a means of incorporating the elements of transgression, resistance and subversion so as to offer a direct challenge and alternative to the logical and rational linearity of phallocentric ideas and thoughts.

Endnotes

1. In July 1910, following her atempted suicide by jumping out of a window, Virginia Woolf (then known as Virginia Stephen) was admitted to Burley House, a nursing home for women with nervous disorderes. The line is taken from her latter to her sister. Vanessa Bell. mentioning about the dull and horrifying days she is forced to spend at that place.
2. Elizabeth Parsons Ware Packard (December 28, 1816 — July 25, 1897), also recognized as E.P.W. Packard, championed the rights of women and individuals facing allegations of insanity in America. Unjustly confined to a mental asylum by her husband, who alleged her insanity for over three years, she stood trial where a jury, deliberating for merely seven minutes, deemed her sane. Subsequently, she established the Anti-Insane Asylum Society, advocating for divoiced women's custody rights over their children.
3. Adriana P. Brinckle resided at the Pennsylvania State Lunatic Hospital in Harrisburg for twenty-eight years. The irony was that she was perfectly sane all along, and always had been. Instead, a minor financial misstep coupled with her family's strong sense of pride led her down the path to the asylum. Eventually, she penned down for story in an article titled "Life Among the Insane".

<u>Reference</u> :

1. Blaisdell, Rober. The Dover Anthology of American Literature : Volume II., 2014 Internet resource.
2. Bly, Nelly. Ten Days in the Madhouse, Dodo Press, 2008. Print
3. Dock, Julie B, and Charlotte P. Gilman, Charlotte Perkins Gilman's "the Yellow Wall-paper" and the History of Its Publication and Reception :A Critical Edition and Documentary Casebook. University Park, Pa: Pennsylvania State Univ. Press, 1998. Print
4. Foucault, Michel, Richard Howard, and David G. Cooper. Madness and Civilization : A History of Insanity in the Age of Reason. London : Routledge, 2009. Print.
5. Horowitz, Helen L. Wild Unrest : Charlotte Perkins Gilman and the Making of "the Yellow Wall-paper" New York : Oxford University Press, 2012. Print.